বাগিচার কুলি

বাগিচার কুলি

শ্রীলাবণ্যকুমার চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান
ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা

মণিপুরী জবাড়ি,
শ্রীহট্ট হইতে গ্রন্থকা কর্ত্তৃক প্রকাশি

আষাঢ় ১৩৪৬

মূল্য ১৷৷০

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মা গায়ত্রী,

তুমি আজ কোথায় কোন্ অজানা দেশে লুকিয়ে গেছ জানি না; জানি মাত্র এটুকু যে, তুমি আর ইহলোকে নেই। তোমার এ ক্ষুদ্র জীবনের পৌনে চারটি বছরের মধ্যে আমাকে ঘিরে কত যে হাত পায়ের ছাপ রেখে গেছ, তা আমি কি ক'রে ভুলব? এ 'বাগিচরা কুলি'র বুকেই রয়েছে তোমার দোয়াত-ঢালা কত কালির দাগ, তোমার চঞ্চল হাতে লেখা হিজিবিজি কত আঁচড়! এমনই আরও কত শত চিহ্নের কোনটা গেছে মুছে, কোনটা বা যাবে মুছে; কিন্তু এ 'বাগিচার কুলি'র বুকে যে দাগ তুমি কেটে গেছ, তা যেন এ জীবনে মুছে না যায়। যতদিন এ লেখা আমার বেঁচে থাকবে, অন্তত ততদিন যেন তুমিও বেঁচে থাক, এই ভেবেই আজ তোমার মৃত্যুদিনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এ বইখানা তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। তুমি একে গ্রহণ কর মা, আমার কান্না সার্থক হোক। ইতি।—

মণিপুরী রাজবাড়ি
শনিবার, ৪ঠা চৈত্র,
১৩৪৫ বাংলা

লাবণ্যকুমার

বয়স পঁচিশ বছরের যুবক। দেখিতে সুপুরুষ। মাথায় সোলার টুপি, গায়ে সাদা সিল্কের হাফশার্ট, পরণে খাকীর হাফপ্যাণ্ট, পায়ে উলের মোটা মোজা এবং পাতলা নেকড়ার সাহায্যে সযত্নে পালিশ করা জুতা এমনই চকচকে যে, এই বর্ষাবিধৌত পড়ন্ত রৌদ্র চামড়ার গায়ে প্রতিফলিত হইয়া চিকচিক করিয়া উঠিতেছিল। তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত একটা স্পষ্ট পরিষ্কার সুবিন্যস্ত ভাব। হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঠক ঠক করিয়া পা ফেলিয়া সে অনতি-উচ্চ টিলার উপর হইতে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতেছিল। ঐ টিলার উপরেই তাহার সুন্দর বাংলোটি সে নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল—মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কুর্ত্তা, পায়ে পট্টি এবং শক্ত চামড়ার জুতা, হাতে বাধানো বাঁশের লাঠি লইয়া একটি ভারী রকমের পশ্চিমা লোক।

সিগারেট হইতে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দীপক পথে নামিয়া ডান দিকে চলিতে লাগিল। একটিবার চারিদিকে তাকাইয়া আপন মনে বলিল, কি বৃষ্টিই না এই কদিন পড়ল। আকাশে কত জলই যে থাকে।

কথা কিছু মিথ্যা নয়। গত কয়দিনই বৃষ্টির বিরাম ছিল না। বৈশাখের পুঞ্জীভূত মেঘরাশি চেরাপুঞ্জি পাহাড়ের গায়ে আটকাইয়া গিয়া সারা সুরমা উপত্যকাটাকেই মেঘাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এই কয়দিনই সূর্যরশ্মি এই পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে ভেদ করিয়া পৃথিবীর গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কত চেষ্টাই না করিয়াছে, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে; বরং একটু পরে পরেই বেশ জোরে এক এক পশলা বৃষ্টি হইয়া চতুর্দ্দিকের খাল বিল নদী-নালা সব জলে ভরিয়া গিয়াছে। এই অতিবৃষ্টির ফলে সকলের মনেই কেমন যেন একটা তিক্ততার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য আবার কয়দিন আগেও চতুর্দ্দিকের লোক ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া বলিয়াছে, আকাশের গায়ে একটু মেঘও যদি থাকিত। তবে অতিবৃষ্টির ফলে এইটুকু হইয়াছে যে, চৈত্র-মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত রৌদ্রতাপে ঝিমিয়ে-পড়া প্রকৃতি যেন নব চেতনা পাইয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রতিটি চাগাছের মাথায়ই নতুন কুঁড়ি গজাইয়া বাগানের মালিকদের প্রাণেও আশার সঞ্চার করিয়াছে। আর তিন চারি দিন পরেই 'পাতি' তুলিবার সময় হইবে,—চায়ের সীজন আরম্ভ হইবে। এই কুঁড়িই চায়ের প্রাণ। ত্রিপত্র সম্বলিত পাতিগুলিকেই ছায়াতলে বিছাইয়া, কলে মাড়াইয়া, অগ্নিতাপে ভাজিয়া চা প্রস্তুত করা হয়, এবং উপযুক্ত সময়ে পাতি তুলিবার অর্থাৎ ডগাগুলি ভাঙিয়া আনিবার উপরেই চায়ের আস্বাদ, বর্ণ এবং গন্ধও নির্ভর করে।

সারাটা দিনই আজ বৃষ্টিতে কাটিয়াছে। ঘরের বাহির হওয়াই প্রায় দায় হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ চারিটা বাজিতেই যেন যাদুকরের করস্পর্শে আকাশের সমস্ত মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল। গত তিন দিন বাগানের কাজে নানা অসুবিধাই ঘটিয়াছে, কুলিরা পর্যন্ত অনেকে কাজে

যাইতে পারে নাই। দীপকও ঘরে বসিয়া বই পড়িয়াই কাটাইযাছে। স্ত্রী পিত্রালয়ে। অথচ বাগানের বাবুদের সঙ্গেও মেলামেশা চলে না, মিশিলে ইজ্জত থাকে না। আর এমনই মেলামেশার ফলে যদি প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের আড়ষ্টতা এবং ব্যবধানটুকু ঘুচিয়া যায়, তবে ডিসিপ্লিনও থাকে না। কাজেই দীপক পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ রামলোচনবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও সঙ্গে বিনা কাজে বড় একটা বাক্যালাপও করে না। আজ বিকালের দিকে মেঘ কাটিয়া রোদ উঠিতে না উঠিতেই সে পোষাক পরিয়া তাহার বাবার আমলের পুরাতন ভৃত্য ভুলুয়াকে সঙ্গে লইয়া বাগান পরিদর্শনে বাহির হইল। সমস্ত বাগানটিই আজ একটিবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে।

২

বছর দুই আগের কথা। তখনও আর একটা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ঠিক আসন্ন হইয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের বাজারে চায়ের দর হঠাৎ বড়ই মন্দা হইয়া পড়িল, এবং তাহারই ফলে অনেক শ্বেতাঙ্গ চা-কর বাগান বিক্রয় করিয়া দেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। কাছাড় জেলায় কল্যাণপুর বাগানের মালিক মিস্টার জন্‌সনও তাঁহার বহুবর্ষের বাগানখানি বড়বাবু তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের কাছে মাত্র ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

তারকনাথ পাকা লোক। পঁয়ত্রিশটি বছর এই কল্যাণপুর বাগানে কাজ করিতেছিলেন। নিজ কর্ম্মশক্তি এবং পরিশ্রমের ফলে বাগানের বড়বাবু হইতে তারকনাথ আজ সেই কল্যাণপুর বাগানেরই অধিকারী।

তিনি জানিতেন, চায়ের বাজার সব সময়েই কিছু এমন মন্দা থাকিবে না। বছর দুই চার পরে নিশ্চিতই চায়ের চাহিদা বাড়িবে। কাজেই অল্পমূল্যে বাগানখানি ক্রয় করিয়া তারকনাথ বাগানের উন্নতিতে মন দিলেন এবং কিছুকাল এমনই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিলেন যে, তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল। এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া আরও একটি বছর কাটাইয়া তিনি একমাত্র পুত্র দীপকের হাতে বাগান বুঝাইয়া দিয়া চিরবিদায় লইলেন।

এই কল্যাণপুর বাগান কাছাড় জেলায় শিলচর শহর হইতে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে। শহর হইতে একটি পাকা সড়ক সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে এবং যে পর্বতমালা সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মণিপুর ও কাছাড় জেলাকে যুক্ত করিয়া আসাম প্রদেশের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহারই গায়ে গিয়া মিশিয়াছে। কল্যাণপুর বাগান এই পথের পাশেই অবস্থিত। এই রাস্তার দুই পাশেই ছোট-বড় বহু অনতি-উচ্চ টিলা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সারি সারি চাগাছ এই ক্রমনিম্ন টিলার গায়ে যেন সবুজ ঘাসে তৈয়ারি সিঁড়ি। চাগাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে আবার প্রকাণ্ড বড় বড় শিরীষগাছ ইহাদের অগণিত শাখা-প্রশাখা লইয়া বাগানের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া আছে। এই ছায়া এবং বৃক্ষপত্রের হাওয়া চাগাছের পক্ষে বিশেষ উপকারী। তারের বেড়াজালে ঘেরা বাগানগুলি হইতে বহু ছোট-বড় কাঁচা-পাকা রাস্তা আসিয়া বড় সড়কের গায়ে মিশিয়াছে।

কল্যাণপুর বাগান আয়তনে পাঁচশো একারের কম হইবে না। অনেক ছোট-বড় টিলাতে পূর্ণ। ইহা ছাড়া বাগানে বহু স্থান ব্যাপিয়া অনতি-উচ্চ এবং অতি-নিম্ন ভূমিও বর্তমান। অতি-নিম্ন জলাভূমিতে

চাগাছ জন্মে না বলিয়া কুলিরা ধানের ক্ষেত করিয়া থাকে। বাগানের প্রায় সবটুকু উচ্চভূমিতে চায়ের চাষ হইয়া গিয়াছে। কল্যাণপুর বাগানটি আবার দুই দিকেই গভীর জঙ্গলাবৃত এবং এই জঙ্গলের পাশে টিলাগুলির গায়ে একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী সর্পগতিতে বহিয়া যাইতেছে। নদীটি বর্ষায় বেগবতী, শীতে শীর্ণকায়া, কিন্তু ইহার স্বচ্ছ জল পান করিবার এবং তীরস্থিত আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষের ফলমূল খাইবার আশায় শীতকালে বহু মৃগদম্পতি আপন শাবকগণসহ গভীর জঙ্গল হইতে নামিয়া আসে। আবার কখনও কখনও ব্যাঘ্র কিম্বা বন্য হস্তীও আপন পদচিহ্ন সেখানে অঙ্কিত করিয়া যায়।

এমন একটি বাগানের সর্ব্বময় কর্ত্তা আজ দীপক। সে এম. এ. এবং ল পাস করিয়া গত একটি বছর যাবৎ বাগানেই আছে। পিতার শরীর খারাপ হইয়া পড়ায় তাহার আর কোথাও যাওয়া হইয়া উঠে নাই। শৈশব হইতে বাগানেই থাকিয়া বাগানের কাজই হোক, কারখানা-ঘরের কাজই হোক, সবই তাহার জানা হইয়া গিয়াছে। কখন চায়ের বীজ রোপণ করিতে হয়, কখন কোদালি দেওয়া প্রয়োজন, কখন পাতি তুলিতে না পারিলে চা বর্ণে গন্ধে এবং স্বাদে অপকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারে ;—তা ছাড়া কি ভাবে কুলিদের খাটাইতে হয়—এই সব কাজে তাহারও বেশ একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাই পিতার পরে সে নিজেই বাগানের ম্যানেজার হইয়া বসিয়াছে, এবং এই কারণেই এই কয়দিন অতিবৃষ্টির পর বাগানের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ভৃত্য ভুলুয়াকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

৩

তখন দিনশেষের রক্তরবি বাগানের পশ্চিম সীমায় সর্ব্বোচ্চ টিলার পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাগানের পাহাড়িয়া গাছ ও বাঁশবন অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে স্বর্ণকিরীট ধারণ করিয়া আছে। বাগানের অতি-প্রাচীন বৃক্ষগুলি পক্ষীকলরবে মুখরিত। দীপক তখনও একটা টিলার গায়ে শ্রেণীবদ্ধ চাগাছগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া নবোদ্গত পাতাগুলির দিকে তাকাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। হঠাৎ শুনিল, ভুলুয়া নীচে হইতে বলিতেছে, বাবু, সন্ধ্যা যে উতরে গেল কুঠিতে ফিরবে কখন?

দীপক কিন্তু 'দেখ ভুলো, এ গাছগুলিতে কি সুন্দর কুঁড়ি গজিয়েছে' বলিয়া কয়েকটি গাছের প্রতি ভুলুয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু সে বৃথা। অন্ধকার তখন প্রায় জমিয়া উঠিতেছে এবং সবুজ পাতা সেই অন্ধকারে ক্রমশ মিলাইয়া যাইতেছে।

ভুলুয়া বলিল, চল বাবু, বহুদূর এসে পড়েছি, রাত হবার আগে পাশের জঙ্গলটা পেরিয়ে যেতে হবে তো?

ওতে কিছু হবে না, সঙ্গে পিস্তল আছে রে।—বলিয়া দীপক হাফপ্যান্টের পকেটে হাত দিল, কিন্তু পিস্তলটি আজ ভুলিয়া আনা হয় নাই। তখন আর অপেক্ষা না করিয়া নীচে নামিয়া দীপক পথ ধরিয়া চলিল। সে বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া পথের ধারে কি সব দেখিতেছে। বলিল, ভুলো, এ গাছগুলো কিন্তু তেমন ভাল হয় নি। এবার বুঝি এতে আর কোদাল পড়েই নি? সুযোগ পেলেই ওরা ফাঁকি দেয়।—বলিতে বলিতে পকেট হইতে সিগারেট-কেসটি বাহির করিয়া একটা সিগারেট মুখে দিয়া তাহাতে

আগুন ধরাইল। এতক্ষণে তাহারা জঙ্গলের দিকটা কাটাইয়া আসিয়াছে।

ভুলুয়া বলিল, বাবু, তুমি যাও। আমি একটু ঘুরে আসি।—বলিয়া দীপকের সম্মতির অপেক্ষায় রহিল।

দীপক বলিল, এখন যাবি কোথায় ?

ওই কুলিবস্তিতে একটু কাজ আছে।—বলিয়া সেই আধ-আঁধারে এক দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

দীপক বলিল, যা, দেরি করিস নি কিন্তু।

ভুলুয়া তখন অন্য একটা সরু পথ ধরিয়া একটা টিলার গায়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভুলুয়া দীপককে শিশুকাল হইতেই 'তুমি' সম্বোধন করিয়া আসিতেছে। প্রভু-ভৃত্যের এই নিবিড় মমতামাখা সম্বন্ধটুকু গত পঁচিশ বছর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভুলুয়া জনসন সাহেবের আমল হইতেই এই বাগানে আছে। যখন তাহার বয়স মাত্র সাত বছর, তখন তাহার পিতামাতা বিহারের কোন এক পল্লীগ্রাম হইতে আড়কাটিদের পাল্লায় পড়িয়া অধিক উপার্জ্জন এবং ভাল খাওয়া-পরার আশায় ভুলিয়া একমাত্র পুত্র ভুলুয়াকে সঙ্গে করিয়া ভারতবর্ষের প্রায় পূর্ব্ব সীমান্তে এই কাছাড় জেলায় কল্যাণপুর বাগানে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই অবধি তাহারা আর কল্যাণপুর ত্যাগ করিয়া যায় নাই। ভুলুয়ার শিশুকাল হইতেই সে দেখিয়া আসিতেছে, এই কল্যাণপুর বাগানই তাহার ঘর, তাহার বাড়ি, তাহার দেশ। ইহার বাতাস তাহার নিশ্বাসের বায়ু, ইহার জল তাহার পানীয়, এই বাগানের ম্যানেজার তাহার প্রভু, আর সে বাগানের কুলি—দিনমজুর। শৈশবে তাহার পিতামাতা যখন কাজে যাইত, তখন সে অন্যান্য সমবয়সী

কুলিবালকদের সহিত চাগাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলিয়াছে, কৈশোরে ঝাঁকি ধরিয়া পিতামাতার সঙ্গে পাতি তুলিয়াছে, কখনও বা কোদালিও পাড়িয়াছে। এমনই করিয়া ভুলুয়া যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন হইতেই তাহার কর্ম্মক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ভদ্র ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া জন্‌সন সাহেব তাহাকে এক দলের সর্দ্দারপদে উন্নীত করিয়া দিলেন। অবশেষে এই ভুলুয়া সমগ্র বাগানের কুলি-সর্দ্দার আখ্যা পাইল, এবং তারকনাথের আপন ভৃত্যও নিযুক্ত হইল। তখন ভুলুয়ার বয়স মাত্র পচিশ বছর। দীপক তখন হইতেই তাহার কোলে-পিঠে মানুষ। আজ ভুলুয়ার বয়স পঞ্চাশ হইতে চলিয়াছে।

দীপক আসিয়া তাহার টিলার সম্মুখে পথের পাশে সিঁড়ির গোড়ায় যখন দাঁড়াইল, তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ ক্রমশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। দীপকের কানে আসিল একটা চাপা আর্ত্তকণ্ঠের কাতর শব্দ। সে একটু অন্যমনস্কভাবে মাত্র দুই চারিটি সিঁড়ি উপরে উঠিয়াছে, অমনই তাহার জুতার ঠোক্করে ব্যথা পাইয়া কে যেন 'উঃ' করিয়া উঠিল। নারীকণ্ঠ। দীপক একবারে চমকিয়া উঠিল। কঠোর স্বরে কহিল, তুই কে?

তেমনই ব্যথা-কাতর কণ্ঠে জবাব আসিল, আমি মনিয়া, বাবুজি।

এই মেঘঘোর অন্ধকার রাত্রিতে এমনই অবস্থায় সিঁড়ির গোড়ায় মনিয়ার বসিয়া থাকার কি কারণ হইতে পারে, দীপক অনুমান করিয়া উঠিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে তোর? অমন ক'রে এখানে ব'সে আছিস যে?

মনিয়া চাপা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলিল, টিলাবাবু আমাকে চাবুক মেরেছে, বাবুজি।

টিলাবাবু তোকে মেরেছে ?—বলিয়া হেঁট হইতেই দেখিল, মনিয়ার সর্ব্বাঙ্গ কাদা-মাখা। দীপকের প্রাণে কেমন একটা বাথা বাজিল। অন্য দিন হইলে কিম্বা আজও অপর কোন কুলির মেয়ে হইলে দীপক কি করিত বলা যায় না, কিন্তু মনিয়াকে সে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, কুঠিতে চল।

৪

ভুলুয়ার একমাত্র কন্যা মনিয়া। মনিয়া যুবতী, আজও তাহার যৌবন আধফোটা গোলাপেরই মত আপন সৌন্দর্য্যগরিমায় উদ্ভাসিত। রঙ তাহার আবলুসের মত কালো চিকচিকে, মুখ ও দেহের গঠন যেন জীবস্রষ্টার এক অপূর্ব্ব নিখুঁত সৃষ্টি। কপাল, টানা টানা চোখ, নাক ও ওষ্ঠদ্বয় এবং চিবুকের গঠন দেখিয়া কেহ তাহাকে কুলির মেয়ে বলিয়া অনুমান করিতে পারিবে না। মুখশ্রীর কমনীয়তা এবং দেহ-গঠনের লীলায়িত ভঙ্গি তাহার কৃষ্ণ বর্ণ সত্ত্বেও তাহাকে লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এক কথায়, মনিয়া কুলির মেয়ে এবং কালো হইলেও সুন্দরী।

ভুলুয়া একাধারে কুলির সর্দ্দার এবং স্বয়ং ম্যানেজারের অতি আদরের পুরাতন ভৃত্য। তাহারও যেমন চেহারা, শরীরের গঠনও তেমনই। তদুপরি ভারী জোরালো চেহারার উপর তাহার গোঁফজোড়া। ওষ্ঠদ্বয় মুখের দুই পাশে যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই স্থানের গোঁফগুলিকে না ছাটিয়া কানের পাশের দাড়ির সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া তাহার মোটা চেহারার গুরুত্বটা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কুলিমহলে ভুলুয়ার

যথেষ্ট প্রতিপত্তি। শুধু কল্যাণপুরেই নয়, আশপাশের বাগানের কুলিদের মধ্যে কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে ভুলুয়ারই ডাক পড়ে।

কল্যাণপুর বাগানে ভুলুয়া, তার স্ত্রী এবং কন্যা মনিয়াকে লইয়া এক প্রকার সুখেই দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু মনিয়ার জন্মের কিছুদিন পর হইতেই ভুলুয়ার স্ত্রী কালাজ্বরে ভুগিতে ভুগিতে অবশেষে সংসারে তাহাকে একা এবং মনিয়াকে মাতৃহীনা করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু স্বেচ্ছায় না হইলে পুরুষ-জীবন নিঃসঙ্গ কাটাইবার প্রয়োজন হয় না। যে কোন সময়েই পুরুষ একটি সঙ্গিনী জুটাইয়া লইতে পারে। আর ভুলুয়া তো কুলিই, নীচজাতীয়, কাজেই মনিয়ার মার মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে সে একটির পর একটি আরও তিন সংসার করিয়াছে, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশত কোন স্ত্রীই বছরের অধিককাল তাহার গৃহিণীরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু তবুও চতুর্থবারের জন্য বিদেশী আসিয়া ভুলুয়াকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

কিন্তু না, ভুলুয়ার আর বিবাহে সাধ নাই, অনেকগুলিই তো হইয়াছে। মনিয়ার মার মৃত্যুর পর হইতেই তাহার বিবাহিত জীবনের সুখ ঘুচিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া এখন মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহাকে পাত্রস্থ করা একান্তই প্রয়োজন। ভুলুয়া বলিল, না ভাই বিদেশী, ও কথা আর কেন?

বিদেশী বলিল, মেয়েটা ভাল রে ভুলুয়া। কালুর বউকে তো তোর জানাই আছে। কেন মেয়েটাকে হাতছাড়া করবি, বল? কালুর বউয়েরও তোর ঘর করতে বড় সাধ।

তোর পায়ে পড়ি বিদেশী, এবার আর আমাকে বিরক্ত করিস না। মনিয়ার বিয়ে না দিয়ে আর কোন কথা শুনতে আমি রাজি নই।

মনিয়ার জন্ত তোকে ভাবতে হবে না। ছেলে আমি দোব। আর এখন এক কাজ কর। কিছুদিনের জন্ত মেয়েটাকে তার মাসীর বাড়ি পাঠিয়ে দে।

বৃদ্ধ কুলি বিদেশীর শেষ কথাটা ভুলুয়াকে বিঁধিল। মনিয়ার মার মৃত্যুর পর হইতে বিবাহ এবং নিকাতে মিলিয়া কয়েকটিই তো হইয়াছে, কিন্তু শৈশবে মাতৃহীনা কন্যাকে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিতে দেয় নাই যে, সে মাতৃহীনা। নিজেই বুকে-পিঠে করিয়া সে মেয়েটিকে এতবড় করিয়াছে। বিদেশীর কথায় ভুলুয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, না বিদেশী, তোমরা আর ও কথা নিয়ে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে এস না। বিয়ে আমি আর করব না।

বিদেশী ভুলুয়ার কথাটা যেন ভাল বুঝিতে পারিল না। ভুলুয়ার বিবাহে অরুচি দেখিবে, এ তাহার নিকটে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। সে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিয়া গেল, তোর ওসব ন্যাকামি তো দুদিন। তার পরই যখন একটি মেয়ের জন্ত এ-বাড়ি ও বাড়ি ছুটোছুটি করবি তখন বুঝব! তিন তিনটে নিকাই তো করলি আর দোষ হ'ল কিনা কালুর বউয়ের!

বিদেশী বিদায় হইল।

৫

তারপর মনিয়ার বিবাহ। সেই বাগানেরই এক কুলি যুবকের সহিত মনিয়ার বিবাহের এখন তিন বছর চলিয়াছে। কিন্তু বিধাতার অভিশাপ। মনিয়া বিধবা হইয়াছে। বারো বছর বয়সে তাহার বিবাহ

হয় ; এখন বয়স তাহার পনরো। কুলির মেয়ের আবার বিধবা হওয়া ' কথায় বলে—'কুলির মেয়ে কি বিধবা হয়—ভগবানের যা আক্কেল বুঝা যায়।' মনিয়া স্বামীহীনা হইয়াছে এখনও একমাস হয় নাই। এরই মধ্যে কয়েকটি বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। ভুলুয়াও মেয়ের মুখ চাহিয়া আর দেরি না করাই বিবেচনা করিল, কিন্তু মনিয়ার ভাবটা কেমন যেন একটু আলাদা ধরণের। স্বামীর মৃত্যুর পর সে কয়েকটা দিন মাত্র পিতৃগৃহে কাটাইয়া যখন পুনরায় তাহার বিবাহিত জীবনের সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরখানিতে ফিরিয়া গেল, তখন শুধু কুলিরাই নয়, বাগানের বাবুদেরও কেহ কেহ অবাক হইয়া গেলেন। ভুলুয়া পর্য্যন্ত মেয়ের মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পুনরায় বিবাহের কথা শুনিলেই মনিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলে। ভুলুয়া বিব্রত হয়। অবশেষে একদিন মেয়েকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল, মেয়েটি তাহার অন্য ধাতুতে গড়া। আরও কিছুদিন গেলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। হয়তো বা এখনও সে তাহার বিবাহিত জীবনের স্মৃতিটুকু ভুলিতে পারে নাই। এমনই সব ভাবিয়া ভুলুয়া কিছুদিনের জন্য চুপ করিয়া রহিল।

এখন হইতে প্রতিবেশী মঙ্গু হইল মনিয়ার সাথী। মঙ্গু দশ বছরের বালক মাত্র। বিবাহের পর মনিয়া স্বামীর সঙ্গে ঘর পাইয়াছিল ৩ নম্বর কুলি-লাইনে স্বামীহীনা হওয়া অবধি সে প্রায়ই তাহার কুঁড়েঘরটির পৈঠায় গালে হাত দিয়া বসিয়া কি যেন ভাবে। কোন দিন কাজে হাজিরা দেয়, কোন দিন দেয় না। তাহার খাওয়া-পরার অভাব হয় না, ভুলুয়া আছে।

কয়েকদিন পর।

সূর্য্য সবেমাত্র পূর্ব্ব দিকে পাহাড়ের মাথা হইতে উঁকি দিতেছে।

বাগানের প্রতিপালিত ছাগলগুলি আপন মনে পথ চলিয়া নিদ্রা-জড়তা ভাঙিয়া খাদ্যের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। মনিয়া দুই হাতের তালুতে চক্ষুঃদ্বয় রগড়াইয়া আসিয়া তাহার পৈঠায় বসিল। একটা কুকুরশাবক তাহার পায়ের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া লেজ নাড়িয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু হঠাৎ একটি ছাগশিশুকে দেখিয়া কি মনে হইল কে জানে, ইহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। ছাগশিশুটি ভয়ে তাহার মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেই ছাগমাতা শিঙ উঁচু করিয়া কুকুরটিকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় 'দূর দূর' করিয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিল মঙ্গু। কুকুরশাবকটি তখন তাহার ছোট্ট প্রভুটির কাছে গিয়া লেজ নাড়িয়া সারাটা দেহ দুলাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

মনিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সেই শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, বস্তির পথ ধরিয়া মঙ্গু উপরে উঠিয়া আসিতেছে।

মঙ্গু তাহার পাতানো দিদি মনিয়ার পাশে আসিয়া প্রশ্ন করিল, আজ পাত্তি তুলতে যাবি না?

মনিয়া অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল, কাল যাব।

মনে থাকে যেন।—বলিয়া মঙ্গু নিজেদের গৃহে প্রবেশ করিল।

কুলিদের কাজে যাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কুলিরা তখন স্ত্রী-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধ সকলেই দলে দলে নিজেদের লাইন হইতে পথে নামিতেছে। কাহারও কাঁধে কোদালি, হাতে ঝুড়ি, কেহ বা তখনও কাপড়খানা আঁটিয়া পরিয়া লইতেছে, কোন রমণী শিশু-সন্তানটিকে পিঠে বাঁধিয়া লইতে ব্যস্ত, কেহ বা খেলো হুঁকাটাতে শেষ টানটা দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া এক হাতে কাছাটা ঠিক করিতে করিতে অপর হাতে

ঝুড়িটা উঠাইয়া লইল। এমনই করিয়া সকলে দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। টিলাবাবু এ-লাইন ও-লাইন ঘুরিয়া কুলিদের হাজিরা লইতেছেন। দেখিলেন, মনিয়ার আজও কাজে যাইবার কোন উদ্যোগ নাই। কালও তিনি মনিয়াকে তাঁহার বাসায় গিয়া একটু কাজ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে যায় নাই। মনিয়ার নিকটে আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, অত কি ভাবছিস? কাজে যেতে হবে না? না কি, আজও তোর অসুখ করেছে?

মনিয়া ভারী বিরক্ত হইল। সে টিলাবাবুকে একটা কু-উক্তি করিয়া গালি দিল।

টিলাবাবু গালি খাইয়া চটিলেন, কিন্তু তখন আর কিছু না বলিয়া মাত্র বলিলেন, ভাল চাস তো আমি যা বলি তাতে রাজি হ, নইলে তোকে আমি বাগান-ছাড়া ক'রে তবে ছাড়ব।—বলিয়া মনিয়ার প্রতি একটা ক্রূর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দিন গেল। সন্ধ্যা হয় হয়। কুলিরা কাজের হিসাব দিতেছে। টিলাবাবু দেখিলেন, মনিয়া আজও হাজিরা দেয় নাই।

বাসায় ফিরিয়াই তিনি মনিয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনিয়া বাবুর ছোকরা চাকরটাকে বলিয়া দিল, তোর বাবুকে এখানে আসতে বলগে।

কিছুদিন হইতেই এই বাবুটির মনিয়ার প্রতি একটু দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, হয় মনিয়াদের বস্তিতে আনাগোনা করিতেন, নয়তো তাকে নিজের বাসায় ডাকিয়া পাঠাইয়া এটা ওটা কাজের ফরমাইস করিতেন। মনিয়া প্রথমে বাবুর আদেশ ঠিক ঠিক পালন করিত। কিন্তু যখন বুঝিল, এই বাবুটির নজর তাহার প্রতি পড়িয়াছে, তখন হইতে তাহার বাসায় যাইতে সে ভয় পাইত এবং আর

যাইত না। কাজেই চাকরের মুখে মনিয়ার জবাব শুনিয়া তিনি মনিয়াকে তাঁহার আদেশ অমান্যের অজুহাতে সমুচিত শিক্ষা দিয়া বিকারগ্রস্ত মনের ঝাল মিটাইতে প্রস্তুত হইলেন।

টিলাবাবু মনিয়ার কুড়েঘরের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। মনিয়া তখন ঘরে প্রবেশ করিতেছে মাত্র। পায়ের শব্দে তাকাইয়া দেখিল, সত্য সত্যই টিলাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মনিয়ার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। টিলাবাবু কিন্তু তখন মনিয়াকে বহু মিনতি করিলেন, অথচ মনিয়া যখন কিছুতেই তাঁহার আকুল আহ্বানে সাড়া দিল না এবং স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিল, আজই সে টিলাবাবুর আচরণের কথা তাহার পিতাকে এবং ম্যানেজারবাবুকে জানাইয়া দিবে, তখন টিলাবাবু ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন। ভাবিলেন, কি? এত বড় স্পর্দ্ধা একটা কুলির মেয়ের? না হয় দু ছত্তর পড়াই শিখেছে, তবুও তো কুলি! শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ম্যানেজারকে তুই ব'লে দিবি? তবে ভাল ক'রেই বলগে যা।—বলিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া হাতের ছড়িটার আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দ্রুত গৃহে ফিরিয়া গেলেন। মনিয়া অস্ফুটে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

৬

এই কল্যাণপুর বাগানেই দীপকের জন্ম। জন্মাবধিই সে দেখিয়া আসিয়াছে, স্বয়ং ম্যানেজার হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই সামান্য অপরাধে কুলিদের উপর সময়ে অসময়ে কিরূপ অত্যাচার করিয়াছেন। শুধু চড়টা ঘুষিটা লাথিটার উপর দিয়া গেলে তো

অতি সহজেই কাটিয়া গেল। এইটুকু শাস্তি কোন একটি কুলি বা কুলিরমণীর ভাগ্যে ঘটা তো দৈনন্দিন ব্যাপার।

সে জনসন সাহেবকে এবং অনেক সময় তাহার পিতাকেও কুলিদের স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এবং চড়টা ঘুষিটা মারিতে দেখিয়াছে। আর এমনই অযথা অত্যাচারে কুলিরাও এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, এও যেন তাহাদের দিনমজুরির মতই একটা পাওনা বলিয়া ধরিয়া লইত। এরাও তাই যে কোন অজুহাতে কাজ এড়াইতে চাহিত এবং কিছু একটা রোগের ভান করিয়া ডাক্তারকে ভাড়াইতে চেষ্টা করিত। দুই চারিটি গাল-বকুনি, এক আধটা চড়-চাপড়, কিম্বা এমনই একটা ছোটখাট শাস্তি পাইয়া যদি শেষে বিনাশ্রমে চারিটি খাবার জুটিয়া যায় তো মন্দই বা কি! তা ছাড়া ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরিয়া একটা সার্টিফিকেট লইতে পারিলে একটা সিক-ডায়েটও অন্ততঃ মিলে। এমনই একটা মনোবৃত্তি লইয়া এমনই আবহাওয়ার মধ্যে জীবন কাটাইতে এরা অভ্যস্ত। আজ এ-দলে কাল ও-দলে হাতাহাতি মারামারিও একটা নিত্যকার ঘটনা।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া দীপকের মনেও বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, কুলিদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে ঐরূপ আচরণই প্রয়োজন।

কাজেই পঁচিশ বছরের যুবক দীপক নিজে ম্যানেজার হইয়া বসিয়াই কি ভাবে বাগানের কাজ শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইল এবং তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেল। জনসন সাহেবের আমলে তাহার পিতা কোথায় কিরূপ গোঁজামিল দিতেন, তাহাও দীপকের কিছু কিছু জানা ছিল। এবং জানা ছিল বলিয়াই অপরে যাহাতে তাহাকেও সেরূপে ফাঁকি

দিতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিল। এবং সে যে ডিসিপ্লিনের অভাব কিছুতেই সহ্য করিবে না—এ কথাও সকলকে জানাইয়া দিতে ভুলিল না।

দীপক কিন্তু তখন মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই, তাহার এই ডিসিপ্লিনের অছিলায় আজ একটা নারীদেহ এমনই করিয়া চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে এবং এই আঘাত তাহার নিজের বুকেও কম বিঁধিবে না।

মনিয়াকে বাংলোতে আনিয়া তাহার চাবুক খাওয়ার কাহিনী শুনিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে চাকর ঝিঙ্গুর হাত হইতে আলোটা লইয়া মনিয়ার পিঠের ফুলিয়া-উঠা চাবুকের দাগগুলি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সব কয়টা স্থানেই রক্ত জমাট বাঁধিয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে।

ঝিঙ্গু চাকরটা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। একটা কুলির মেয়ের প্রতি স্বয়ং ম্যানেজারের এরূপ দরদ দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। ভাবিল, হয়তো বা ভুলুয়া-সর্দ্দারের মেয়ে বলিয়াই মনিয়ার প্রতি বাবুর একটু বিশেষ দরদ আছে। আর বিবাহের আগে তো এই মনিয়া বাবুর কাছেই থাকিত; এইখানে থাকিয়াই কুলির মেয়ে হইয়াও সে কত লেখাপড়া শিখিয়াছে, নহিলে কি আর সে ইংরেজী পর্য্যন্ত লিখিতে পড়িতে পারিত! যাক, সে চাকর, অত কথায় তাহার কাজ কি? ঝিঙ্গু নিজের কাজে মন দিল।

এদিকে ঝিঙ্গুকে মনিয়ার পিঠে আইডিন লাগাইয়া দিতে বলিয়া দীপক তাহার শোবার ঘরে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য দিনেরই মত আরাম-কেদারায় গা এলাইয়া বসিয়া পড়িল। আজ কিন্তু পোষাকটিও ছাড়া হইল না। ঝিঙ্গু আসিয়া একটা টিপয়ের উপরে আলোটা রাখিয়া গেল।

দীপক আরাম-চেয়ারে বসিল বটে, কিন্তু আরাম তাহার মিলিল না। সে চিৎ হইয়া কপালের উপরে হাত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল মনিয়ার পিঠের কালো হইয়া ফুলিয়া-উঠা দাগগুলি, তাহার সেই ব্যথাকরুণ চাহনিটি। মনিয়া স্বামীহীনা হইয়াছে খুব বেশিদিন হয় নাই, অথচ ইহারই মধ্যে তাহার উপরে এই অত্যাচার। দীপকের নিকট এ যেন বিধাতার একটা নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু এতদিন যে একটা পর্দা দীপকের দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন তাহা মনিয়ার অশ্রুজলে কোথায় ধুইয়া মুছিয়া গেল। এই পঁচিশ বছর পরে দীপক আজ এক নূতন দৃষ্টি লইয়া কুলি-জীবনের দিকে তাকাইল। দেখিতে পাইল, এই হতভাগ্যদের জীবন কত দুঃখময়, কত দুর্ব্বিষহ! ঐ পশুটার কামনার অনলে ইন্ধন যোগাইতে রাজি হয় নাই বলিয়াই কি মনিয়াকে সে এমনই আঘাত করিল? যেখানে স্বামীর শোক ভুলিতে না ভুলিতেই নারীর প্রতি অপরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে, সেখানে হতভাগিনীদের সুখ তো দূরের কথা, শোক করিবারও যে অবসর নাই! কুলির মেয়ে, তাহার আবার স্বামী-শোক! তাহাদের আবার প্রেম, মমতা, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া! এরা বুঝি ভগবানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি! মনুষ্যোচিত কোনও সদ্‌বৃত্তিই বুঝি এদের প্রাণে সাড়া দেয় না, দিতে পারে না! এরা যেন কলের পুতুল! এমনই আরও কত ভাবনা দীপককে আজ পাগল করিয়া তুলিল।

দীপক ভাবিতেছিল, তাহাদের বাগানের পক্ষে যাহা সত্য, আরও শত শত বাগানের অতীত কেন, বর্ত্তমান ইতিহাসও কি তাহাই নয়? তাহার মনে পড়িল, জন্‌সন সাহেবের আমলের একটি ঘটনা। জন্‌সন

সাহেব একবার একটি গর্ভবতী কুলিরমণীকে লাথি মারেন, এবং তাহারই ফলে হতভাগিনী সেই রাত্রিতেই একটা মৃত সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করে। আর শুধু জন্‌সন সাহেবের সময়েই বা কেন, আজ-কালও তো বুটজুতার ঠোক্করে কুলিদের পিলে ফাটা এমন অসম্ভব কিছু নয়। এই সেদিনও তো জোড়হাটের একটা বাগানে একটি কুলিমেয়ের ঐভাবে মৃত্যু হইল। মনে পড়িল, তাহারই পিতার মুখে উপর জবাব দিয়াছিল বলিয়া একটা কুলিকে এমনই এক ঘুসি মারিয়াছিলেন যে, বেচারার একটা দাঁত ভাঙিয়া গিয়া অজস্র রক্তপাত হইয়াছিল। অথচ এই রকম আরও কত শত অত্যাচার উৎপীড়ন এরা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছে। ওরা যে ছিল চুক্তিবদ্ধ মজুর। ভয়ে কতবার আসামের জঙ্গল হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু পলায়নেও নিস্তার ছিল না। সরকারী আইনের বলে বাগানের ম্যানেজার কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াও তাহাদের ধরিয়া আনিয়া আটক করিতে পারিতেন। আর, একবার পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িলে পর যে অত্যাচার—না, আর সে ভাবিতে পারে না। আজকাল এসব আইন অপ্রচলিত, কিন্তু তবুও অগ্রিম টাকা দিয়া তাহাদিগকে প্রায় চুক্তিবদ্ধ করা হয় বইকি। পূর্ব্বের তুলনায় কুলিদের দৈনন্দিন জীবনের এদিকে ওদিকে একটু আধটু উন্নতি হইয়াছে বটে, তবুও এ হতভাগ্যদের জীবন কত দিকে কত অত্যাচারে জর্জ্জরিত! কোথায় কোন্ সুদূর পশ্চিমদেশের কিম্বা বিহারের বা ছোটনাগপুরের এক অখ্যাত পল্লী ত্যাগ করিয়া ইহারা পরিবারসুদ্ধ আসামের বাগানে আসিয়াছে, এবং কিছুদিন পর একটি একটি করিয়া বাগানের হাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে পেটজোড়া একটি প্লীহা গজাইয়া ভুগিয়া অবশেষে ধ্বংস পাইয়াছে। আর অধিক উপার্জ্জন! সেই বা কত! একটা

দীপক আরাম-চেয়ারে বসিল বটে, কিন্তু আরাম তাহার মিলিল না। সে চিৎ হইয়া কপালের উপরে হাত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল মনিয়ার পিঠের কালো হইয়া ফুলিয়া-উঠা দাগগুলি, তাহার সেই ব্যথাকরুণ চাহনিটি। মনিয়া স্বামীহীনা হইয়াছে খুব বেশিদিন হয় নাই, অথচ ইহারই মধ্যে তাহার উপরে এই অত্যাচার। দীপকের নিকট এ যেন বিধাতার একটা নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু এতদিন যে একটা পর্দ্দা দীপকের দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন তাহা মনিয়ার অশ্রুজলে কোথায় ধুইয়া মুছিয়া গেল। এই পচিশ বছর পরে দীপক আজ এক নূতন দৃষ্টি লইয়া কুলি-জীবনের দিকে তাকাইল। দেখিতে পাইল, এই হতভাগ্যদের জীবন কত দুঃখময়, কত দুর্ব্বিষহ! ঐ পশুটার কামনার অনলে ইন্ধন যোগাইতে রাজি হয় নাই বলিয়াই কি মনিয়াকে সে এমনই আঘাত করিল? যেখানে স্বামীর শোক ভুলিতে না ভুলিতেই নারীর প্রতি অপরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে, সেখানে হতভাগিনীদের সুখ তো দূরের কথা, শোক করিবারও যে অবসর নাই! কুলির মেয়ে, তাহার আবার স্বামী-শোক! তাহাদের আবার প্রেম, মমতা, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া! এরা বুঝি ভগবানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি! মনুষ্যোচিত কোনও সদ্‌বৃত্তিই বুঝি এদের প্রাণে সাড়া দেয় না, দিতে পারে না! এরা যেন কলের পুতুল! এমনই আরও কত ভাবনা দীপককে আজ পাগল করিয়া তুলিল।

দীপক ভাবিতেছিল, তাহাদের বাগানের পক্ষে যাহা সত্য, আরও শত শত বাগানের অতীত কেন, বর্ত্তমান ইতিহাসও কি তাহাই নয়? তাহার মনে পড়িল, জন্‌সন সাহেবের আমলের একটি ঘটনা। জন্‌সন

সাহেব একবার একটি গর্ভবতী কুলিরমণীকে লাথি মারেন, এবং তাহারই ফলে হতভাগিনী সেই রাত্রিতেই একটা মৃত সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করে। আর শুধু জন্‌সন সাহেবের সময়েই বা কেন, আজ-কালও তো বুটজুতার ঠোক্করে কুলিদের পিলে ফাটা এমন অসম্ভব কিছু নয়। এই সেদিনও তো জোড়হাটের একটা বাগানে একটি কুলিমেয়ের ঐভাবে মৃত্যু হইল। মনে পড়িল, তাহারই পিতার মুখে উপর জবাব দিয়াছিল বলিয়া একটা কুলিকে এমনই এক ঘুসি মারিয়াছিলেন যে, বেচারার একটা দাত ভাঙিয়া গিয়া অজস্র রক্তপাত হইয়াছিল। অথচ এই রকম আরও কত শত অত্যাচার উৎপীড়ন এরা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছে। ওরা যে ছিল চুক্তিবদ্ধ মজুর। ভয়ে কতবার আসামের জঙ্গল হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু পলায়নেও নিস্তার ছিল না। সরকারী আইনের বলে বাগানের ম্যানেজার কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াও তাহাদের ধরিয়া আনিয়া আটক করিতে পারিতেন। আর, একবার পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িলে পর যে অত্যাচার—না, আর সে ভাবিতে পারে না। আজকাল এসব আইন অপ্রচলিত, কিন্তু তবুও অগ্রিম টাকা দিয়া তাহাদিগকে প্রায় চুক্তিবদ্ধ করা হয় বইকি। পূর্ব্বের তুলনায় কুলিদের দৈনন্দিন জীবনের এদিকে ওদিকে একটু আধটু উন্নতি হইয়াছে বটে, তবুও এ হতভাগ্যদের জীবন কত দিকে কত অত্যাচারে জর্জ্জরিত! কোথায় কোন্ সুদূর পশ্চিমদেশের কিম্বা বিহারের বা ছোটনাগপুরের এক অখ্যাত পল্লী ত্যাগ করিয়া ইহারা পরিবারসুদ্ধ আসামের বাগানে আসিয়াছে, এবং কিছুদিন পর একটি একটি করিয়া বাগানের হাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে পেটজোড়া একটি প্লীহা গজাইয়া ভুগিয়া অবশেষে ধ্বংস পাইয়াছে। আর অধিক উপার্জ্জন! সেই বা কত! একটা

জোয়ান লোক সকাল-সন্ধ্যা খাটিয়া উপায় করে মাত্র চার পাঁচ আনা পয়সা; আর একটি নারী করে তুই আনা, বড় জোর নয় পয়সা। এদের দেহের বিন্দু বিন্দু রক্তেই আজ তাহার এই সমৃদ্ধি, যা কিছু ঐশ্বর্য্য। অথচ এদের অবস্থা পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজও তো প্রায় তেমনই আছে। পূর্ব্বে যেমন একটা প্লীহা দেহের সমস্ত সারভাগ গ্রহণ করিয়া হাত-পাগুলিকে পোড়া কাঠের মত করিয়া তুলিত, আজও তো তেমনই করে। বর্ষারম্ভে আগেও যেমন এদের হি হি করিয়া কম্প দিয়া জ্বর আসিত, আজও তো তেমনই আসে, আগে যেমন মদের নেশায় ডুবিয়া থাকিত, আজও তো তেমনই থাকে। তাহার নিজের বাংলোর কত উন্নতিই না হইয়াছে, অথচ কুলিবস্তির ঘরগুলি জন্সন সাহেবের আমলে যেমন ছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহার সামান্য পরিবর্ত্তনও হয় নাই।

দীপকের ভাবনার আজ আর শেষ নাই। আজ সে এই কুলি-মজুরদের দৈনন্দিন জীবনধারার কথা ভাবিয়া দুঃখ পাইল, কিন্তু ইহারও অধিক ব্যথা দিল তাহার শিক্ষাভিমান। সে উচ্চশিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ববোধ করিত, আর তাহারই বাগানে কিনা একটা নারীদেহ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া গেল ডিসিপ্লিনের অজুহাতে! দীপকের সমস্ত অভিমান এবং ক্রোধ গিয়া পড়িল শিক্ষিত ভদ্রযুবকদের উপর, যাহারা নিজেদের একটা উচ্চ সভ্যতার অধিকারী বলিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করে, যাহারা কুলিমজুরদের অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া গালি দিতেও কুন্ঠিত হয় না, তাহাদের কেন এ অসঙ্গত রুচিবিকার? টিলাবাবু একটা সামান্য লোক, তাহার কিনা এত সাহস! এমন জঘন্য মনোবৃত্তি! তাহার শিক্ষিত মন ইহাতে সায় দিবে কেন?

এই কুৎসিত কার্য্যের জন্য সে যতই নিজের কোন দায়িত্ব নাই বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহার বিবেকবুদ্ধি যেন ততই তাহাকে দায়ী

করিতে লাগিল। এমনই ভাবিতে ভাবিতে সে কখন যে আরাম-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মেঝেতে পায়চারি করিতেছিল, কিছু খেয়াল নাই। চৈতন্য হইল ভুলুয়ার ডাকে। সেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে দীপক চমকিয়া উঠিল। শুনিল, ভুলুয়া চীৎকার করিয়া মনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, মনিয়া, তুমকো কোন্ মারা?

টিলাবাবুনে হামকো চাবুক লাগায়া বাপুজি।—বলিয়া মনিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভুলুয়া তৎক্ষণাৎ দীপকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া লণ্ঠন হাতে বাহিরে গিয়া মনিয়ার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, চাবুকের দাগগুলি কালো হইয়া আছে। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। পরনের কাপড়ের যে অংশটুকুতে মেয়েরা পিঠের দিকটা আবৃত করিয়া রাখে, মনিয়া সেই অংশটুকুকে গলার উপরে জড়াইয়া সম্মুখে কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়াছে, পিঠের উপরে লাগিলেই জ্বালা করিয়া উঠে।

দুঃখে, ক্রোধে ও ক্ষোভে ভুলুয়ার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে হাতের মোটা লাঠিটা উঠাইয়া একেবারে সোজা দীপকের শোবার ঘরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তেমনই উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, বাবু, মনিয়াকো টিলাবাবুনে চাবুক লাগায়া। হাম উসকো শির লেয়েঙ্গে।—বলিয়া পুনরায় পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তাহার আজ একি মূর্ত্তি! ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া ভুলুয়ার এমনই উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার, তাহাও আবার তাহারই সম্মুখে, এই প্রথম। শৈশবে মাতৃহীনা একমাত্র কন্যা; তদুপরি বিবাহের তিন বছরের মধ্যেই বিধবা। কত বড় যাতনায় যে ভুলুয়া আজ এমন পাগলের ন্যায় হইয়া

উঠিয়াছে, দীপক তাহা স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল, এবং সেই জন্যই তাহার নিজের মনও এমনই অত্যাচারের প্রতি আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে শান্তকণ্ঠে কহিল, ভুলো, অত অধীর হ'লে তো চলবে না। তোকে কিছুই করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করব। তুই এখন মনিয়াকে নিয়ে স'রে যা।

দীপক শয্যায় শুইল। বালিশটা বুকে চাপিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম আসিল না। একবার তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিল, বাগানের সমস্ত কুলি বিদ্রোহ হইয়া টিলাবাবুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে শত চেষ্টাতেও থামাইতে পারিতেছে না। তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া রেডিয়াম ডায়েল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। বাগানের চতুর্দ্দিক অগণিত পাখীর ডাকে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর ঘুমাইবার চেষ্টা বৃথা। দীপক শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৭

এক মাস পর।

দীপকের বসিবার ঘরের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলটি অদৃশ্য হইয়াছে এবং তাহার স্থানে একখানা বড় গোল টেবিল রহিয়াছে। এই টেবিলটি ঘিরিয়া খান ছয় চেয়ার—চারখানা কাঠের ও দুইখানা বেতের, ঘরের এক ধারে একখানা বেঞ্চ ও দুই তিনটা কাঠের টুল পড়িয়া আছে। এক ধারে একটা মস্তবড় আলমারিতে বহু ইংরেজী বাংলা বই সাজানো আছে।

পৌষ মাস। কুয়াসাচ্ছন্ন শান্ত সন্ধ্যা। ঠাণ্ডা খুব অসহ্য না হইলেও একেবারে কম নয়। গোল টেবিলটির দুই দিকে দীপক ও অন্য একটি যুবক বসিয়া আছে এবং তৃতীয় একটি যুবক দাঁড়াইয়া কি সব আলোচনা করিতেছে এবং মাঝে মাঝে দরজার পর্দ্দার ফাঁকে বাহিরের দিকে তাকাইতেছে। মনে হয়, তাহারা যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ দীপক আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এই তো দাদামশায় আসছেন।

উপস্থিত সকলেই তখন দরজার দিকে তাকাইল।

বৃদ্ধ রামলোচনবাবু পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দীপক ও উপবিষ্ট যুবকটি উঠিয়া দাড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। দীপক বলিল, আপনার আসতে একটু দেরি হয়েছে, আমি তো ভাবছিলুম, ভুলুয়াকে পাঠাব।

কিন্তু রামবাবুর পশ্চাতে একটি নারীমূর্ত্তি দেখিয়া সকলের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হল। দীপক প্রথমে ছায়াকে দেখিতে পায় নাই, বলিল, এই যে ছায়া, আয়। আমি তো তোকে আগে দেখতেই পাই নি বোন। একেবারে দাদামশায়ের ছায়া হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলি যে।—বলিয়া দীপক হাসিয়া উঠিল।

তা না পাওয়াই তো স্বাভাবিক দীপকদা। আপনি এখন ম্যানেজার যে।—বলিয়া ছায়াও হাসিয়া উঠিল। এবং তাহার দৃষ্টি গিয়া উপস্থিত যুবকদ্বয়ের উপর পড়িতেই সে চোখ নামাইয়া লইল।

বৃদ্ধ রামলোচনবাবু কল্যাণপুর বাগানেরই অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, বর্ত্তমানে দীপকের কর্ম্মচারী। কিন্তু জন্‌সন সাহেবের আমল হইতেই তিনি এই বাগানে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তারকনাথ বাঁচিয়া থাকিতে তিনি এবং তারকনাথের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল। তিনি দীপককে শৈশব

হইতেই অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। দীপকও পূর্ব্বে যেমন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, আজও তেমনই করে। সংসারে বৃদ্ধের স্ত্রী ও শৈশবে মাতৃহীনা একমাত্র নাতনী ছায়া ভিন্ন আর কেহ নাই। বয়স যাট বছরের কাছাকাছি। এখন সংসারে এই নাতনীটিই তার প্রধান অবলম্বন। তিনি অমায়িক এবং সৎস্বভাবের লোক। দেবদেবীতে তাঁহার অবিশ্বাস না থাকিলেও অচলা ভক্তি যে আছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, মন তৈরি কর, দেখবে আর সব ঠিক হয়ে গেছে। মনেই যাদের গলদ, তাদের ওসব পূজো-আর্চ্চাতে কি হবে শুনি? আর দেখ, এই গরিবতুঃখীদের মুখে তুমুঠো অন্ন তুলে দিও, দেখবে তোমার গয়া কাশী যাবার চেয়ে অনেক বেশি পুণ্য হবে।

ছায়া মুরারীচাঁদ কলেজ হইতে ইকনমিক্স অনারসে এইবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে। রামবাবু নিজেই তাহাকে আনিতে গিয়াছিলেন। এই তুপরে কল্যাণপুরে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

দীপক ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, পরীক্ষা কেমন দিলে?

দিয়েছি এক রকম।—বলিয়া ছায়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

দীপক তখন যুবকদ্বয়ের একজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, দাদামশায়, এঁর নাম বিরিঞ্চি রায়, ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আমরা একসঙ্গেই পড়তাম। আজ তিন দিন হ'ল, ইনি আসামের জঙ্গল দেখতে এসেছেন। আর এর আগে উনি ইউরোপ ঘুরে এসেছেন।

দ্বিতীয় যুবক বাগানের নূতন টিলাবাবু হইয়া আসিয়াছেন, দীপকের নিকটতম আত্মীয়, কাজেই পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

পরিচয় করাইবার পালা দীপকের তখনও শেষ হয় নাই। ছায়াকে দেখাইয়া বিরিঞ্চিকে বলিল, এ হ'ল ছায়া, দাদামশায়ের নাতনী।

বিরিঞ্চি তখন ছায়ার দিকে চাহিয়া তাহাকেও একটি নমস্কার করিল। ছায়াও প্রতিনমস্কার করিলে পর বিরিঞ্চি ভিন্ন সকলেই এক একখানা চেয়ারে বসিল।

সকলে উপবেশন করিলে দীপক বিরিঞ্চিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আচ্ছা বেশ, দাদামশায়কেই জিজ্ঞেস করা যাক।

বিরিঞ্চি বইয়ের আলমারিটার দিকে যাইতে যাইতে বলিল, আমার কিছু আপত্তি নেই।

দীপক তখন তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বতর্কের ছিন্ন সূত্রটি ধরিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনিই বলুন দেখি দাদামশায়, খুব কড়া ডিসিপ্লিন ছাড়া কুলিদের দিয়ে কাজ আদায় করা চলে? বিরিঞ্চি বলছে, আমরা নাকি ডিসিপ্লিনের নামে অত্যাচার ক'রে থাকি।

বৃদ্ধ রামবাবু তাহার আবক্ষলম্বিত সুচিক্কণ শুভ্র শ্মশ্রুরাশিতে কয়েকবার অঙ্গুলিসঞ্চালন করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, ডিসিপ্লিন? হ্যাঁ, তা শৃঙ্খলা না হ'লে কোন কাজই হয় না বটে, তবে এ কথা কিছু মিথ্যা নয় দীপক, যে, আমরা ডিসিপ্লিনের ওপরে একটু বেশি জোরই দিই। ঐ মনিয়ার ব্যাপারটাই একটু ভেবে দেখ না কেন?

রামবাবুর কথাটা দীপকের একটু যেন বিঁধিল। বলিল, ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করার জন্য তো টিলাবাবু মনিয়াকে চাবুক মারেন নি দাদামশায়।

রামবাবু বলিলেন, সে কিন্তু ঐ কৈফিয়ৎই দিয়েছিল। আর তুমিও তো যাতে ভালরূপ ডিসিপ্লিন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে সবাইকে বলেছিলে।

তা বলেছিলাম বটে, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে একটি মেয়ের প্রতি অত্যাচার করতেও কি বলেছিলাম, দাদামশায়?

রামবাবু একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, না না, তুমি আমার

ভুল বুঝো না দীপক। আমি বলছিলাম যে, তোমাদের মুখে এই ডিসিপ্লিন কথাটা শুনলেই আমাদের—কর্ম্মচারীদের মাথা ঠিক রাখা দায় হয়ে ওঠে। আর আমাদের দায়িত্বজ্ঞানই বা কত? কি করলে যে ওপরওয়ালা খুশি হবেন, কিছু ঠাহর ক'রে উঠতে না পেরে, বিচারবুদ্ধি-শূন্য হয়ে লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে বসি। আর তোমরা অর্থাৎ বাগানের যারা ম্যানেজার বা মালিক, তারাও এই কথাটার ওপরে এত বেশি জোর দাও যে, যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মনে এ ধারণা জন্মায়—ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়েছে, তবে বেচারার চাকরি নিয়েই হয়তো টানাটানি পড়ে।

ডিসিপ্লিন কথাটার উপরে রামবাবু খুব খুশি ছিলেন না। এইবার সুযোগ পাইয়া প্রাণের কথা কয়টি অকপটে বলিয়া ফেলিলেন।

দীপক বলিল, কিন্তু ষ্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন ভিন্ন কোন বড় ইনস্টিটিউশন গ'ড়ে উঠতে পারে না দাদামশায়।

বিরিঞ্চি ইতিমধ্যে একটা টুল টানিয়া টেবিল হইতে একটু সরিয়া বসিয়া একখানা ইংরেজী বই খুলিয়া পাতাগুলি একটির পর একটি উল্টাইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ বই হইতে মুখ তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল, ও কথা কেউ অস্বীকার করে নি, দীপক। আমিও বলেছি, দাদামশায়েরও বোধ করি এই মত যে, এর ওপরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরই তোমরা দিয়ে এসেছ, যাকে অত্যাচারের নামান্তর বলা অন্যায় হবে না।

দীপক বলিল, কিন্তু তুমি জান না বিরিঞ্চি, কড়া শাসন না হ'লে এই নিরেট মূর্খ লোকগুলোকে দিয়ে কোন কাজই করানো চলে না।

বিরিঞ্চি বলিল, সে হয়তো ঠিক, কিন্তু তোমরা যে ডিসিপ্লিনের নামে এই হতভাগাদের ওপর রীতিমত অত্যাচার কর, সে তোমরা

বোঝ না। কড়া শাসনের অজুহাতে তোমরা মনুষ্যত্বের দিকটা একেবারেই বাদ দিয়ে যাও, এবং তাই করতে গিয়ে তোমরা নিজেরাও যে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করছ, সে ধারণাই তোমাদের থাকে না।

দীপক বলিল, তুমি যে আইডিয়া থেকে কথা বলছ বিরিঞ্চি, সে আইডিয়াকে সব সময়ে কাজে খাটানো চলে না।

বিরিঞ্চি বন্ধ বইয়ের ফাঁকে তর্জ্জনীটি ঢুকাইয়া বইখানা ধরিয়া ঘরের মেঝেতে আবার পায়চারি করিতে লাগিল। বলিল, সে আমিও অস্বীকার করি না, দীপক। তবে আমাদের দেশের মজুরশ্রেণী শিক্ষাদীক্ষার যে স্তরে আজও রয়েছে, তাতে এরা ডিসিপ্লিনের মর্ম্মকথা কিছুই বোঝে না। কাজেই তোমাদের আদেশ এরা মেনে চলে, কতকটা ভয়ে এবং অনেকটাই পেটের দায়ে। নইলে এ কথা কিছু মিথ্যা নয় যে, তোমরা কুলিমজুরদের প্রতি আজও পশুবৎ ব্যবহারই কর।

রামবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, বিরিঞ্চিবাবু, আপনি দীপকের ওপর অবিচার করছেন। দীপকের ব্যবহারের সঙ্গে অন্যান্য বাগানের ম্যানেজারদের তুলনা চলে না। কুলিদের ওপরে যে অকথ্য অত্যাচার আমি নিজের চোখেই দেখেছি, সে মনে হ'লে আজও চোখে জল আসে। অথচ চোখের জল ফেলা ভিন্ন আমাদের কথাটি কইবারও ক্ষমতা ছিল না।

বিরিঞ্চি বলিল, আমি দীপকের ওপর ব্যক্তিগত অবিচার কিছু করছি না দাদামশায়। আমি ওকে আসামের চা-বাগানের মালিকদেরই একজন ব'লে ধ'রে নিচ্ছি মাত্র।

রামবাবু বলিলেন, সে বলতে পারেন আপনি।

বিরিঞ্চি বলিল, চা-বাগানে কুলিদের ওপর অত্যাচারের খবর আমরা মাঝে মাঝে কাগজে দু একটা পড়েছি বটে। কিন্তু তার প্রমাণ

পেলাম, আজ এই বাগানেরই একটি কুলিমেয়েব চাবুক খাওয়াব কথা শুনে। আর এও বুঝলাম যে, আমবা এব কতটুকুই বা জানতে পারি।

রামবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ছায়া তখন বলিল, মনিযা সেই ভুলু-সর্দ্দারের মেয়ে না, দাদু ?

রামবাবু বলিলেন, হ্যাঁ।

মনিযার কি হয়েছে ?

দীপক তখন মনিয়ার চাবুক খাওয়ার ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিল, তবে আসল কারণটা যথাসম্ভব গোপন করিয়াই গেল।

বিরিঞ্চি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এই মনিযার পিঠের চাবুকই চা-বাগানেব ম্যানেজার দীপকের ভাবধারায একটা বিপ্লব বাধিয়ে দিযেছে, না ?—বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিরিঞ্চির হঠাৎ এই উচ্ছ্বসিত আবেগের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া নিজের অজ্ঞাতেই ছায়া তাহার দিকে চোখ ফিরাইয়া তাকাইতেই তাহার সঙ্গে বিরিঞ্চির চোখোচোখি হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য কেহই ইচ্ছা সত্ত্বেও যেন চোখ নামাইতে পারিল না। কেন এমন হইল, কেহই বুঝিল না। ছায়া মনে মনে বলিল, ব্রুট ! কিন্তু কি ভাবিয়া উঠিযা দাড়াইযা কহিল, দাদু, তুমি ব'স, আমি বউদিব কাছে যাচ্ছি।

তোব বউদি এখানে নেই রে ছায়া।—দীপক বলিল।

তবুও যেন এই সভাস্থলে বসিয়া থাকিতে কি জানি কেন ছায়াব মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে দীপককে বলিল, ভুলো-সর্দ্দারকে একটু ডেকে দিন না, দীপকদা। আমি যাই, দিদিমা হযতো ভাবছেন। —বলিয়া বারান্দায় আসিযা দাড়াইল।

দীপককে উঠিতে হইল না। নবাগত টিলাবাবুটি উঠিয়া গিয়া ভুলুয়াকে ডাকিয়া দিলেন।

ছায়া টিলার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

৮

আমাদের প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা কিছুই হ'ল না কিন্তু।—বলিয়া দীপক রামবাবুকে বলিল, আচ্ছা, গত মাসে বাগানের পাঠশালাতে ছাত্রসংখ্যা হয়েছে কত?

নব্বুই জন।

সবাই কি আমাদেরই বাগানের ছেলে?

না, দুচারজন আশপাশের বাগান থেকেও আসে।

ওরা তা হ'লে লিখতে পড়তে চায়?

ঠিক যে চায় তা নয়। আর চাইলেই বা কি হবে? সীজন আরম্ভ হ'লে কি আমরাই অতগুলো ছেলেকে বাগানের কাজ ছেড়ে স্কুলে যেতে দিতে পারব? না, ছেলেদের বাপ-মাই চাইবে?

তখন না হয় নাইট-স্কুল হবে। কিন্তু স্কুল কিছুতেই বন্ধ হ'তে পারবে না দাদামশায়। আমার বাগানের ছ বছর থেকে পনরো বছরের সকলকেই স্কুলে আসতে হবে।

রামবাবু বলিলেন, এখনই অত চাপ দেওয়া ভাল নয় দীপক। শেষে কুলিরা যদি আবার বিগড়ে যায় তো, আর এক ফ্যাসাদে পড়তে হবে কিন্তু।

তা বটে, কিন্তু তবুও ওদের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা চলেছে, তা যেন বন্ধ না হয়, দেখবেন।

না না, সে আমি কিছুতেই বন্ধ হ'তে দোব না। তবে আমাদের এই স্কুল ক'রে ওদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টাকে ওরা কেমন যেন একটু সন্দেহের চোখে দেখছে।

বিরিঞ্চি বলিল, সে কিছু অস্বাভাবিক নয়, দাদামশায়। এতদিন বাগানের মালিকেরা যাদের কলের ন্যায় খাটিয়েছে, তারা যদি হঠাৎ তাদের সত্যিকারের কোন উপকারও করতে চায়, তবু তারা প্রথমে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হবেই। তারা হয়তো ভাবছে, এই স্কুল করার ভেতরেও মালিকদের একটা কিছু মতলব আছে ; যেমন আমরা মনে করি, যখনই বিলেত থেকে আসে বড় বড় হিতোপদেশের - বাণী। তবে কিছুদিন তাদের মধ্যে কাজ করার ফলে যদি ওরা বুঝতে পাবে, বাগানের মালিকেরা তাদের ভালর জন্যেই এসব মঙ্গল-প্রচেষ্টা করছে, তখন কুলিরা নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। তার আগে নয়। আরও দেখ দীপক, আমাদের দেশের কুলিমজুরেরা যেন সহানুভূতির কাঙাল। যাদের কাছ থেকে এরা এতটুকু প্রাণের দরদ পায়, তাদের কাছেই ওরা কেনা হয়ে থাকে। ঠিক এ মনোভাবটা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাবে না। এটা ভারতের একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য। তখন এদের দিয়ে যা খুশি করানো চলে। আর এরা তখন এমনই সব কাজ করতে প্রস্তুত হয়, যা ভয় দেখিয়ে তো দূরের কথা, লোভ দেখিয়েও চলতো না।

দীপক বলিল, না হে বিরিঞ্চি, না। কুলিমজুরদের ব্যাপারে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই কিনা, তাই এসব বলছ। নইলে দেখতে, ওসব মঙ্গলামঙ্গল বোঝবার ক্ষমতাই ওদের নেই। জোরজবরদস্তি ক'রে কিছু করাও তো, ওরা করবে। আর তুমি ভদ্রভাবে ভালমানুষ সেজে ওদের মাঝে যাও, তোমার দিকে ওরা ফিরেও তাকাবে না। আর একটা মজার কথা বলছি, শোন। আপনিও শুনুন, দাদামশায়। আজ বোধ

করি দিন তুই হবে, তুটো কুলি-ছোকরা এসে আমার কাছে নালিশ জানাচ্ছে এই ব'লে যে, ওরা তুদিন স্কুলে গেছে, অথচ বাবু তাদের হাজিরা মোটেই দিলেন না।—বলিয়াই দীপক হাসিয়া উঠিল। উপস্থিত সকলেই সে হাসিতে যোগ দিল, দিল না কেবল বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি বলিল, এতে হাসবার কিছু নেই দীপক, আর এ তো অসম্ভব কিছু নয়। তোমার বাগান এবং স্কুলের মধ্যে কি যে প্রভেদ, এরা কিছু বোঝে না। আর ঐ যে বললে, ভদ্রভাবে ভালমানুষ সেজে ওদের কিছু বললে ওরা উল্টো বোঝে, সেও অসম্ভব নয়। কারণ শতাব্দীরও অধিক কালের লাঞ্ছনা, অবিচার, অপমান এবং ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনযাপন এদের নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা করবার শক্তিও একেবারে নিঃশেষে লোপ ক'রে দিয়েছে। এরা ঐ অবস্থায় এতই অভ্যস্ত যে, নতুন একটা কিছু পরিবর্ত্তন দেখলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে। তোমাদের ওরা ভয় করে, ভক্তি করে না। বিশ্বাস তো নয়ই।

রামবাবু এতক্ষণ নীরবেই বসিয়া ছিলেন; বলিলেন, বিরিঞ্চিবাবু ঠিকই বলেছেন। আমাদের প্রকৃত দরদও যদি কুলিদের প্রতি জেগে থাকে, ওরা বুঝবে কেমন ক'রে? আমাদের কাজ এবং ব্যবহারের দ্বারাই ওদের ঐ মনোভাবের পরিবর্ত্তন করতে হবে।

রামবাবুকে প্রতিবার 'আপনি' সম্বোধন করিতে শুনিয়া বিরিঞ্চি বলিল, আপনি দীপকের দাদামশায়, আমারও তাই। আমাকে আর 'আপনি' ব'লে লজ্জা দেবেন না।

বিরিঞ্চির কথায় রামবাবু প্রথমে একটু লজ্জিত হইলেন। পরে হাসিয়া বলিলেন, তা প্রথমেই 'তুমি' বলতে একটু বাধবাধ ঠেকে কিনা, তাই। এখন থেকে না হয় 'তুমি'ই বলব।

দীপক এতক্ষণ কি যেন ভাবিতেছিল। বলিল, আচ্ছা দাদামশায়, ছায়াকে দিয়ে একটা মেয়ে-স্কুলও স্টার্ট ক'রে দিলে কেমন হয়?

রামবাবু বলিলেন, কথাটা কিছু খারাপ নয়, দীপক। তবে মাস্টার যাকে নিযুক্ত করতে চাইছ, সে এ কাজের ভার নিতে রাজি কি না আমার সন্দেহ আছে।

সে আমি রাজি করাব।

বেশ, তা যদি পার, তবে আসছে মাস থেকেই আরম্ভ কর না!

বিরিঞ্চি বলিল, আমি কিন্তু তোমাকে সেইদিনই বলেছিলুম দীপক, যে, যদি সত্যিকার শিক্ষার ভেতর দিয়েই এদের উন্নতি করতে চাও তো, এদের মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখানো দরকার। কারণ, সংস্কার কেবল বাইরের দিক থেকে না ক'রে ভেতরের দিক থেকে আরম্ভ করলেই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

এমন সময় রামবাবুর চাকর লণ্ঠন হাতে পর্দার ফাঁকে দেখা দিয়া জানাইল যে, গিন্নীমা বসিয়া আছেন এবং শীতও ক্রমে বাড়িতেছে।

রামবাবু বিদায় হইলেন। সভাও ভঙ্গ হইল।

৯

বিরিঞ্চির বাড়ি কলিকাতায়। পিতা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া পুত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। সচরাচর পিতার সঞ্চিত অর্থ পুত্রে যেরূপ ভাবে ব্যয় করিয়া থাকে, বিরিঞ্চির রুচি ঠিক সেদিকে গেল না। সে এম. এ. এবং ল পাস করিয়া একবার ইউরোপ ঘুরিয়া আসিল, রাশিয়াতেও ঘুরিয়া আসিতে ভুলিল না। সে দেশে ফিরিয়াছে বছর দুই পূর্বে।

আসামের কোন এক চা-বাগানে পিতার বহু টাকার শেয়ার ছিল ; সেই সূত্রে বাল্যকাল হইতেই পিতার নিকট আসামের চা-বাগানের বহুবিধ গল্পগুজব সে শুনিত, এবং তখন হইতেই তাহার কেমন ইচ্ছা হইত, এই জঙ্গলে ঘেরা পার্ব্বত্য ভূখণ্ডটি একটি বার স্বচক্ষে দেখিয়া লয়। কিন্তু নানা কারণে, অর্থাৎ তেমন কোন কারণ না থাকিলেও, তাহার সে ইচ্ছা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু এইবার আসামের চা-বাগানের শেয়ার লইয়া কি এক গোলমালের সৃষ্টি হওয়াতে ইহাকেই সুযোগ মনে করিয়া আসাম-উপত্যকার বহু চা-বাগানেই ঘুরিয়া অবশেষে এই কাছাড় জেলায় কল্যাণপুর বাগানে বন্ধু দীপককে দেখিতে আসিল।

কেমন একটা খেয়ালী ভবঘুরে ভাব। আপাদমস্তক খদ্দরমণ্ডিত। চোখে কাচের পুরু চশমা, হাতে একটা সাদা বেতের লাঠি, পায়ে স্যাণ্ডেল —এই তাহার পোষাক। তদুপরি কালো চেহারাটা তেমনই মোটা ; কিন্তু তাহার মুখের দিকে তাকাইলে সহজেই বুঝা যায় যে, সে নিরভিমান এবং অমায়িক। এই লোকটিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেকটা ঘুরিয়া আসিয়াছে— এ কথা পূর্ব্বে জানা না থাকিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না।

বিছানায় শুইয়া বিরিঞ্চি একখানা ইংরেজী উপন্যাস পড়িতেছিল। মায়ের আগমনে উঠিয়া বসিয়া বলিল, তুমি আমায় ডেকেছ, মা ?

হ্যাঁ, বাবা। চল, আজ রামবাবুর বাড়ি যাব। দীপককে ব'লে আর হচ্ছে না। ওর সময়ই হয়ে ওঠে না। তুমিই আমায় নিয়ে চল, বাবা। এখানে থাকলে আমার সময় ফুরুতে চায় না। সব দিন আবার আমিও ফুরসৎ ক'রে উঠতে পারি না।

দীপকের মাকে বিরিঞ্চিও 'মা' বলিয়াই ডাকিত। সে শৈশবে

মাতৃহীন। কাজেই বহুদিন পর সেও সত্যই মাতৃস্নেহ পাইয়া কেমন একটা তৃপ্তির আস্বাদ পাইল।

চল মা, আমি জামাটা গায়ে দিয়ে নিই।—বলিয়া বিরিঞ্চি খাট হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি জামাটা পরিয়া লইয়া স্যাণ্ডেল পায়ে দিল।

সন্ধ্যার একটু পর।

মা বাহিরের বসিবার ঘরের পাশ দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বিরিঞ্চি বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। ডিজ লণ্ঠনের আলোতে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে এই অপরিচিত যুবকটিকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ছায়া খুবই বিস্মিত হইল, কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে, আপনি, আসুন। ছায়ার সম্মুখে টেবিলের ওপাশে যে ছোট মেয়েটি বসিয়া ছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিরিঞ্চিকে আসন ছাড়িয়া দিল।

বিরিঞ্চি হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, মা এসেছেন আপনাদের বাড়িতে। ওঁকে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, এই সুযোগে আপনাদের বাড়িটাও দেখে যাই। দাদামশায় আছেন তো?

ছায়া বলিল, না, তিনি একটু হাটের দিকে গেছেন। এখনও ফেরেন নি।

আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।

হ্যাঁ, এই বসছি।—বলিয়া ছায়া বসিল। একটি অচেনা যুবকের মুখোমুখী এমনই করিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা বলা উচিত কি না—এই প্রশ্নটা মনে জাগিয়া তাহাকে ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছিল। অথচ বিরিঞ্চি তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া যখন অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বসিতে অনুরোধ করিল, তখন আর কোন চিন্তা করিবারও অবসর রহিল

না। ছায়া এবং বিরিঞ্চির মধ্যে কাঠের টেবিলটি মাত্র ব্যবধান। ডিজ লণ্ঠনটি উজ্জ্বল আলোয় ছোট্ট ঘরখানিকে ভরিয়া রাখিয়াছে।

ছোট্ট মেয়েটিও ইতিমধ্যে তাহার বই লইয়া কখন চলিয়া গিয়াছে।

বিরিঞ্চি বলিল, আপনিও কি এ বাগানেই থাকেন?

ছায়া ছোট্ট একটি 'হ্যাঁ' বলিয়া চুপ করিল।

বিরিঞ্চি বলিল, এই চা-বাগানে আছেন আজ কদ্দিন?

আমি ছোটবেলা থেকেই ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে মানুষ। আমার মা-বাবা দুজনেই আমাকে দু বছরের রেখে মারা যান। তখন থেকেই আমি এখানে।—বলিয়া ছায়া খুব চাপিয়া চাপিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এই প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বিরিঞ্চি বলিল, কিন্তু কি আশ্চর্য! আমি আসামের যতগুলো বাগান দেখলাম, তার সব কটারই একই অবস্থা। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা এরা বাগান থেকে লাভ ক'রে নেয়, তার এক পার্সেণ্টও এরা কুলিমজুরদের জন্যে ব্যয় করে ব'লে মনে হয় না। আপনাদের কি অভিজ্ঞতা?

ছায়া তাচ্ছিল্যভরে কহিল, যদি তাই করে তো, বছরের শেষে আপনাদেরই ডিভিডেণ্ডের অঙ্কে কম পড়বে যে।—বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিরিঞ্চি বিস্মিত হইয়া ছায়ার দিকে তাকাইল। ছায়াও তাহার পানে চাহিল। বিরিঞ্চি বলিল, আমাদের ডিভিডেণ্ড মানে?

কাল দাদু বলছিলেন, আপনারও নাকি আসাম-উপত্যকার কোন চা-বাগানে বহু টাকার শেয়ার আছে।—বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

বিরিঞ্চি লজ্জিত হইল। বলিল, তা আছে বটে। বাবা অনেকগুলো

শেয়ারই কিনেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ আপনার দাদু এ কথা বলছিলেন কেন ?

না, এমনিই বলছিলেন।

তা যাক। কিন্তু দেখুন মিস দত্ত, ডিভিডেণ্ড দু টাকা কম দিয়েও যদি ঐ কুলিদের জন্যে কিছু টাকা খরচা হয়, আমি তাতে মোটেই আপত্তি করব না।

আপনি হয়তো রাজি, কিন্তু অন্যেরা যদি আপত্তি করে ? তা ছাড়া সত্যি কথা এই যে, কুলিদের যতটুকু প্রয়োজন তা এরা পাচ্ছেই। এদের মেয়ে পুরুষ মিলে উপার্জ্জন করে, কাজেই অভাব-অনটন তেমন নেই। আর এদের প্রয়োজনই বা কতটুকু ? তা ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সা পেলেই এরা মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেয়।

এদের মদ খাওয়ার অভ্যাসটা বুঝি খুব বেশি ?

হাতে পয়সা থাকা পর্য্যন্ত এরা মদেই ডুবে থাকে, মেয়েগুলো পর্য্যন্ত তাই। এদের হাতে প্রয়োজনের বেশি টাকা না থাকাই ভাল।

কিন্তু সত্যিই কি এরা নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচার পরিমিত অর্থ উপায় করতে পারে ? আমার মনে হয়, এরা পেটের খোরাক না যুগিয়েই যা কিছু সামান্য উপার্জ্জন সব মদের জন্যে ঢেলে দেয়।

এ কথা হয়তো অনেকটাই ঠিক ; কিন্তু যারা রীতিমত পরিশ্রম করে, তাদের তা সত্ত্বেও বিশেষ অভাব হয় না। আর এদের তো জীবনযাত্রার মান ব'লে কিছু নেই। কাজেই আমার মনে হয়, এরা দৈনিক তিন চার আনা যা পায়, ঐ দিয়েই পুষিয়ে নেওয়া উচিত।

বলেন কি আপনি ? একটা জোয়ান লোক সকাল সন্ধ্যা খেটে পাবে মাত্র চার আনা ? আর মেয়েদের তো বোধ করি তারও কম ? আর এতেই বলছেন যথেষ্ট ? তাও আবার সপ্তাহে ছ দিন—না ?

আপনি একটা কুলিমজুরের দৈনিক তিন চার আনা রোজগার কম মনে করছেন ; কিন্তু জানেন, আমাদের গ্রামবাসী চাষীদের তুলনায় এরা অনেক ভাল খায়, পরে এবং থাকেও? আজকাল গ্রামের যা অবস্থা, একটা লোক সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত অবধি খেটে বোধ করি তার চেয়েও কম উপায় করে। তা ছাড়া তাদের তো মেয়েদের রোজগার ব'লে কিছু নেই। বাগানের কুলিদের অবস্থা খারাপ বলবেন তা হ'লে কি ক'রে?

কুলিদের অবস্থা খারাপ নিশ্চয়ই বলব। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, গ্রামবাসীরা যেখানে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়, কুলিমজুরেরা সে জায়গায় মদের জন্যে সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়। অথচ রাশিয়াতেও দেখে এসেছি যে, ঠিক এ অবস্থাটা কুলিমজুরের দল আর মেনে নিতে রাজি নয়। মুষ্টিমেয় লোক অজস্র পর্য্যাপ্ততার মধ্যে বাস করবে আর শতকরা নব্বই জন, যারা বুকের রক্ত দিয়ে ঐ প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি করছে, তারা অনাহারে মরবে! তারা চায় এই ধন, অসাম্যের উচ্ছেদসাধন।

দাদুর কাছে শুনেছি, আপনি ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। আচ্ছা, রাশিয়ার কথা আমরা কাগজে এবং বইয়ে যা পড়ি, তার সবই কি সত্যি? তাদের দেশে কি গরিব ব'লে কেউ নেই?

গরিব একেবারে নেই, এ কথা বলব না। তবে আমাদের দেশের মত অমন বৈষম্য আর তাদের মধ্যে তারা থাকতে দেয় নি। অন্তত সকলেই পেট ভ'রে দুবেলা খেতে পায়।

সে অবশ্য ভাল কথা। তবে এ কথাও ঠিক যে, আমাদের এসব চা-বাগানেও উপবাসে কেউ থাকে না।

তা না থাকতে পারে মিস দত্ত ; কিন্তু উপবাসে না থাকাটাই তো আর বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সত্যিকারের জীবন ব'লে কি

এদের কিছু আছে? এ কথা কি অস্বীকার করবেন যে, এরা দেহের মধ্যে প্রাণটাকে আটকে রেখেছে মাত্র? আমার কিন্তু এদের দিকে তাকালেই কেমন দুঃখ হয়।

সে আপনার পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক। কারণ চা-বাগানে আপনি তো কখনও আসেন নি কিনা। তা ছাড়া আপনি আমাদের দেশের কুলিদের তুলনা করছেন ইউরোপীয় মজুরদের সঙ্গে।

সে অবশ্য ঠিক। আমাদের দেশীয় মজুরদের তুলনায় ইউরোপীয় মজুরদের অবস্থা অনেক ভাল, যদিও উভয় দেশের সমস্যা একই রকমের। ঐ ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি মজুরদের বুকে পাথরের মত চেপে রয়েছে। তাই আমার কেমন মনে হয়, যদি পারতাম, সবাইকে —বেশি কিছু না হোক—অন্তত আমার মত খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ক'রে দিতাম। আর তারই সঙ্গে ভেঙে চুরমার ক'রে দিতাম ঐ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে।

ছায়া চোখ তুলিয়া আর একবার এই অপরিচিত লোকটির প্রতি চাহিল। দেখিল, বিরিঞ্চি যেন ভাবের কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহার কালো মুখের উপর কি এক অপূর্ব্ব আভা!

বিরিঞ্চি বলিতেছিল, অথচ আপনারা কুলিমজুরদের এই অবস্থাটা দেখে দেখে এমনই অভ্যস্ত যে, একেই নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। এর মধ্যে যে কত বড় অবিচার এবং অন্যায় রয়েছে, তা কিন্তু আপনারা ভাবতেও পারেন না! আর কুলিমজুরদের বর্ত্তমান অবস্থাটা এমনই গা-সহা হয়ে গেছে যে, এইই তাদের জীবনধারার স্বাভাবিক চরম পরিণতি ব'লে ওরাও মেনে নিয়েছে।

এদেশের কুলিমজুরেরা খুব দুঃখে আছে—এ কথাই বা আপনি ভাবছেন কেন?

তবে আপনি কি বলতে চান, এদের দুঃখকষ্ট কিছু নেই ?

যদি এরা কোন অনুযোগ না ক'রে নিজেদের অবস্থায় তুষ্ট থাকে তো নিশ্চয়ই ভাবব, এদের কোন দুঃখ নেই। আর যদি সত্যিকার কোন অভাব-অভিযোগ থাকত, অবশ্যই এরা তা জানাত।

জানাত ? কিন্তু কার কাছে জানাবে এরা ? কে শুনবে এদের ঐ দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী, মর্ম্মবেদনার ইতিহাস ? যারা ভোগ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবে রয়েছে, তাদের সে অবসর কই ? কই সে প্রাণ ?

ছায়া বলিল, আপনি মিথ্যে ব্যাকুল হচ্ছেন, মিঃ রায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সবই তো মানব-মনের এক একটা বিশিষ্ট অনুভূতি মাত্র। কুলিমজুরেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে এতই অভ্যস্ত যে, তারা মনেও করে না, এতে কোন দুঃখকষ্ট রয়েছে। অথচ বাইরের লোক এসে তাদের প্রাণে সে অনুভূতি, সে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে এবং তাতেই এই লোকগুলোরও দুঃখকষ্টের বোধ জেগে ওঠে।

তা হ'লে আপনার মতে বাইরের লোক জাগিয়ে না দিলে অভাব-অনটনের বোধও তাদের থাকে না, না ?

থাকে নাই তো। তারা যা পাচ্ছে তাতেই তুষ্ট থাকে।

এই যে তুষ্টি, এ নিতান্ত বাহ্যিক এবং বাধ্যতামূলকও বটে। এ হ'ল অক্ষমের—অশক্তের ভান করার মত।

কিন্তু এ কি সত্যি নয় যে, মানুষ যত পায়, ততই তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে ওঠে, অথচ যারা পায় না, তারা চায়ও না ?

সত্যি মিস দত্ত, যারা পায় না, তারা চায়ও না। কেন না, এ চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্য দিয়ে যে কত বড় আত্মতৃপ্তি আসে, সে ধারণা তো দূরের কথা, অনুভূতিটা পর্য্যন্ত এদের নেই। আর এতেই যে শান্তি এবং সান্ত্বনা রয়েছে ব'লে লোকে বিশ্বাস করে, সেও আসে মনের একটা

অচেতন আড়ষ্টতার ভাব থেকে। নিয়ত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার পীড়নে মন যায় তাদের অচেতন হ'য়ে, যাকে বলা যেতে পারে, মনের অপমৃত্যু।

আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, মিঃ রায়। মুষ্টিমেয় লোক বাইরে থেকে এসে প্রোপাগাণ্ডা ক'রে এমনই কতকগুলো ধারণা এদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, যা এরা না পারে ভাল বুঝতে, না পারে তার কোন মীমাংসায় পৌঁছতে। অথচ জ্ব'লে মরে এক অজ্ঞাত আশা-আকাঙ্ক্ষার যাতনায়।

না হয় মেনে নিলুম আপনার যুক্তি যে, এই অজ্ঞ মূর্খ শ্রমিকের দল তাদের প্রয়োজন ঠিক যে কি এবং কতটুকু, তা বুঝিয়ে বলতে পারে না এবং বাইরের লোক এসে তা বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তাই ব'লে কি তাদের সে প্রয়োজন নেই বুঝে নিতে হবে? আর সত্যিই যদি তাই হয় তো, মানব-শিশু আজ থেকে একটাও বাঁচবে না; আমরাও বাঁচতাম না। শিশু নিজের প্রয়োজন জানাতে পারে না, পারে শুধু কাঁদতে. আর এই যে কান্না, সেও একটা অনুভূতির প্রেরণায়। এই কান্না দেখেই মায়েরা সন্তানের বেদনা কোথায়, কি তার প্রয়োজন, সব নেয় জেনে এবং প্রতিকারও করে তখনই। আমাদের দেশের শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থাও যে কতকটা ঐ শিশুরই মত। এরা শুধু কাঁদতেই জানে, অথচ নিশ্চিত কি যে তাদের চাই, তা ঠিক বোঝে না, বোঝাতেও পারে না।

ছায়া যেন আর কিছু বলিতে পারিল না। বিরিঞ্চির মুখের দিকে তাকাইল। এমন সময় 'কই বিরিঞ্চি, চল বাবা, আমরা যাই। এই যে ছায়া, তুমি কবে এলে, মা?'—বলিয়া মা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ছায়া এবং বিরিঞ্চি উভয়েই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছায়া বলিল, এই কদিন হ'ল এসেছি। সেদিন তো গিয়েছিলাম আপনাদের বাসায়, কিন্তু বউদি ওখানে নেই, আর আপনিও শুয়ে রয়েছেন জেনে আর ভেতরে যাই নি। দীপকদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বেশ, বেশ। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে এলে তো?

হাঁ, কাকীমা।

আচ্ছা, আজ তবে আসি, মা। কাল পরশু একবার যেও।

তা যাব, কিন্তু বউদিকে আনিয়ে ফেলুন। আর কতদিন উনি বাপের বাড়ি থাকবেন?

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, এখনও তা বুঝবে না মা। বিয়ে হোক, তখন বুঝবে। আচ্ছা আসি। চল বাবা, বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি আগে আগে এবং মা পশ্চাতে হাঁটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বিরিঞ্চিরও ছায়ার কাছ হইতে বিদায় লওয়া হইল না, ছায়াও মায়ের কথায় লজ্জায় রাঙা হইয়া সব ভুলিয়া গেল বুঝি।

১০

মা এবং বিরিঞ্চি পথে নামিয়া আসিলেন। শীতের রাত্রি। খোলা পথে বড়ই ঠাণ্ডা। মা বলিলেন, চল বাবা, একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে যাই।

বিরিঞ্চি কোন জবাব দিল না। জ্যোৎস্নালোকিত রজনী। আকাশের অগণিত নক্ষত্র সেই আলোকধারায় ডুবিয়া গিয়াছে, দুই একটি মাত্র নক্ষত্র জ্যোৎস্নালোক ভেদ করিয়া মিটিমিটি জ্বলিতেছে। ঘনবনাবৃত কল্যাণপুর বাগান যেন হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে।

অসংখ্য চাগাছকে আশ্রয় করিয়া যে জোনাকীর দল অন্ধকার রাত্রিতে ক্ষণস্থায়ী ঝিকিমিকি আলো বিকিরণ করে, তাদেরও দুই চারিটা সেই জ্যোৎস্নালোক বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শীতে শীর্ণকায়া ছোট পার্ব্বত্য নদীটি সামান্য জলস্রোত লইয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। বিরিঞ্চি তখন এই নদীটির পাশ দিয়া চলিতেছিল। দূরে অস্পষ্ট আবছায়ার মত কুলি-লাইনগুলি দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল, মা, দূরে ওগুলো কি দেখা যায়?

ওগুলো সব কুলিদের লাইন।

সব কটাই?

হ্যাঁ।

এ বাগানে কত কুলি আছে, মা?

শুনেছিলাম একবার, পাঁচশোর মত হবে।

এমনই আলাপ করিতে করিতে তাহারা একটা কুলি-লাইনের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বিরিঞ্চি হঠাৎ দাঁড়াইয়া মাকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু এমনই সব খড়ে ছাওয়া ছোট ঘরে ওরা থাকে কি ক'রে?

এভাবে থাকাই তো ওদের অভ্যেস বাবা। আর এর চেয়ে ভাল ঘর ওরা পাবে কোথায়?

বাগানের মালিকেরা ভাল ক'রে ওদের ঘর তৈরি ক'রে দেয় না কেন?

বিরিঞ্চির এ প্রশ্নের জবাব মায়ের পক্ষে দেওয়া শক্ত। তবুও তিনি বলিলেন, এসব ঘরবাড়ি তো কোম্পানি থেকেই তৈরি ক'রে দেওয়া হয়।

কিন্তু ঐ রকম এক একটা মাটি ও খড়ের খোপে কি মানুষ বাস করতে পারে? নিশ্চয়ই এদের ভারী কষ্ট হয়।

এরা তো কোন নালিশ জানায় না বাবা?

মায়ের মুখেও সেই একই ধরণের কথা—এরা কোন নালিশ জানায় না। ছায়াও ঠিক এই যুক্তিই দিয়াছিল। বিরিঞ্চি বিস্ময়ে ভাবিল, এরা সব আজীবন বাগানের অধিবাসী, নিজেদের দিকটাই কেবল দেখিতে এবং ভাবিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তাহারই পাশে যে আর একটা দিক রহিয়াছে, চাহিয়াও দেখে না।

বিরিঞ্চি বলিল, নালিশ জানায় না ব'লেই কি এদের কোন কষ্ট নেই?

না বাবা, আমি ঠিক ও কথা বলছি না।

বিরিঞ্চিও চিন্তাস্রোতে কোথায় যেন তলাইয়া গেল। বলিল, মা, কষ্টের ভেতরেই যারা মানুষ, তাদের সে বোধই থাকে না। কাজেই তারা ভাবে, এই তো স্বাভাবিক। তারা জানে, বাগানের মালিকদের এবং জমিদার ও মহাজনদের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ বাড়াবার জন্যেই তারা জন্মেছে, আর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ একই কাজে নিজেদের বুকের রক্ত তাদের ঢেলে দিতে হবে।

মা বিরিঞ্চির মুখের প্রতি একটি বার তাকাইলেন। দেখিলেন, সে এক নিবিড় দৃষ্টিতে ঐ কুলি-লাইনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ কি একটা শব্দে চকিত হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা, ও কিসের শব্দ?

ও কিছু নয়। বোধ হয় একটা কুলি মদ খেয়ে মাতলামি করছে।

একটু পরেই শোনা গেল, সেই কুলি-লাইনেরই একটা ঘরে একটা লোক জড়িত কণ্ঠে বলিতেছে, হারামজাদী, ভাত দিচ্ছিস না যে? তোকে কখন ভাত দিতে বলেছি? ভাত বেড়ে রাখিস নি কেন? তুই গেছলি কোন্ শালার বাড়ি?—ক্রমেই মাতালের কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িতেছে, ভাষাও অশ্লীল হইতেছে।

একটি মেয়েও চেঁচাইয়া বলিতেছে, তুই থাকিস কোথায় যে, ভাত দোব ? এখন মাতাল হয়ে এসে বলা হচ্ছে, আমি ভাত দিই নি। ব'সেই দেখ না, ভাত দিই কি না দিই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাবি নাকি ?

এই কথার পরই শোনা গেল সেই নারীকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ।

বিরিঞ্চি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। মাতাল কুলিটার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। মা যে একাই দারুণ শীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সে খেয়াল তাহার হইল না।

বিরিঞ্চিকে হঠাৎ ছুটিতে দেখিয়া মা বলিলেন, ওকি করছ বিরিঞ্চি ? তুমি যাচ্ছ কোথায় ? এসব হাঙ্গামাতে কোন ভদ্রলোকের ছেলের যেতে আছে ?

ততক্ষণে বিরিঞ্চি মাতালটার ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া দাড়াইয়াছে। সে দেখিল, একটা কুলি মাতাল হইয়া দরজার পাশেই একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া খুঁটির গায়েই মাথাটা রাখিয়া কোনও মতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার স্ত্রী এক কোণে একটা মাটির হাঁড়ি হইতে ডান হাতে একটা কলাই-করা থালাতে ভাত বাড়িতেছে এবং বাঁ হাতে কাপড়ে চোখ মুছিতেছে।

কে যেন দরজায় দাঁড়াইয়াছে বুঝিয়া মাতাল কুলিটা আবার চেঁচাইয়া উঠিল, তুই শালা—তুই শালা—তোকে কে ডেকেছে ? এয়েছিস এই মাগীর কাছে ? ভাগ এখান থেকে, নইলে মারব দু ঘা।—বলিয়া ডান হাতটা উঠাইয়া আঘাতের আস্ফালন করিতেই লোকটা টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, বিরিঞ্চি তখনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু কুলিটা তখনও বকিতেছে দেখিয়া বিরিঞ্চি মাতালটাকে দুই হাতে কাঁধের পাশে ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকানি দিল। অর্দ্ধচৈতন্য মাতালটা ঝাঁকানি খাইয়া বলিতে লাগিল, বাবা, সেলাম বাবা, তুমি আমার

বাবা, ব'স বাবা। তুমিই থাক বাবা, এই শালী আমার ঘর করতে চায় না। যা শালী, এই বেটার সঙ্গেই বেরিয়ে যা।

এসব কি হচ্ছে, বদলু?—এই কণ্ঠস্বর শুনিতেই বদলু যেন ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। বিরিঞ্চি দেখিল, স্বয়ং ম্যানেজার ভুলুয়াকে লইয়া তথায় উপস্থিত। ভুলুয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া বদলুর হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। ততক্ষণে ছেলে মেয়ে বুড়ো আরও অনেক কুলি তথায় আসিয়া জড়ো হইয়াছে।

বিরিঞ্চি বলিল, এ বেটা আর একটু হ'লেই বউটাকে মেরে ফেলত! উনিশ-কুড়ি বছরের ছোকরাগুলো পর্য্যন্ত এত মদ খায়!

দীপক অবস্থাটা দেখিয়া শুনিয়া একটু হাসিল। বিরিঞ্চিকে বলিল, ভুলো দেখবে এখন, তুই চল।

বিরিঞ্চি বলিল, তোদের খবর দিলে কে?

দীপক বলিল, মা।

বিরিঞ্চি মাকে পথে ফেলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া লজ্জা পাইল।

১১

বিরিঞ্চি চলিয়া গেল। ছায়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিল। লণ্ঠনটি সম্মুখেই জ্বলিতেছে। পাহাড়ের স্তব্ধতা শীতের কুয়াসায় গভীরতর হইয়াছে।

কেমন যেন একটা খেয়ালী ভাব! কিন্তু কথাগুলি সত্যই কত গভীর বেদনায় মাখা! লোকটি কেমন এক অদ্ভুত ধরণের! অপরিচিত মেয়েদের মুখের দিকে অমন হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতেও বাধে না যেন! আর

সে নিজেই বা কেমন? সেদিনও, এবং আজও, এক অপরিচিত যুবকের চোখের দিকে চাহিয়াই তো রহিল। ইচ্ছা করিয়াও যেন চোখ নামাইতে পারিল না। আর এমনই অতর্কিতে ভদ্রলোক তাহাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, একখানি ভাল কাপড় পরিয়া আসিবার সময়ও তাহার মিলিল না। অপেক্ষাকৃত ময়লা একটা সাধারণ শাড়িই তাহার পরনে দেখিয়া গিয়াছেন। চুলগুলাতেও আবার আজ বিকালে চিরুনি পড়ে নাই, মুখেও একটু স্নো নাই। দূর, কেমন যেন লাগে! ভদ্রলোক আবার বিলাতফেরত! ছাই-ফেরত! নেহাৎ বুরীশ! বিলাতে যাহারা যায়, তাহাদের নাকি চেহারা আবার এমনই থাকে? আর বেশভূষা? এও কেমন যেন এক ধরণের, দেখিলে হাসি পায়। আচ্ছা, কে বিশ্বাস করিবে যে, এই লোকটিই আস্ত ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছে? আর যাহারা বিলাতে গিয়াছে, তাহাদের আচরণই বা এমন কেন? অমন হাঁ করিয়া মেয়েদের/মুখের দিকে চাহিয়া থাকে কেন?

ছায়া নিজের অজ্ঞাতেই একবার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া অবিন্যস্ত চুলগুলি একটু ঠিক করিয়া লইল। আবার ভাবিল, দাদু বলেন, লোকটার কি উচ্চ আদর্শ, কি সুন্দর আইডিয়া, কি হাইলি-কাল্‌চার্ড, কি সরল মধুর স্বভাব! ছাই! কিন্তু এ কথা বোধ করি মিথ্যা নয় যে, ভদ্রলোকের গরিব-দুঃখীদের জন্য একটু দরদ আছে, নহিলে সেদিনও এই সবই বলিতেছিলেন, আজও বলিলেন সেই একই কথা। নিজের ডিভিডেণ্ডের অংশে কম পড়িলেও আপত্তি নাই দেখিতেছি। দাদু বলিয়াছেন, ভদ্রলোক কল্যাণপুর বাগানে কিছুদিন থাকিয়া কুলিদের জীবনধারা সম্বন্ধে নাকি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন। পাগল! পাগল! নহিলে বাপের প্রচুর সম্পদ, কলিকাতায় দুই দুইটা বাড়ি—সব ছাড়িয়া আসিয়া এই আসামের চা-বাগানে কুলিদের অবস্থা

স্টাডি করার ইচ্ছা! শুনিলে সত্যই হাসি পায়। ইহাকেই বলে 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।'

হঠাৎ লণ্ঠনের আলোটা বার দুই লাফাইয়া উঠিয়া নিবিয়া গেল। তেল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বুঝি। ছায়া আধ-আঁধারে ঘরের দরজায় খিল দিল। আলো না নিবিলে এমনই চিন্তায় আরও কতক্ষণ কাটিত কে জানে! সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। কতক্ষণ যে এমনই ভাবনায় সে ডুবিয়া ছিল বুঝিতে পারিয়া নিজেই লজ্জা পাইল। অস্ফুটে বলিল, দূর ছাই, আমি কেন ওর কথা ভেবে মরছি?

সে অন্দরে প্রবেশ করিতেই তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া দাদু ডাকিলেন, ছায়া, তোমার মাস্টারি করা শেষ হ'ল?

হ্যাঁ, দাদু।

শোন।

ছায়া দাদুর ঘরে প্রবেশ করিল।

রামবাবু বলিলেন, তোমার জন্যে একটা স্কুল-মাস্টারি ঠিক হয়েছে।

ছায়া অবাক হইল। বলিল, সে কোথায়, দাদু? সবেমাত্র পরীক্ষা দিয়ে এলুম; দুদিন বিশ্রাম না ক'রে আমি কোথাও মাস্টারিতে যেতে পারব না। উঃ, অনার্স নেওয়াতে যা খাটুনি!

রামবাবু নাতনীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তোকে কোথাও যেতে হবে না, দিদি।

তবে?

এই বাগানেই একটা মেয়ে-স্কুল হচ্ছে কিনা, তাই দীপক তোমাকেই ঐ স্কুলের মিস্ট্রেস নিযুক্ত করতে চায়।

ছায়া যেন অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, না না, সে হবে না, দাদু। তুমি দীপকদাকে বারণ ক'রে দাও।

কেন ?

আমি ওসব কুলির মেয়েকে পড়াতে পারব না। বাপরে !

রামবাবু বলিলেন, সেকি কথা রে ছায়া ? তুমি যদি এদের পড়াতে না পার তো, বাইরের একজন এসে কি ক'রে পারবে ? তুমি এদের স্বভাব যতটা জান, বাইরের নতুন কারও পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

তা হোক, দাদু। জানই তো, আমি ওসব কুলি-ফুলিদের সঙ্গে মেলামেশা মোটেই পছন্দ করি না। আর ওদের মাস্টারি করতে যাওয়া মানে তো ওদের নিয়েই রাতদিন কাটানো ? মাগো !

রামবাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, এই তোমাদের দোষ ছায়া। তোমরা একটু-আধটু লেখাপড়া শিখলে তো গরিব-দুঃখীদের সঙ্গে কথা কইতেও ঘৃণা বোধ কর যেন !

ছায়া মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল।

রামবাবু বলিলেন, আমার কথায় তুমি রাগ করতে পার ছায়া, কিন্তু কথাটা তোমার ভেবে দেখা উচিত।

সে আমি দেখব। কিন্তু তবুও আমার এসব মোটেই ভাল লাগে না। তা ছাড়া ওসব ভিন্নভাষা-ভাষীদের লোককে পড়াব কি ক'রে ?

তুমি তো ওদের নিজেদের ভাষায় পড়াবে না, তুমি শেখাবে বাংলা।

বুঝলাম তোমার কথা, দাদু। কিন্তু আজই আমি কোন কথা দিতে পারছি না। যত উৎপাত জোটে এসে আমারই জন্যে।

রামবাবু নাতনীর ভাব দেখিয়া কেমন বিব্রত হইলেন। বলিলেন, এতে অত মন খারাপ করবার কি আছে, ছায়া ? পড়াতে ইচ্ছে না

হয়, কালই ব'লে দোব। তবে আমার ইচ্ছে, দীপককে জবাব দেবার আগে তুমি কথাটা একটি বার ভাল ক'রে ভেবে দেখ।

বেশ, তা দেখা যাবে। চল, এখন খাইগে, ক্ষিদেও পেয়েছে খুব।

রামবাবু ও ছায়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

১২

দেওয়ালীর সাত দিন পূর্ব্বে।

এখন হইতেই কুলিরা সব দেওয়ালীর উৎসব-আয়োজনে ব্যস্ত। এই সপ্তাহে সকল কুলিই হাজিরা পাইয়া তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য অন্তত এক একখানা নূতন শাড়ি, কাপড়, জামা, কিম্বা একটা কিছু কিনিয়া আনিল।

বদলু আছে তাহার যোগাড়ে। বউয়ের জন্য সেও একখানা লাল ফুলপাড় শাড়ি যে না আনিল তা নয়, কিন্তু মদের জন্যই ভাবনা তাহার বেশি। মদ ছাড়া অন্যের হয়তো দুই চারি দিন চলে, কিন্তু তাহার যে একদিনও চলে না। বিশেষত বছরের মধ্যে দেওয়ালী একটা বড় রকমের উৎসব। বদলু তাহার স্ত্রী ফুলমণিকে লইয়া বে-আইনি মদ তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত আছে। আজ আবার কিছু বেশি মদই চুয়াইয়া লইতে হইবে। দেওয়ালী এবং অন্যান্য উৎসবাদিতে সে কিছু কিছু মদ লুকাইয়া বিক্রয়ও করে এবং তাহাতে তাহার বেশ দুই পয়সা রোজগারও হয়। বদলু একটি পিতলের ডেক্‌চির গলার নীচেই একটা ছোট ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রমুখে একটি বাঁশের সরু নলের এক দিকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অপর মুখটি একটা জলপূর্ণ হাঁড়িতে কাত করিয়া বসানো একটি বোতলের মুখে প্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছে।

বদলু তখন সেই ডেক্‌চিটি উনুনে চাপাইয়া বাঁশের নলটা ভাল করিয়া ছিদ্রমুখে আঁটিয়া দিতে দিতে বলিল, ফুলু, ঐ হাঁড়িটা থেকে পচা ভাত, খানিকটা গুড় আর ঐ সেদিন বাজার থেকে যে একটা মুলি এনেছি, তাই এতে ঢেলে দিয়ে ঢাকনিটাকে মাটি লাগিয়ে বন্ধ কর ; আমি ততক্ষণে আর সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

আচ্ছা, আমি মাটি খানিকটা নিয়ে আসছি।—বলিয়া ফুলমণি বাহিরে গেল এবং বাহির হইতে খানিকটা মাটি লইয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করিল। তারপর হাত ধুইয়া ঘরের এক কোণে রক্ষিত একটা মাটির হাঁড়ি হইতে মালসার সাহায্যে খানিকটা পচা গন্ধময় পান্তাভাত ও গুড় সেই ডেক্‌চির মুখে ঢালিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু জলও ঢালিয়া দিল এবং মুলিটাকে ভাঙিয়া হাঁড়ির ভিতরে ভরিয়া দিয়া একটা মাটির সরাতে হাঁড়ির মুখটা বন্ধ করিয়া দিল। পরে কিছু মাটি সরাটার চারিদিকে লাগাইয়া একটা নেকড়া জড়াইয়া হাঁড়ির মুখটা এমনই শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল, যাহাতে মদ্যবাষ্প কিছুতেই ঠেলিয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া ঐ নলের ছিদ্রপথে ঠাণ্ডা পাত্রের ভিতরে গিয়া জমা হইতে পারে। বদলু বলিল, ফুলমণি, মুখের ঢাকনিটা ভাল ক'রে মাটি দিয়ে আটকে দিয়েছিস তো? শেষটায় সব ওপরে ঠেলে বেরিয়ে না যায়!

ফুলমণি বলিল, না, বেরুবে কেন? এই দেখ না, কেমন শক্ত ক'রে এঁটে দিয়েছি।

বদলু খুশি হইয়া ফুলমণিকে চট করিয়া একটা চুমু খাইয়া ফেলিল। ফুলমণি বলিল, যাঃ, কি যে করে!—বলিয়া স্বামীর আদরে গলিয়া গিয়া হেলিয়া দুলিয়া হাত ধুইবার জন্য ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বদলুর মুখে বড় গন্ধ ; সে সারাটা দিনই মদের নেশায় কাটায় ; কখনও বেশি, কখনও কম।

মদ তৈয়ারির সরঞ্জাম ঠিক হইয়া গেল। ফুলমণি আসিয়া উনুনে আঁচ দিল। বদলু পাশে বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল।

মদের ভাঁটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ একটা ঢেঁটরার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ফুলমণি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সেই ঢেঁটরার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লাইনের সম্মুখ দিয়া ভুলুয়া-সর্দ্দার হাঁকিয়া যাইতেছে—'এবার দেওয়ালীর দিন থেকে কল্যাণপুর বাগানে মদ খাওয়া বন্ধ—বাবুর হুকুম।'

বদলু যেন সব কিছু বুঝিল না। ফুলমণিকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? এ ঢেঁটরা কিসের রে?

ফুলমণি আনন্দিত হইয়া বলিল, যা শুনেছিলাম, তাই সত্যি। দেওয়ালীর দিন থেকে আর কেউ বাগানে মদ খেতে পারবে না, চুয়াতেও পারবে না। বেশ হয়েছে।

বলিস কি?—বদলু কথাটা যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না।

শুনলি না? ভুলু-সর্দ্দার ঢেটরা পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে গেল যে!

দূর। তুই ঠিক শুনতে পাস নি। আমি জেনে আসছি। দেখিস, এই ঠাণ্ডা বোতলটা যেন আবার গরম না হয়ে যায়। ওটার গায়ে বার বাব ঠাণ্ডা জল দিস কিন্তু।

একটু পরেই বদলু ফিরিয়া আসিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই উঠিয়া পড়িয়া বলিল, মদ খেতে দেবে না? এই তো চুয়োচ্ছি, দেখি কোন্ বেটা আটকায়। দেখ ফুলু, ঐ একটা নতুন বাবু এসেছে, ঐ বেটাই যত নষ্টের গোড়া। কই, আমাদের বাবু তো আগে এমন ছিল না! ঐ বেটা আসা অবধি ইস্কুলে যেতে হবে, সপ্তাহে একদিন অন্তত কাপড় জামা কাচতে হবে, এ করতে

হবে, ও করতে হবে, এমনই সব আরও কত যে আরম্ভ করেছে কি আর বলব! আজ কিনা দেওয়ালীর দিনেও মদ খাওয়া বন্ধ ক'রে দিতে চায়!

এই নূতন বাবুটি আসিয়া পড়াতে সেই রাত্রে ফুলমণি বদলুর হাতে মার খাওয়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। নহিলে ইহাও তাহার দৈনন্দিন প্রাপ্য। সে বদলুর আদরও যেমন পাইত, মদের ঘোরে স্বামীর কিলটা লাথিটাও কিছু কম পাইত না। তাই বদলু যখন ঐ নূতন বাবুটিকে মন্দ বলিল, তখন যেন তাহার কেমন ভাল লাগিল না। সে বলিল, না না, ঐ বাবুটা বড় ভাল। বাবুটা আসার পর থেকেই তো আমাদের হাজিরা ঠিকা সব বেড়ে গেছে। আগে তো এক হাজিরায় দিত দিনে দু আনা কি ন পয়সা, আর এখন দেয় চার আনা।

ঐ বাবুটার জন্যে বুঝি? সে আমাদের বাবুই ক'রে দিয়েছে। বাগান হ'ল আমাদের বাবুর আর হাজিরা বাড়াল বুঝি নতুন বাবু? তুই যে কি বলিস, ফুলু!

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেদিন ইস্কুলে গিয়ে শুনেছি।—একটু ভাবিয়া ফুলমণি বলিল, মদ খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ভালই করেছে। নইলে তুই বড় বেশি খাস; আর ঘরে এসে আমাকে বড় মারধোর করিস।

বদলু যেন একটু লজ্জিত হইল, ফুলমণিকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া চুমু খাইয়া বলিল, কই আমি তোকে মারি, ফুলু?

আঃ, ছাড়, উনুনে কাঠ দিতে হবে যে।—বলিয়া ফুলমণি নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল।

এমনই এক শরতের রাত্রে সে এবং ফুলমণি নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া মদ চুয়াইতে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় কে আসিয়া তাহাদের দরজায় ঘা দিল।

বাঁশের তৈয়ারি দরজাটা ডান দিকে ঠেলিয়া একটু ফাঁক করিতেই ফুলমণি দেখিল, নূতন বাবুটি দাঁড়াইয়া আছেন। সঙ্গে আছে আরও দুই তিনটি লোক। দরজাটা ভাল করিয়া খুলিতে না খুলিতেই মঙ্গু ঘরে প্রবেশ করিয়া বদলুর কানে কানে বলিল, নতুন বাবুটা এসেছে রে, বদলু ভাইয়া।

মঙ্গু যেন খুশিতে ভরিয়া আছে।

বদলুর মুখে যেন কে কালি মাখাইয়া দিল। ভয়ে সে বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করিয়া তৎক্ষণাৎ দরজা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি চাই বাবু?

বিরিঞ্চি হাসিমুখে বলিল, কি রে বদলু, তুই নাকি বড় বেশি মদ খাস? আজ তো খুব খেয়েছিস, না?

বদলু বুঝিল উল্টা। সে এই বাবুটির প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিল না। তাহাতে আবার অসময়ে উৎপাত। বলিয়া উঠিল, খাই তো ঠিকই। মদ না খেয়ে কাজ করব কি ক'রে?

বিরিঞ্চি বলিল, বাঃ, মদ না খেলে বুঝি কাজ করা যায় না?

না, মোটেই না। আর মদ কি শুধু আমি একাই খাই? এ বাগানে কে খায় না শুনি?

সবাই বুঝি মদ খায়?

খায় বাবু।

মদ না খেলে কি হয়?

মদ না খেলে দু কোদাল মাটি কাটলে কিম্বা মাইলখানেক হাঁটলেই কেমন হাঁপ ধ'রে যায়, আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না। কাজ করতে না পারলে বাবুরা যে মারধোর করে, হাজিরা কেটে দেয়, তখন?

আর মদ খেলে পরে?

সারাটা দিন কাজ করলেও মেহনত হয় না।

তুই কত বয়স থেকে মদ খেতে শিখেছিস?

মনে নেই বাবু।

কিন্তু এখন থেকে যে মদ খাওয়া বারণ হয়ে গেল, করবি কি শুনি?

কাজে যাব না। আমরা সব হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকব।

কিন্তু কাজ না করলে পয়সা আসবে কোত্থেকে? খাবি কি?

এ বাগান ছেড়ে কোন সাহেবের বাগানে চ'লে যাব। ওসব বাগানে তো আর মদ খাওয়া বারণ হয় নি।

কিন্তু সব বাগানেই যদি মানা করে?

বদলু বিরক্ত হইল; বলিল, যাক বাবু, তোমার সঙ্গে অত কথা বলা আমার সাজে না। তুমি এখন চ'লে যাও বাবুর কুঠিতে।

বিরিঞ্চি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, এদের দেহমনের অবস্থা কি স্তরেই না নেমে এসেছে! বলিল, বদলু, তুই নাকি নিজেই মদ তৈরি করিস?

বদলুর সঙ্গে সঙ্গে ফুলমণির বুকের ভিতরটাও ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। বদলু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। একটু মদের নেশা তো ছিলই, তাহাতে আবার যত সব অসঙ্গত কথা। সে চটিয়া গেল। তাতে তোমার কি হয়েছে বাবু? কই, আমাদের বাবু তো এসব কথা বলে না? তুমি আমাদের বাগানে আসা অবধিই যত উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছে। তুমি ফিরে যাও তো বাবু, তোমার দেশে।

বিরিঞ্চি হাসিল। এমন সময় তাহার সঙ্গের একটা কুলি বিরিঞ্চিকে ঘরের ভিতরে দেখাইয়া বলিল, ঐ দেখুন বাবু, এখনও বদলুটা মদ চুয়াচ্ছে।

বিরিঞ্চির কেমন যেন একটু কৌতূহল হইল। কেমন করিয়া

এরা মদ চুয়ায় একটি বার দেখিয়া লয়। সে বদলুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য পা বাড়াইতেই বদলু একটা কাঠ লইয়া বিরিঞ্চির মাথায় সজোরে আঘাত করিল। 'উঃ' বলিয়া বিরিঞ্চিও কপালে হাত দিয়া ঘরের পৈঠায়ই বসিয়া পড়িল। বদলু তখন রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছে।

১৩

চা-বাগানের কুলিদের বছরে তিনটি উৎসব—দুর্গাপূজা, দেওয়ালী ও হোলি। এই উৎসব তিনটিকে কেন্দ্র করিয়া চা-বাগানগুলি আনন্দে মাতিয়া থাকে। প্রতি উৎসবেই বাগানের মালিকেরা কিছু টাকা বরাদ্দ করেন এবং কুলিরা নিজেরাও চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। উৎসবের এই কয়টি দিনই কুলিদের কর্ম্মক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহমন একটু আনন্দের আস্বাদ পায়। নহিলে বুঝি নিয়ত এই বিধি-নিষেধের মধ্যে তাহাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, এই উৎসবাদিতে মদ একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। মদ ভিন্ন কোন উৎসবই নাকি জমে না।

এহেন উৎসবানন্দ দীপক আজ মাটি করিতে বসিল। কল্যাণপুর বাগানে মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কুলিদের চটিবারই তো কথা। এখন তাহারা যদি বাগান ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ভয়ও দেখায়, তাহা সহ্য করা ভিন্ন অন্য উপায়ই বা কি! আর দুই চারিজন যে চলিয়া যাইবে না, এমন মনে করিবারও কোন কারণ নাই। চা-বাগানে মদ খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যে কত কঠিন এবং তাহাতে মালিকদের যে

কি পরিমাণ ক্ষতির সম্ভাবনা, সে কেবল ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না; বিশেষত যখন আশপাশের সব বাগানেই আজিকার দিনে পিপা পিপা মদ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। সে যেমনই হউক, দীপকের সে সাহস ছিল। কুলিদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার যেমন ছিল তাহার দৃঢ়তা, তাহাদের আজন্ম অভ্যস্ত পানীয় নিবারণের জন্য কুলিদের মধ্যে যে একটা নিরুৎসাহ এবং কর্ম্মবিমুখতার ভাব দেখা দিবে, তাহারও প্রতিকারের জন্য তাহার চেষ্টা কম ছিল না। এবং এই কারণেই সে এবারের উৎসবে কলিকাতা হইতে যাত্রা এবং সিনেমা ইত্যাদির আয়োজন করিল। কিন্তু যখন শুনিল যে, বদলু মাতলামি করিয়া বিরিঞ্চিকে পর্য্যন্ত আঘাত করিয়াছে, তখন সে কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। এই তিনটি মাস ধরিয়া না স্নান, না খাওয়া, বিরিঞ্চি কুলি-লাইনেই ঘোরাঘুরি করিয়াছে মদ খাওয়া বন্ধ করার চেষ্টায়। আর আজ কিনা তাহারই মাথায় আঘাত? দীপক ভাবিল, চাবুকই কুলি বেটাদের একমাত্র ঔষধ। সে তৎক্ষণাৎ বদলুকে ধরিয়া আনিবার জন্য ভুলুয়াকে আদেশ দিল।

বিরিঞ্চি আরাম-কেদারায় বসিয়া আছে, দীপক ও তাহার স্ত্রী মনীষা কাছেই তুইখানা চেয়ারে উপবিষ্ট। মনীষা বলিল, ব্যথাটা কি এখনও যায় নি, ঠাকুরপো?

বিরিঞ্চি জবাব দিল, না, একটু আছে।

দীপক বলিল, তা থাকবে বইকি, আধ ইঞ্চি লম্বা একটা জখম! দীপক রাগে গরগর করিতেছিল। বলিল, তুই যাই কেন বলিস না বিরিঞ্চি, ঐ চাবুকই বেটাদের একমাত্র ওষুধ। লাঠির গুঁতো ছাড়া এদের ঠিক রাখা যায় না। লেবার কণ্ট্রোল যে কি কঠিন ব্যাপার, তা আরও কিছুদিন থাকলে তবে বুঝবি। ডিসিপ্লিনই হ'ল আসল।

বিরিঞ্চি বলিল, জানি দীপক, এ বড় শক্ত কাজ। কিন্তু আমার আইডিয়া তো জানিস? আমি ভাবি, ভয় দেখিয়ে জয় করার চেয়ে ভালবাসা ও প্রীতি দিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করা কঠিন হ'লেও তাই করা উচিত। আর ডিসিপ্লিনের কথা যা বলছিস, সে শুধু চাবুকেই সম্ভব হয় না। ডিসিপ্লিনের মর্ম্মকথাটি বোঝা দরকার। দেখ না চেয়ে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদেরই বা কজন তার অর্থ বোঝে? আর এরা তো নিরেট মূর্খ, একেবারে পশুর মত। কাজেই ক্রমে ডিসিপ্লিনের মূল্য যতই বুঝবে, তার প্রতি শ্রদ্ধাও এদের ততই বাড়বে। তাই বলছি, ঐ চাবুকের আইডিয়াটা মন থেকে সরিয়ে দাও। একবারেও কি তোমার শিক্ষা হয় নি?

কি বলিস তুই? তা ব'লে তোকে এমনই ক'রে মেরে ফেলবে?

ও কি আর সজ্ঞানে মেরেছে যে, তুই যাবি তার প্রতিশোধ নিতে!

তা হোক, বেটা এত মদ খায় কেন? আর আজ মেরেছে তোকে, কাল মারবে আমাকে। তখন কি ওদের মারের ভয়ে শেষটায় বাগান ছেড়ে আমাদের পালিয়ে যেতে হবে?

মদ খায় ব'লে আজ যে এদের দোষ দিচ্ছ, তার জন্যে দায়ী কারা দীপক? তুমি নিজেই কি বল নি যে, তোমরা ইচ্ছে ক'রেই ওদের মদ খাওয়াটা বারণ কর না? কেন না, একটা নেশায় ডুবে না থাকলে এদের দিয়ে কোন কাজ হাসিল হয় না। হাতে পয়সা হ'লে এই দরদেশে আসামের জঙ্গলে একদিনও ওরা প'ড়ে থাকতে চাইবে না।

এমন সময় কাঁপিতে কাঁপিতে বদলু আসিয়া ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইল। আজ স্বামীর যে কি সাজা হইবে, ফুলমণিও কল্পনা করিতে না পারিয়া চোখের জলে মুখ ফুলাইয়া আসিয়া বারান্দার এক কোণে বসিয়া পড়িল।

বদলুর আসিবার সংবাদ দিতেই দীপক বলিল, নিয়ে আয় ওটাকে ভেতরে।

বদলুকে লইয়া ভুলুয়া ভিতরে ঢুকিতেই দীপক ক্রোধে এমন গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, বদলু কাঁদিয়া ফেলিল; এবং বারান্দায় উপবিষ্ট ফুলমণিরও বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল।

কি শাস্তি দিই তোকে? তোর এত বড় সাহস যে, বিরিঞ্চিবাবুকে তুই মেরেছিস! ভুলু, আমার বড় চাবুকটা নিয়ে আয়।

ভয়ে বদলুর গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বাগানের অনেক কুলি সংবাদ পাইয়া আসিয়া দীপকের বাংলোর সম্মুখে ভিড় জমাইয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা—আজ না জানি বদলুর কি সাজা হয়!

ভুলুয়া চাবুক লইয়া আসিল। এরূপ ভাবেই এক দাস অপর দাসকে মারিবার জন্য প্রভুর হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেয়; ক্রীতদাসের দল উল্লসিত আনন্দে একের উপর অত্যাচার অপরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করে। ইহাতে ইহারা কতই না অভ্যস্ত! ভুলুয়াও প্রভুর আদেশে দীপকের হাতে চাবুকটা তুলিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিল না। নাই বা দিবে কেন? সে যে ম্যানেজারের বিশেষ অনুগ্রহপ্রার্থী। স্বজাতিবিদ্রোহী না হইলে হীন দাসত্ব কায়েম হইবে কি প্রকারে?

দীপক বলিল, নিয়ে আয় বদমাইসকে আমার সামনে।

এমন সময় বিরিঞ্চি আরাম-কেদারা হইতে উঠিয়া বদলুকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দীপক, ফিরিয়ে দাও তোমার ঐ চাবুক। যা বদলু, আজ তোকে ক্ষমা করা হ'ল। আর জীবনে অমন কাজ করিস নি। আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে যা, আর তুই মদ ছুঁবি না।

বদলুর ত্রাস এখনও যায় নাই। সে বিশ্বাস করিতে পারিল না,

তাহার এতবড় মারাত্মক অপরাধেরও ক্ষমা হইতে পারে। সে অবাক হইয়া গেল যে, স্বয়ং ম্যানেজারের বন্ধুর মাথা ফাটাইয়া দিয়াও একটা কুলি নিস্তার পাইতে পারে। বদলু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দীপক বলিল, যা বদলু, আজ তুই রক্ষা পেলি, কিন্তু সাবধান, ফের অমন কাজ করবি তো তোকে জেলে দোব।

বদলু বাঁচিয়া গেল। বাহিরে সমবেত কেহই যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, ফুলমণিও না।

বদলু অগত্যা দরজার দিকে মুখ ফিরাইতেই কাহার আগমনে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল।

পর্দ্দা ঠেলিয়া রামবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে ছায়াও আসিয়াছে। এইমাত্র তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, বদলু বিরিঞ্চির মাথায় জখম করিয়াছে।

বদলু বাহির হইয়া গেল। সমবেত জনতা অবাক বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, বদলুর আজ কপাল ভাল।

ফুলমণির অন্তরটা নূতন বাবুটির প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

১৪

রামবাবুও বুঝিলেন, বদলুর কপাল ভাল যে, আজ বিরিঞ্চি সম্মুখে ছিল। নহিলে কি কাণ্ডই না ঘটিত! দাদা নাতনী নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলেন। ভুলুয়া লণ্ঠন হাতে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।

ছায়া বলিল, দাদু, বিরিঞ্চিবাবু না খুব বড়লোক ?

হ্যাঁ দিদি, দীপক বলছিল কলকাতায় ওর ছখানা বড় বড় বাড়ি আছে, পুরীতে আছে তিনখানা; তা ছাড়া ওর বাবা হাইকোর্টে ওকালতি ক'রে অনেক টাকাও ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন।

তিনি ঘরবাড়ি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে শেষটায় কিনা এই চা-বাগানে কুলিদের হাতের মার খাচ্ছেন! আশ্চর্য্যই বটে!

আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, দিদি। আজ তো পরিচয় পেলে, ও কত বড় আদর্শে অনুপ্রাণিত! বিরিঞ্চি হ'ল ভাবুক লোক, ওর সঙ্গে দুটো কথা কইলেই বোঝা যায়, কত বড় আইডিয়া রয়েছে ওর মাথায়' নইলে এমন লোক এখানে প'ড়ে থাকে? পীড়িতের জন্য যার বুকে বেদনা জাগে, সে ঘরের কোণে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে, দিদি? ঐ বেদনাই যে তাকে পাগল ক'রে ঘর থেকে বের ক'রে পথে টেনে নামাবে।

ছায়ার যেন ভাল লাগিল না। বলিল, তুমি যে কি বলছ, দাদু! খুব হাই আইডিয়া থাকলেই বুঝি কেউ এসে কুলিদেব মাঝখানে প'ড়ে মার খায়? কেন, কলকাতায় থেকেও তো এসব করা যেত! আমার মনে হয়ে, বিরিঞ্চিবাবু মাথা-পাগলা লোক।

রামবাবু হাসিয়া বলিলেন, তুমি মিথ্যেই বিরিঞ্চিকে গাল দিচ্ছ, দিদি। পাগল সে হতে পারে, কিন্তু এমন পাগল বেশি মেলে না। যাদের অন্তরে আসে একটা আইডিয়ার উন্মাদনা, তারাই তো হয় পাগল। আর এ রকম পাগলামি না ক'রে কেউ কখনও বড় হয়েছে দিদি, কেউ কোন মহৎ কাজ করেছে?

কিন্তু দাদু, কথা হচ্ছে এই যে, ঐ রকম পাগলামির ফলে মার খেতে হয়।

তাও যদি হয়, তবু এসব পাগলের দল ভ্রূক্ষেপ কবে না। সকলের

চেয়ে একটু খাপছাড়া না হ'লে কি কেউ কখনও ঐ হতভাগাদের টেনে তুলতে পারবে? যদি মনের উদারতা না থাকে কিম্বা অপরের দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমা করার মহত্ত্বই না থাকে, এবং আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়ে কুলিদের মধ্যে প'ড়ে থাকতে না পারে তো কুলিদের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারবে কেন?

না দাদু, তোমার ওসব যুক্তি আমার ভাল লাগে না। আমার ভয় হয়, কি জানি শেষটায় কুলিরা ক্ষেপে গিয়ে তোমাদেরও অপমান করে। এদের আজন্মের অভ্যাস তোমরা চাইছ তিন মাসে দূর ক'রে দিতে। এও কি সম্ভব? দাদু, দাঁত তো তোমার সব কটাই প'ড়ে গেছে, কিন্তু পান খাওয়ার অভ্যেসটা তো এখনও পুরামাত্রায় বজায় রেখেছ।

বামবাবু হাসিলেন। বলিলেন, মিথ্যে কিছু নয়, বোন। কিন্তু এই কুলিরা যে মদ খেয়েই সর্ব্বস্বান্ত হ'ল। কি বলিস ভুলো?

সে আর বলতে হয় বুড়া বাবু? মদই তো অর্দ্ধেক রোজগার খেয়ে নেয়।

আচ্ছা ভুলু, তুইও কি এখন একটু একটু মদ খাস? সত্যি কথা বল।

না বাবু, বাবুর হুকুম হবার পর থেকে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। আগে একটু একটু অভ্যেস ছিল। দিদিমণি যা বললেন, সে বড় সাচ্চা কথা বুড়া বাবু। ছেলেবেলার অভ্যেস সহজে ছাড়া যায় না। তবে হ্যাঁ, নতুন বাবুর কথা কুলিলোকেরা খুব শোনে, আর উনি যেমন ক'রে চেষ্টা করছেন, সবাইকে মদ যে খারাপ তা বুঝিয়ে বলছেন, তেমনি ক'রে যদি কেউ কুলিমেয়েদেরও বলত, তবে কাজটা জলদি হ'ত বাবু। দিদিমণি যদি আওরৎগুলাকে একটু বুঝিয়ে বলতেন তো বড় ভাল হ'ত।

তুই কিছু মিথ্যে বলিস নি ভুলু। ছায়া, তুমি তো সত্যিই এ কাজে

বিরিঞ্চিকে সাহায্য করতে পার। কিন্তু তোমাকে বললেই তুমি রাগ ক'রে বস।

ছায়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল, মাগো, আমার দ্বারা ওসব নোংরা কাজ হবে না, দাদু। শেষকালে মেয়েগুলোর কাছে ইজ্জত খোয়াব?

তুমি মিছে ভয় পেও না, ছায়া। মেয়েদের আবার অত সাহস হবে?

না না দাদু, আমার এতে কাজ নেই। স্কুলে মাস্টারি করাটাই যা ঝকমারি! আমি তো মোটেই রাজি ছিলাম না। নেহাৎ তোমার কথায় ঐ কাজ নেওয়া। আবার বলছ কিনা ওদের মধ্যে গিয়ে প্রহিবিশন সম্বন্ধে প্রোপাগাণ্ডা করা? থাক, ওসব ন্যাষ্টি কাজ আমার পোষাবে না।

তোকে কি আর জোর ক'রে ও কাজ করতে কেউ বলছে? তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন? আচ্ছা ভুলু, তুই এখন যা।—বলিয়া রামবাবু অন্দরের দিকে পা বাড়াইলেন।

যাই বাবু, সেলাম।—বলিয়া ভুলুয়া বিদায় লইল।

আহারান্তে ছায়া শয্যায় শুইল, কিন্তু ঘুম আসিল না। রাজ্যের যত ভাবনা আজ তাহার মাথায়। ক্ষমা! মানে কি? ওঁর মাথাটা ফাটিয়ে দিল বদলু, অথচ তাকে একটা মুখের কথাও বললেন না? যা রক্ত পড়েছে, কপালের ব্যাণ্ডেজটা একেবারে লাল হয়ে আছে! একটা কেমন যন্ত্রণার ছাপও মুখে রয়েছে যেন! তা থাকা তো খুবই স্বাভাবিক। আঘাতটা তো আর সামান্য নয়। এসবে যাওয়াই বা কেন? কুলিরা চা-বাগানে আছে আজ একশো বছর ধ'রে, আর এদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনেও এরা অভ্যস্ত হয়েই গেছে। বিলেত ঘুরে এসে কিনা বাড়িঘরের মায়া ছেড়ে দিয়ে বাস করা ঐ কুলিদের মাঝে!

আর দীপকদাও যে কি রকম! একটু আপত্তি করে না, বিরিঞ্চিবাবু যা বলেন তাই শিরোধার্য।

দাদু আবার বলছেন আমাকে মেয়েদের মাঝে প্রোপাগাণ্ডা করতে। না না, এ রকম কাজ আমার ধাতে সইবে না। এ কথা খুবই সত্যি যে, কুলিমেয়েরাও মদ কিছু কম খায় না, আর পুরুষদের তো কথাই নেই। বিরিঞ্চিবাবু কিন্তু তাঁর কাজে অনেকটা সুফল লাভ করেছেন। আগের মত তেমন হাল্লা আর শোনা যায় না। তাঁর ক্ষমতা অসীম সত্যি। মুখে যেন মধু ভরা। সেদিন ভুলু-সর্দ্দার তার নতুন বাবুটির কি প্রশংসাই না করলে! উনি তো আমার কাছেই সেদিন বলছিলেন যে, যদি সম্ভব হ'ত একদিনে কুলিদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ঠিক তাবই মত ক'রে দিতেন। মাথামুণ্ডু কি যে বলেন! সাধে কি আর বলি ডুনিয়া-ছাড়া!

যাকগে। আমি কেন ওসব ভাবছি? ঘুম কি আজ চোখ থেকে পালিয়ে গেছে?—ছায়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং ঘুমাইবার চেষ্টাও কবিল; কিন্তু ঐ রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজটার কথা কেবলই মনে আনা-গোনা করিতেছে, চোখে ভাসিয়া উঠিতেছে।

না, আজ আর ঘুম হবে না দেখছি।—ছায়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। তাহার নড়াচড়াতে পাশের খাটে দিদিমাব ঘুমও ভাঙিয়া গেল। তিনি বলিলেন, কি রে ছায়া, তোর ঘুম আসছে না বুঝি?

না দিদিমা, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল।—বলিয়া আবার চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু মনে যাহার গভীর চিন্তা, তাহার ঘুম আসিবে কোথা হইতে? সে ভাবিল, আচ্ছা, দেখি না একটি বার ঐ মেয়েগুলোকে ব'লে ক'য়ে? যদি এদের মদ খাওয়া বারণ করতে পারি তো পুরুষগুলো অতি সহজেই ছাড়বে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িল, বুঝিতে পারিল না।

১৫

বাগানের যেখানে হাট বসে, তাহারই মধ্যে এক পাশে একখানি পাতায় ছাওয়া ছোট ঘর, এবং সম্মুখের সব জায়গাটা জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ছোট ঘরটিতে বিশ্বপ্রসবিনী আপন সংহারিণী মূর্ত্তিতে নগ্নদেহে বিশ্বপিতা মহেশ্বরবক্ষে পা তুলিয়া দিয়া মহকবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা যা হইয়াছেন' মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। পাহাড়িয়া গাছের ফুল এবং পাতার সাহায্যে মণ্ডপটিকে সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। নরমুণ্ডমালিনীর রক্তরাঙা লেলিহান জিহ্বা ভক্তের প্রাণে যুগপৎ ভয় এবং ভক্তির উদ্রেক করে।

পূজা শেষ হইয়াছে। ফুল বেলপাতা এবং অন্যান্য পূজার দ্রব্য তখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। চারিটি নিরপরাধ অসহায় শূকরশিশু মায়ের পায়ে নিজেদের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া কাহার তৃপ্তিসাধন করিল, কে জানে! জমাট-বাঁধা রক্তের দাগ তখনও রহিয়া গিয়াছে, কাক এবং কুকুরে মিলিয়া রক্তটা খাইয়া শেষ করিয়াছে। মা এই অসহায় শূকরশিশুর বুকের রক্তে কতটুকু তৃপ্ত হইলেন বোঝা গেল না, বোঝা গেল না নরমুণ্ডমালিনী আপন সন্তানরক্তে তৃপ্ত হইয়া 'মা যা হইবেন' মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন কি না।

দীপক পূজামণ্ডপে উপস্থিত হইল। সঙ্গে তাহার প্রিয় ভৃত্য ভুলুয়া এবং আরও জনকয়েক কুলি-সর্দ্দার। মায়ের বেদীমূলে দাঁড়াইয়া

করজোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে প্রার্থনা জানাইল। বলিল, মা, আমার সাধনা যেন সিদ্ধ হয়। যে ব্রত গ্রহণ করেছি, তার উদযাপনই আমার একমাত্র কাম্য।

দীপক মোটরে বসিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিল। সেল্‌ফ-স্টার্টারে পা দিয়া মোটরে স্টার্ট দিয়া সে ভুলুয়া এবং অপর কয়েকজন সর্দারকে বলিল, তোরা সব ঠিক ক'রে রাখিস, নতুন বাবু আছেন, তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। আমার ফিরতে দেরি হবে।

দীপক মোটর হাঁকাইল। আশেপাশে দুই চারিটা বাগানে আজ তাহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে।

আজ সারাদিন ধরিয়া উৎসব লাগিয়াই আছে। কুলিরা সব দল বাঁধিয়া উৎসবানন্দে মত্ত। কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ বা মুখভার করিয়া বসিয়া আছে। অন্যান্য বছর এই দিনটাতে এক এক পিপা মদ ফুৎকারে নিঃশেষ হইয়া যাইত, আর আজ তাহার এক ফোঁটাও বাগানে নাই। সমস্ত উৎসাহ মাটি হইয়া গিয়াছে।

একদল মেয়ে পুরুষ দেবতার সম্মুখে নৃত্যগীতে মত্ত। ইহারা জাতিতে সাঁওতাল। পুরুষেরা মাদল বাজাইতেছে এবং তাহারই তালে তালে মেয়েরা সব হাত দুলাইয়া, মাথা এলাইয়া, পা ফেলিয়া কি এক ছন্দে নাচিতেছে, দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। নৃত্যরতা নারীরা সকলে একই রকম পোষাকে সজ্জিতা। গায়ে ব্লাউজ, একখানা কালো রঙিন শাড়ি বুকে পিঠে ঘেরিয়া আঁচলটি কোমরে গুঁজিয়া ইহারা যেন সব বীরাঙ্গনার বেশ ধারণ করিয়াছে।

বাগানের বহু কুলি এবং কুলিরমণী, বাবুরা সকলে সস্ত্রীক, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া মেয়েদের নৃত্য দেখিতেছিলেন।

বাগানের একটি বাবু তাহারই পাশের আর একজনকে বলিলেন, বুঝলেন মশায়, এই হ'ল সাঁওতালদের গরবা নৃত্য। কি চমৎকার!

অন্য বাবুটি জবাব দিলেন, কি জানি মশাই, ওসব গব্‌রা-টব্‌রা বিশেষ বুঝি না; দেখতে ভাল লাগছে, দেখছি। তবে আজ বদলু নেই; নইলে দেখতেন মশায়, একখানা নাচ। বদলু আর ফুলমণিতে যখন হাতধরাধরি ক'রে নাচত, আঃ, তখন একটা দেখবার মত জিনিস হ'ত মশায়।

প্রথম বাবুটি বলিলেন, সেদিন ম্যানেজারের ধমক খেয়ে বদলুটা পালিয়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ, মরুকগে বদলু। দেখুন দেখুন, ছুঁড়ীটাও নাচে কিন্তু বেশ! বাঃ, এ যে ফুলমণিই আর একটা ছোকরার হাত ধ'রে নাচছে; আমিও তো অবাক যে, ফুলমণির মত এমন সুন্দর নাচছে কে?

এমন সময় ঢাক-ঢোল এবং কোলাহলের শব্দে চমকিত হইয়া মণ্ডপে উপস্থিত সকলেই পথের দিকে তাকাইল। সাঁওতাল-নৃত্যও থামিয়া গেল। দেখা গেল, রূপসাগর বাগানের একদল কুলি স্ত্রী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া উন্মাদের ন্যায় নাচিতে নাচিতে মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের পুরোভাগে একটি যুবক ও যুবতী শিব এবং কালীর বেশ ধারণ করিয়া তাণ্ডবনৃত্য নাচিতেছে, কেহ বা গাহিতেছে, কেহ বা নেশার ঘোরে তাল সামলাইতে না পারিয়া অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। মণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া তাহাদের কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ বা ভূলুণ্ঠিত হইয়া মাকে প্রণাম করিল।

অন্যান্য বছর আগন্তুকদিগকে মদ্যপানে আপ্যায়িত করা হইত; কিন্তু কল্যাণপুর বাগানে এ বছর মদ্যের পরিবর্তে মায়ের প্রসাদ—

খিচুড়ি মিষ্টান্ন ইত্যাদি পরিবেশন করা হইতেছে দেখিয়া আগন্তুক কুলিদের মধ্যে কয়েকজন ভুলুয়াকে ঘিরিয়া বলিল, কি সর্দ্দার, পিপে আর গেলাস কই? একটা বোতলও দেখছি না যে? এবার তোমরা খিচুড়ি পাকিয়েছ দেখতে পাচ্ছি।

ভুলুয়া যেন একটু লজ্জিত হইল। বলিল, এবার থেকে কল্যাণপুর বাগানে মদ খাওয়া উঠে গেছে। বাবুর হুকুম।

একটা কুলি বলিয়া উঠিল, হুঁ, বাবুর হুকুম! আমাদের বাগানে হ'লে একবার দেখে নিতুম।

সকলেই অবাক হইয়া গেল। কল্যাণপুরের ম্যানেজার মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, এই সংবাদ তাহাদের কানেও কিছু কিছু পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু তাহা যে সত্য, এমন কি দেওয়ালীর দিনেও কেহ মদ খাইতে পারিবে না, ইহা কেহই বিশ্বাস করে নাই। কাজেই একটি কুলি মদের নেশায় জড়িত কণ্ঠে বলিল, অ্যায়সা ফাঁকি মৎ দিহে সর্দ্দার। দু এক গেলাস পিলাও ভাই, গলাটু শুকাকে একদম কাঠ হো গিয়া।

চল ভাই, এখান থেকে চ'লে যাই, বেটারা সব বোষ্টম সেজেছে।

সত্য সত্যই আকন্তুকের দল যেন কতকটা বিরক্ত হইয়াই চলিয়া গেল। দুই চারিজন যাহারা লোভে পড়িয়া খিচুড়ি ভক্ষণে পাত পাতিয়াছিল, তাহারাও পাতের অবশিষ্টাংশটুকু তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া জামার হাতায় মুখ মুছিতে মুছিতে দলের অনুসরণ করিল।

আগন্তুকদের এমনই চলিয়া যাইতে দেখিয়া দোলাই-সর্দ্দার তাহাদের দেবতার প্রসাদ লইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু কেহই তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল না।

দোলাই-সর্দ্দার পাশের একটা কুলিকে বলিল, কাজটা কিন্তু ভাল

হ'ল না রে? আমরাই না হয় সব বোষ্টম সেজেছি, তা ব'লে নিমন্ত্রিতদেরও এক গেলাস মদ দিতে পারলাম না, সে কি অভদ্রতা হ'ল না? আজকের দিনের সব ফুর্ত্তি একদম মাটি হয়ে গেল।

নিকটের কুলিটি দোলাই-সর্দ্দারের কথাটা অস্বীকার করিয়া বলিল, মদ খেয়ে পাগলের মত নাচলেই খুব ফুর্ত্তি হয়, না? আর আমাদের বাগানেই বা আনন্দ কম কিসে? কলকাতা থেকে যাত্রা, বায়স্কোপ, আরও কত তামাসা এসেছে। ওসব বুঝি নেহাৎ খামকা?

সিনেমা ওদের বাগানেও আনা হয়েছে। আর রেখে দে তোর যাত্রা-ফাত্রা; দেওয়ালীর দিনটায় মদ আর মাংস না হ'লে সবই মিছে।

অপর ব্যক্তি বলিল, তোর যদি মদ না হ'লে প্রাণ বেরোয় তো যা না সর্দ্দার, ওদের বাগান থেকেই পেট ভ'রে খেয়ে আয় না।

দোলাই-সর্দ্দার একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বুঝেছি, আর বক্তৃতা করতে হবে না। দুদিনেই একেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে গেছিস আর কি।

যাই হই না কেন, তোর মত অমন বেসামাল হয়ে কখনও মদ খাই নি।

মিছিমিছি বদনাম করিস নি বলছি। দোলাই-সর্দ্দার চটিয়া উঠিল। ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গিন হইতেছে দেখিয়া ভুলুয়া-সর্দ্দার মাঝখানে পড়িয়া উভয়কেই শান্ত করিল।

এমনই করিয়া দেওয়ালী-উৎসব সমাপ্ত হইল।

১৬

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের একটি কক্ষ। মাঝখানে একটা টেবিল, অয়েলক্লথে ঢাকা ; তাহার উপরে কাঠের দোয়াতদানিতে দুইটা দোয়াত ও গোটা দুই কলম, একটা পেন্‌সিলও আছে। এক কোণে শ্বেত-পাথরের তাকের উপরে কতকগুলি ছোট বড় ঔষধের শিশি বোতল, মেজার-গ্লাস, আরও কত কিছু। তাকের সম্মুখে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া সতরো আঠারো বছরের এক যুবতী একটা শিশি হইতে মেজার-গ্লাসে কি একটা ঔষধ ঢালিয়া গামছা দিয়া শ্বেতপাথরের তাকটা মুছিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। মেয়েটির নার্সের পোষাক পরা, মাথায় রুমাল বাঁধা, গায়ে এপ্রন। আজ সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, একটু দেরিই হইয়াছে। যুবতী একটু তাড়াতাড়িই কাজ সারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। ডাক্তারবাবুর আসিতে আর বেশি বিলম্ব নাই।

একটি যুবক আট নয় বছরের একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, একটু শুনবেন ?

মনিয়া মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া একেবারে থতমত খাইয়া গেল। সেই কালো মিশমিশে চেহারাও যেন কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কোন কথাই তার মুখে যোগাইল না। আগন্তুক যুবকও প্রথমে নার্সের বেশে মনিয়াকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই চিনিতে পারিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে মনিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যুবকটিই শেষে বলিল, তুমি এখানে কি ক'রে এলে মনিয়া ? আজ মনিয়াকে আর 'তুই' বলা যেন সম্ভব নয়। মনিয়ার ধপধপে পরিষ্কার জামাকাপড়, মাথায় ইস্ত্রি করা সাদা রুমাল—এসব দেখিয়া মনিয়াকে

কুলির মেয়ে বলিতে কে সাহস পাইবে? কল্যাণপুর বাগানের পূর্ব্বতন টিলাবাবু নিশাকরেরও সেই কুলির মেয়ে মনিয়াকেই সম্বোধন করিতে গিয়া 'তুই' শব্দ মুখ হইতে বাহির হইল না, কেমন বুঝি জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল। পোষাকেরই তো মান, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

মনিয়া একটা ঢোক গিলিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, আমি তো আজ বহুদিন এখানে নার্সের কাজ শিখছি। বাবু আমাকে এখানেই পাঠিয়েছেন।

নিশাকর বলিল, তোমাকে পেয়ে খুবই ভাল হ'ল। আমি এই মেয়েটিকে এখানে একটু দেখাতে চাই। তুমি যদি ডাক্তারবাবুকে ব'লে-ক'য়ে মেয়েটাকে একটু ভাল ক'রে দেখিয়ে দাও তো বড় উপকৃত হই। এ আমার ভাগ্নী, বড় গরিব। তোমাকে যে এখানে পাব, সে কখনও ভাবি নি।

মনিয়া ইতিমধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণই সামলাইয়া লইয়াছে। বলিল, আপনি ওকে নিয়ে বসুন, ডাক্তারবাবু এলে আমি ওকে দেখিয়ে দোব। কি হয়েছে ওর?

কি জানি, কেবলই বলে—মাথায় ব্যথা। আর মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্তও পড়ে।

আচ্ছা, বসুন। আমি একটু কাজ সেরে আসছি।—বলিয়া মনিয়া সেই গামছা হাতে পাশের দরজার পর্দ্দা সরাইয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

একটু পরেই আবার আসিয়া নিশাকরকে বলিল, আজ ডাক্তারবাবুর আসতে একটু দেরি হবে। ঘণ্টাখানেক বসতে হবে আপনাকে।

তা বসব। তুমি এখন কোথায় আছ মনিয়া?

আমাদের প্রত্যেকের আলাদা কোয়ার্টার্স আছে। আমার ঘর ঐ পাশে।—বলিয়া মনিয়া একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। বলিল, দুটো থেকে চারটের মধ্যে একদিন আসবেন।—বলিয়া পুনরায় পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে বাবুটি চাবুকের আঘাতে একদিন তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছিল, তাহাকেই কি ভাবিয়া সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল, নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মনিয়া কল্যাণপুর ছাড়িয়াছে আজ দুই বছরেরও বেশি। তাই আজ কলিকাতার অপরিচিত অনাত্মীয়দের মধ্যে বহুকালের পরিচিত টিলাবাবুকে পাইয়া সে কেমন যেন তাহার পূর্ব্ব অপরাধ সব ভুলিয়া গেল। বরং মনে মনে আনন্দিতই হইল। মনে হইল, না জানি এই লোকটিই তাহার কত আত্মীয়।

১৭

নিশাকর আসিল। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, ক্রমে রোজই আসিতে লাগিল। দুপুর দেড়টা বাজিলেই নিশাকর আর নিজের বাড়িতে থাকিতে পারে না, পথে বাহির হইয়া পড়ে, এবং প্রায় দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া মনিয়ার বাসায় ঠিক দুইটা বাজিতে না বাজিতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, দেরি হয় না।

এই দূরদেশে নিশাকরকে পাইয়া মনিয়াও খুশিই হইল। ভুলিয়া গেল নিশাকরের পূর্ব্ব অপরাধ, বরং ভাবিল, নিশাকর যদি না মারিত, তবে আজও তাহাকে বাগানের চা-পাতিই তুলিতে হইত, আর বাস করিতে হইত সেই খড়ে ছাওয়া ঘরেই। অথচ আজ সে অট্টালিকায়

থাকে। টেবিল, চেয়ার, খাট, বিছানা সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সঙ্গে বাথরুম, জলের কল, বিজলী-বাতি, আরও কত কিছু। সর্ব্বোপরি এই কলিকাতা নগরী। কোথায় সেই কল্যাণপুর চা-বাগান, আর কোথায় কলিকাতা! কোন তুলনা চলে কি?

সবই ছিল ভাল। কিন্তু সে কুলির মেয়ে বলিয়া কিম্বা অন্যান্যদের তুলনায় লেখাপড়া কম জানে বলিয়াই কিনা কে জানে, তাহার সহকর্ম্মী নার্সেরা যেন ঠিক তাহাকে তাহাদের সমতুল্য মনে করিত না। হেয় জ্ঞান না করিলেও, কেমন একটু ব্যবধান রাখিয়াই চলে। তাহাকে প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইত। কাজেই সে যখন টিলাবাবু নিশাকরের সাক্ষাৎ পাইল, তখন আর তাহাকে অনাত্মীয় মনে করিতে পারিল না। এবং এই দুপুরবেলাটা সে তাহার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটা অতি মূল্যবান সময় বলিয়াই মনে করিতে লাগিল।

নিশাকর আসে, গল্পগুজব করে, হাসিঠাট্টাও যে না করে, এমন নয়। কোন কোন দিন বিকালের টিফিনটাও এখানেই সারিয়া লইয়া শিস দিতে দিতে অথবা নিম্নস্বরে গানের স্বর ভাঁজিতে ভাঁজিতে পথে বাহির হইয়া যায়। যে পোষাকে সে প্রথম মনিয়াকে দর্শন দিয়াছিল, আজ তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কারণ এই সেদিন মনিয়ার কাছ হইতে সে দশটা টাকা চাহিয়া লইয়াছে; মনিয়াও খুশি হইয়াই দিয়াছে: ক্ষতি কি? এই টাকা তো তাহার নিজের জন্যই খরচ হওয়ার কথা; যদি নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া অবশিষ্ট টাকা দিয়া কাহাকেও সাহায্যও করে, তাহাতে দোষ কি? নিশাকর বড় দীনবেশে তাহার বাসায় আসে, মনিয়ার তাহা ভাল লাগিত না। নিশাকর আজও বেকার।

কিছুদিন পর।

নিশাকর সেদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ সে গোলাপী আতর মাখিয়াছে, ভুর ভুর করিতেছে গন্ধ।

মনিয়া তখন সবেমাত্র হাসপাতালের কাজ সারিয়া বাসায় ফিরিয়া চুল বাঁধিতেছে। হঠাৎ নিশাকরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে নিজেকে যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল, বসুন, আজ এ সময়ে যে হঠাৎ?

নিশাকর একটু হাসিয়া বলিল, এলুম এমনিই। এদিকে একটা টিউশনির খোঁজে বেরিয়েছিলুম, ফেরবার পথে ভাবলুম, তোমাকে দেখেই যাই।

ভালই।—বলিয়া মনিয়া শয্যার এক পাশে বসিয়া পড়িল। দুইজনেই নির্ব্বাক। ঘরের দেওয়ালে একখানা ক্যালেণ্ডার, তাহাতে বুকের আধখানা খোলা একটা মেয়ের ছবি। মনিয়া একদৃষ্টে ছবিটার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। নিশাকর মনিয়ার মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ডাকিল, মনিয়া!

নিশাকরের এই আহ্বানে মনিয়ার বুকের ভিতরটা কেমন যেন কাঁপিয়া উঠিল। জবাব দিল, কি?

আমি তোমাকে পেতে চাই মনিয়া। সেই বাগানেও তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ, আজও কি সাড়া দেবে না?

মনিয়া মাথা নীচু করিয়া পায়ের বুড়া আঙুলটা মেঝেয় ঘষিতে লাগিল। বুকের ভিতরে কেমন যেন একটা ঝড় বহিয়া চলিয়াছে।

নিশাকর আবার ডাকিল, মনিয়া!

মনিয়া কোন উত্তর দিতে পারিল না।

নিশাকর মনিয়ার দিকে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল এবং মনিয়ার

ডান হাতটি নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া তাহার মুখের দিকে একটা তীব্র লালসাময় দৃষ্টিতে তাকাইয়া তেমনই ভাবেই ডাকিল, মনিয়া!

মনিয়া নিজেকে আর সংযত করিতে পারিল না। অসহনীয় হইয়া উঠিল তাহার বুকের স্পন্দন। মুখ তুলিয়া সে নিশাকরের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে বুঝি নিশাকর ভয় পাইল। তবু আবার কহিল, মনিয়া, কথা দাও।—বলিয়া তাহার হাতখানি মুঠার মধ্যে পুনরায় সজোরে চাপিয়া ধরিল।

ছাড়ুন।—বলিয়া নিশাকরের মুঠাব ভিতর হইতে মনিয়া নিজের হাতটা ছিনাইয়া লইল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যান, আপনি বেরিয়ে যান। আর আমার কোয়ার্টার্সে আসবেন না।

তুমি কি এতই নিষ্ঠুর, মনিয়া?

আপনি তবুও ব'সে রইলেন? যাবেন না আপনি?—বলিয়া মনিয়া নিজেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিশাকর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, যদিই মনিয়া ফিরিয়া আসে। শেষে হতাশ হইয়াই পর্দা ঠেলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া পথে নামিয়া পড়িল।

১৮

কয়েকটা মহুয়াগাছ। তাহারই একটার গোড়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছে বদলু। পাশেই তাহার পড়িয়া রহিয়াছে বাঁশের পাচনটি। মাথায় তাহাব একটা শতছিন্ন ময়লা গামছা জড়ানো। হাতে একটি বাঁশের

বাঁশী। সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত মাঠ। স্থানে স্থানে পাথরের টিপি। দূরে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়। সেই মাঠের মধ্যে কয়েকটি গরু ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। বহুক্ষণ ধরিয়া একমনে সে বাঁশী বাজাইতেছে। ধরণীর বুক হইতে তখন সূর্য্যালোকের শেষ আভাটুকু ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া যাইতেছে। গাভীগুলিও ঘাস খাওয়া শেষ করিয়া মহুয়াবৃক্ষতলে একে একে জড়ো হইতেছে।

বদলুর খেয়াল নাই। একটা বকনা-বাছুর তাহার অতি নিকটে গিয়া বার দুই গাত্র লেহন করিতেই সেই খসখসে অনুভূতিতে তাহার চৈতন্য হইল। সে বাঁশী রাখিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। বাছুরটির গলায় বার দুই হাত বুলাইতে আনন্দে সে গলাটা তাহার দিকে আরও আগাইয়া দিল। বদলু আরও একটু আদর করিয়া তাহার পিঠে ছোট্ট একটি চড় মারিয়া বলিল, কি রে, সন্ধ্যে হ'ল? বাড়ি ফিরবি বুঝি? চল।

সবগুলি গরু বাছুর একত্র করিয়া বদলু বাড়ির দিকে রওয়ানা হইল। পরিচিত পথ; গরুগুলি আপন মনেই চলিতেছে। বদলুও পিছনে মন্থর গতিতে চলিয়াছে। এক হাতে বাঁশী, অপর হাতে পাচনবাড়ি। কিন্তু বদলুর মন আজ কল্যাণপুর চা-বাগানে তাহার সেই কুঁড়েঘরে, ফুলমণির শয্যাপার্শ্বে ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

বদলুর মনে জাগিল তাহার দুইটি বছরের কুলিজীবনের স্মৃতি। ফুলমণিও আজ কিছুতেই তাহার মন হইতে সরিতে চাহিতেছিল না। মন তাহার কল্যাণপুর বাগানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

ঠিক দুই বছর পূর্ব্বে, এমনই একটি দিনে, সে সেই নূতন বাবুটিকে আঘাত করে। তারপর নিশীথরাত্রে কল্যাণপুর থেকে নিদ্রাভিভূতা ফুলমণিকে ফেলিয়া সে পলাইয়া আসে। কেন সে পলায়ন করিল? বাবু তো তাহাকে ক্ষমাই করিয়াছিলেন। কিন্তু বদলুর আজও

বিশ্বাস হয় না যে, ম্যানেজার সত্যই তাহাকে সেদিন ক্ষমা করিয়াছিল। ঐ নূতন বাবুটি সম্মুখে ছিল বলিয়াই হয়তো সেরাত্রির জন্য সে বাঁচিয়া গিয়াছিল, এবং পলাইয়া না আসিলে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি পাইত। হয়তো পরদিনই আবকারির দারোগাবাবুকে সংবাদ দিয়া তাহাকে পুলিসে ধরাইয়া দিত। আর মদ খাওয়া? কই, সে তো আর এখন মদ খায় না? তবে কেনই বা সে ফুলমণিকে ছাড়িয়া আসিল? উঃ, কত মারই না সে ফুলমণিকে মারিয়াছে। কিন্তু এত অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও তো ফুলমণি তাহাকে ছাড়িয়া যায় নাই। তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল, ফুলমণিকে ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ের চিত্রটি —গভীর নিদ্রাভিভূতা ফুলমণির বাম বাহু হইতে অতি সন্তর্পণে রূপার তাবিজখানা খুলিয়া লইয়া উপরে চাল হইতে বাঁশের বাঁশীটি পাড়িয়া লইয়া শেষবারের মত প্রিয়তমা পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপি চুপি বাঁশের দরজাটা একপাশে ঠেলিয়া দিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সমতলভূমিতে নামিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমনই ভাবিতে ভাবিতে যখন বদলু তাহার মনিবগৃহে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বদলু গরুগুলিকে গোয়ালে বাঁধিয়া খড়, বিচালি, জল প্রভৃতি দিয়া রাত্রির মত কাজ সারিয়া আসিয়া তাহার কুঁড়েঘরটিতে প্রবেশ করিল, এবং একটা পুঁটলি খুলিয়া তাবিজটা বাহির করিয়া হাতে লইল। তাবিজখানা সে আনিয়াছিল বিক্রয় করিয়া পথখরচ যোগাইতে। কিন্তু শেষে অনেক ভাবিয়া প্রিয়ার স্মৃতিবিজড়িত মূল্যবান তাবিজটি হাতছাড়া করিল না।

সে তাবিজটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ কে ডাকিল, বদলু, ঘরে আছিস? বদলু তাড়াতাড়ি সেটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া

লইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাদেরই গ্রামের বৃদ্ধ-সর্দ্দার। বহুকাল যাবৎ সে আসামেরই কোন এক চা-বাগানে কাজ করে। মাঝে মাঝে গ্রামে আসে এবং গ্রামবাসীদের ভুলাইয়া চাকুরি করিবার জন্য চা-বাগানে লইয়া যায়।

বদলুর ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধ-সর্দ্দার একখানা পিঁড়িতে চাপিয়া বসিল। বলিল, কেমন আছিস, বদলু ?

বদলু উত্তর করিল, হ্যাঁ ভাই, চলছে একরকম।

মাইনে কত পাচ্ছিস ?

ছ টাকা

মাত্র ছ টাকা !

বেশি দেবে কে ?

চল না আবার চা-বাগানে।

আসাম মুল্লুকে ?

আসাম মুল্লুকই বটে, কিন্তু তুই আগে বাগানে ছিলি সেখানে

তবে ?

এবার যাব চল সিলেট জেলাতে। সাহেবলোকের বাগানে। এখানে পয়সা আছে। তোর কল্যাণপুর বাগানে সে পয়সা দেবে কোত্থেকে ? সে তো ছিল একদম বাঙালীবাবুদের বাগান। যাবি নাকি ?

বদলু একটু ভাবিয়া বলিল, না না না। আসামে আর যাব না। একবার গেলে শেষকালে না পালিয়ে আর আমার জো নেই।

কে বললে তোকে ? এখন তো আর গিম্মিট (agreement) হয় না। তুই যখন চাইবি, তখনই ফিরে আসতে পারবি। আর সিলেট

জেলাটা ঠিক আসাম নয় রে, সে বাংলা মুল্লুক।—বুদ্ধু-সর্দ্দার বদলুকে ফাঁকি দিল।

ক্ষমা কর সর্দ্দার, আর চা-বাগানে যাব না। এর চেয়ে কয়লার খাদও ভাল।

বেশ, তা যদি না যাস তো, না খেয়ে মর। যেমন আক্কেল, তেমনই তো হবে।

বদলু কি যেন ভাবিল। বলিল, দেশে পয়সার বড় অভাব, সে তো জানি ভাই।—কিন্তু বলিয়াই বদলু হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইল। অবশেষে বলিল, আচ্ছা সর্দ্দার, আমার বউটাকে এনে দিতে পারবি? ফুলমণিকে? সে আছে ঐ আসাম মুল্লুকের বাগানে—কল্যাণপুরে।

বুদ্ধু-সর্দ্দার একটা আস্ফালন করিয়া কহিল, নিশ্চয় পারব। সাহেব কল্যাণপুর বাগানের ম্যানেজারকে লিখে দিলেই তোর বউকে পাঠিয়ে দেবে। বাঙালীবাবুরা সাহেবলোকদের কত ভয় করে, তা তো জানিস।

বদলু যেন মরুভূমির মধ্যে জলের সন্ধান পাইল, বলিল, দেবে? সত্যি সত্যি পাঠিয়ে দেবে? না তুই মিথ্যে বলছিস?

চল না, একবার গিয়েই তুই দেখ না। তোর বউকে যদি এনে দিতে না পারি তো, আমার এই গোঁফজোড়া তুই উপড়ে ফেলিস।—বলিয়া বুদ্ধু তাহার গোঁফজোড়াতে বার দুই মোচড় দিয়া লইল।

তা হ'লে যাওয়াই ঠিক সর্দ্দার। আমি কালই যাব। আমার ফুলমণিকে কিন্তু এনে দেওয়া চাইই, বুঝলে?

যদি তোর বউকে এনে দিতে না পারি, তুই চ'লে আসিস। সাহেবকে ব'লে আমিই তোর বিদেয় মঞ্জুর করিয়ে দোব। তুই তৈরি হ। আমি এখন চললুম। আবার কাল আসব।

একটু ব'স সর্দ্দার। এক ছিলিম তামাক খাও; আর আমি তোমাকে একটা বাঁশী শুনিয়ে দিই।

বদলু বাঁশীতে সুর ধরিল।

১৯

বদলু আবার আসাম চলিয়াছে, ফুলমণিকে পাইবার আশায়। রাঁচি শহরে লেবার বোর্ড অফিসের বারান্দায় বহু সাঁওতাল নারী ও পুরুষ বসিয়া আছে। কেহ কেহ স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গ লইয়াই আসিয়াছে। আসামের বিভিন্ন চা-বাগানের কাজের জন্য সর্দ্দারেরা এই সাঁওতালদের লইয়া যাইতেছে। প্রতিটি মজুরের জন্য সর্দ্দার দশ হইতে পনরো টাকা বকশিশ পাইবে। বাগানের মালিকেরা এবং ম্যানেজারেরা সাঁওতাল কুলিমজুরই পছন্দ করে বেশি। পাহাড়ী অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাই চা-বাগানের কাজে খুব পটু। তা ছাড়া সভ্যতার আলো হইতে যাহারা যত অধিক দূরে, মালিকদের হিসাবে কুলির কাজে তাহারা ততই উপযোগী। এর কারণ অতি সুস্পষ্ট।

বদলুও সেই বারান্দার এক কোণে বসিয়া আছে। পায়ের কাছে তাহার পড়িয়া রহিয়াছে লাঠির মাথায় বাঁধা সেই পুঁটলিটি এবং তাহার সখের বাঁশীটি।

বদলুর ঐ এক চিন্তা—ফুলমণিকে তাহার চাইই। ফুলিকে ছাড়িয়া আর সে থাকিতে পারে না। মদ খাওয়া তো সে ছাড়িয়াই দিয়াছে; ফুলমণিকেও আর মারধোর সে করিবে না। ফুলমণি হয়তো তাহারই ভাবনায় দিন কাটাইতেছে। কিন্তু যদি সে আর একটা নিকা করিয়া

থাকে—তখন ? দূর ! তাহাও কি হয় ? ফলু তাহাকে কত যে ভাল-বাসিত !

টোমকো নাম বডলু হ্যায় ?

বদলু চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে একটি সাহেব। সে থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া ফেলিল। বলিল, হ্যাঁ, হুজুর।

আচ্ছা, যাও। টুমকো একটো কম্বল, একটো লোটা, একটো থালি আউর দশটো রুপিয়া মিলেগা, সমঝো ?

বদলু একই সঙ্গে এতগুলি জিনিস পাইবে শুনিয়া খুশি হইয়া গেল। প্রথমবার কল্যাণপুর যাইবার সময় পাইয়াছিল মাত্র একটা কম্বল ও দশটি টাকা। হাসিয়া বলিল, বহুৎ খুব হুয়া, হুজুর।

দেখিতে দেখিতে খাওয়ার ধুম লাগিয়া গেল—পুরি, তরকারি, ভাজা, আবার একটু চাটনিও।

বৃদ্ধ-সর্দ্দার চীৎকার করিয়া বলিল, সবলোক পেট ভরকে খা লেও। কাল দুপহেরকো আগে খানা নেই মিলেগা।

পেট ভরিয়া আহারের তৃপ্তিতে খুশি হইয়া তীর্থরাম বলিয়া উঠিল, বহুৎ আচ্ছা হুয়া, সর্দ্দার। আভি তো রাত আট বাজতা হ্যায়। আউর রাতকো কেয়া খায়েঙ্গে ? কাল দুপহেরকো হোনেসে বহুৎ হোগা।

কি তৃপ্তি ! কি আনন্দ ! অনাহারী-অর্দ্ধাহারীর দল বহুদিন পরে পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া কি খুশিই না হইয়াছে ! একবেলা পেটটি ভরিয়া আহারে যে কি আনন্দ, যাহারা নিত্য পর্য্যাপ্ততার মধ্যে বাস করে, তাহারা কি বুঝিবে !

লেবার বোর্ড চা-বাগানের মালিকদের গঠিত ও পোষিত একটি

প্রতিষ্ঠান। কাজ হইল, রিক্রুটিঙের সময় যাহাতে কুলিদের উপর কোন জোর-জবরদস্তি না হয়, কিম্বা তদ্দেশীয় লোকদের মনে কোনরূপ ভুল ধারণা জন্মাইয়া সর্দ্দারেরা কুলিদের আসামে লইয়া না আসে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা, তাহা ছাড়া রেল-ষ্টীমারে চলিবার সময় যাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়েও তত্ত্বাবধান করা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আড়কাটিরা কুলিদের নাজেহাল করিয়া ছাড়িত, এবং এই আড়কাটিদের উপদ্রব ও অত্যাচারের ভয়ে লোকে আসামের নাম শুনিলেই ভয় পাইত। ফলে, মাঝে কিছুদিন এমনই অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, আসামের চা-বাগানে মজুরের অভাব ঘটিল। এই অভিজ্ঞতা হইতেই চা-বাগানের মালিকেরা আড়কাটি-প্রথা উঠাইয়া দিয়া নিজ নিজ বাগান হইতে সর্দ্দার পাঠাইয়া কুলি রিক্রুট করিয়া থাকেন; এবং কুলিদের চলাফেরার সুবিধার জন্য লেবার বোর্ড নামীয় সমবেত প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎই বটে। কিন্তু কাজের বেলায় এতে দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিতে গেলে কুলি রিক্রুটই বন্ধ করিতে হয়। কুলিদের আসামের চা-বাগানে নিরাপদে পৌঁছানো পর্য্যন্তই লেবার বোর্ডের দায়িত্ব। কুলিদের জন্য আগে হইতেই লেবার বোর্ড গাড়ি রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছে। বদলু প্রভৃতি সাঁওতালেরা, পৌটলা-পুঁটলি ছাতা-লাঠি লোটা-কম্বল—যাহার যাহা সম্বল সঙ্গে লইয়া, কেহ বা একা, কেহ বা স্ত্রীপুত্রাদিসহ আসিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়িতে উঠিয়া বসিল; এবং দেখিতে দেখিতে তিনখানা বড় বড় কামরা ভরিয়া গেল। আসামে যাইতে তাহাদের কতই না উৎসাহ! কত আনন্দ! ঠেলাঠেলির অন্ত নাই, কে কাহার আগে গাড়িতে উঠিয়া বসিবে! তাহারা তাহাদের জন্মস্থানকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভারতের এক প্রান্তে—সুদূর আসামে যাইতেছে, এ ভাবনা তাহাদের

দুঃখ দেয় না। সে বোধ তাহাদের নাই। বুভুক্ষিতের আবার জন্মস্থান !

গাড়ি রাঁচি হইতে হাওড়া স্টেশনে পৌছিল। হাওড়া স্টেশন হইতে তাহারা শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে রওয়ানা হইল। পথের উভয় পার্শ্বে অগণিত আকাশচুম্বী অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া পাশের একটা কুলি বদলুকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কোন্ জায়গা ভাই, বদলু? এই কি আসাম ?

বদলু বলিল, দূর বোকা, এ কলকাতা। তুই বুঝি কলকাতা দেখিস নি ? আসাম এখনও অনেক দূরে !

বলিস কি ?

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, আরও একটা পুরো দিন তো লাগবেই।

একটা ছোকরা হঠাৎ সম্মুখে একটা ট্রামগাড়ি আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া দলের সর্দ্দার বলিল এখন পথ চল, হাঁ ক'রে দাঁড়ালে আবার গাড়ি চাপা পড়বি।

আর কেহই দাঁড়াইল না, সকলেই সর্দ্দারকে অনুসরণ করিয়া চলিল। অনেকখানি পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছিল।

এখানেও চাটগাঁ মেলে তেমনই তিনখানা কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছে। কুলিদের ভাবনার কিছু নাই। সমস্তই যেন ঘড়ির কাঁটার মত চলিয়াছে। তাহারা কোন্ পথে হাওড়া স্টেশন হইতে শিয়ালদহে আসিল, কিছুই টের পাইল না। নিজ নিজ সর্দ্দারের পিছনে চলিয়াছে ; ভেড়ার পাল যেমন করিয়া চলে, তেমনই। তাহারা এই মাত্র জানে যে, আসামের চা-বাগানে তাহারা চাকুরি করিতে যাইতেছে।

চাগাছ ধানগাছের মত, কি গাজরগাছের মত, কিম্বা মহুয়াবৃক্ষের

মত—এ ধারণা অনেকেরই নাই। খুবই স্বাভাবিক। জন্মস্থানে না খাইয়া মরিতেছিল; দূরদেশ হইলেও সেখানে চারিটি খাইয়া বাঁচিবে, গরিবের পক্ষে এইটুকু আশ্বাস কিছু কম নয়। ইহার বেশি তাহারা চায়ও না। খাইয়া বাঁচার পরেও যে জীবনে আরও আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকিতে পারে, ইহা তাহারা ভাবে না, ভাবিতে চায় না। তাই চাগাছের খোঁজে তাহাদের প্রয়োজন নাই। জন্মভূমি ত্যাগে তাহাদের দুঃখ নাই, বেদনা নাই, অনুশোচনা নাই। যাহারা সংসারে আবর্জনার মত একান্তে পড়িয়া আছে, তাহারা যদি বর্ষার প্লাবনে খড়কুটার মত নদীস্রোতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভাসিয়াই যায়, তাহাতে তাহাদের নিজেদেরও যেমন, জন্মস্থানেরও তেমনই কিছুই আসিয়া যায় না। তবে ইহাদের যাহারা কুড়াইয়া লইয়া আসে, তাহাদেরই লাভ হয় প্রচুর

চাটগাঁ মেলটা পদ্মার পূর্ব্বপারের শত শত যাত্রীকে বহিয়া আনিয়া গোয়ালন্দ স্টেশনে সেই অগণিত যাত্রীদলকে ঢালিয়া দিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে গাড়িটা বাঁচে, কিন্তু যাত্রীগণ বুঝি বা মরে। প্রাণান্তকর ভিড় গাড়িটা গোয়ালন্দে থামিতে না থামিতেই কুলিরা রেলিং ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া গাড়ির দরজার সম্মুখে ভিড় করিতে আরম্ভ করিল। যাত্রীদের নামিবারও পথ নাই। কোনও প্রকারে ঠেলাঠেলি করিয়া স্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে নামিতেই মিঠাইওয়ালারা সব বলিতে লাগিল, ভাল খাবার বাবু, ভাল মিঠাই, সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, কচুরি—খেয়ে

যান বাবু, সময় আছে, সময় আছে। কিন্তু ষ্টীমারে জায়গা না রাখিয়া খাওয়ার কথা তখন ভাবাও যায় না। যাত্রীদল একটু পথ চলিতে না চলিতেই পাকড়াও করিল হোটেলওয়ালার দল। বলিতে লাগিল, খেয়ে যান বাবু, পাকা পায়খানা, ভাল খাবার। কিন্তু পায়খানা ভালই হউক আর মন্দই হউক, এবং খাবারও যেমনই হউক, তখন কিছুরই অবকাশ নাই। যাত্রীদল জাহাজে সামান্য একটু জায়গা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পিঁপড়ার সারির মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

এইবার পদ্মা পাড়ি দিতে হইবে। ঘাটে বাঁধা অগ্নিগর্ভ জাহাজখানা এই যাত্রীদের অপেক্ষায়ই ভাসিয়া আছে। মাঝে মাঝে যেন বিরক্ত হইয়া হুস হুস করিয়া খানিকটা বাষ্প ছাড়িয়া দেয়, কিম্বা দিগন্ত কম্পিত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া যাত্রীদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করে। আর কত দেরি, এবার লাগাম ছাড়, আমি ঐ অম্বুধিসদৃশ বারিরাশি ভেদ করিয়া চলি।

ষ্টীমারে চড়িবার পথ মাত্র দুইটি, পাশাপাশি কয়েকটা চওড়া কাঠ ফেলিয়া কাছিতে বাঁধিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। এখানে কৌলিন্যের কুটিলতার পরিচয়ের অভাব নাই। একটি পথ উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট,—অর্থাৎ যাহারা ঐ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পশুর ন্যায় চলাফেরার লভ্যাংশ দিয়া যে আয়াস এবং আরামের সৃষ্টি হয়, তাহাই ভোগ করিতে জন্মিয়াছে, তাহাদেরই জন্য। কাজেই দ্বিতীয় পথটি ধরিয়াই জাহাজে চড়িতেছে যত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদল। মুটিয়ার মাথায়, হাতে, কাঁধে, পিঠে ট্রাঙ্ক, বাক্স, বিছানাপত্র, বোঁচকা, ঝোলা, আরও কত কিছু বোঝাই করিয়া দিয়া, নিজেরা স্ত্রীপুত্রকন্যার হাত ধরিয়া, কে কাহার আগে গিয়া ষ্টীমারে স্থান লইবে, সেই চেষ্টায় সম্মুখের জনতাকে ঠেলিয়া কোনমতে অগ্রসর হইতেছে। কেহ ভুলিয়াও

ঐ কৌলিন্যের পথে পা বাড়াইলে খালাসীরা পথ আগলাইয়া বলে, এ সাহেবলোকদের জন্যে।

দুর্গতির এইখানেই শেষ নয়। স্টীমারের টিকিট-বাবুরা পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেও না হয় কাটিল। কিন্তু স্টীমারেই বা জায়গা কোথায়? আগের গাড়ির যাত্রীরাই স্টীমারের সবটুকু স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। চলাচলের পথগুলিও রুদ্ধ।

জনৈক যাত্রী বলিয়া উঠিল, আজ যেন একটু বেশি ভিড। ব্যাপার কি মশায়, কিছু বলতে পারেন?

অপর একজন যাত্রী জবাব দিল, বেশি ভিড় হবে না আজ? আদ্ধেকটা ডেক তো কুলিদের জন্যেই রিজার্ভ করা রয়েছে! ঐ যে, দড়ি দিয়ে ঘিরে দিয়েছে!

এর মানে?

এখন আর মানে-টানের সময় নেই, মশায়। একটু জায়গা আগে ক'রে নিই, তারপর সব দেখা যাবে।

লোকটি কুলিকে অগ্রসর হইতে বলিয়া নিজেও পাশের ফাঁকে মাথা গলাইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু পা বাড়াইবামাত্রই শুনিল, আহাহা, করছেন কি মশায়? ঐ মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে দেবেন নাকি? এও, ঠেলতা কাহে?

ভিড়ের চোটে ঘাড় ফিরাইয়া, কে যে পিছন হইতে ঠেলিতেছে, দেখিবারও জো নাই। ভয়, পাছে মাথা ফিরাইতে গেলেই একটা ট্রাঙ্কের কোণে লাগিয়া কাটিয়া যায়।

নেহি, নেহি, ঠেলেঙ্গে কাহে? লেকিন ক্যাসা ভিড় দেখতা না?—বলিয়া কুলিটা মাথায় দুইটা ট্রাঙ্ক, হাতে একটা স্যুটকেস এবং পিঠে ও বগলে দুইটা পুঁটলি লইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাই

কি পাবে ? দুই দিকে আগের গাড়ির যাত্রীদের বিছানার মাঝখানে চলাফেরার যে সঙ্কীর্ণ পথটুকু রহিয়াছে, তাহারই মধ্যে স্টীমারের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত যাত্রীর সব সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর নীচের ডেকের যে ভিড়, সে তো অবর্ণনীয়।

মনিয়া অতিকষ্টে পথ করিয়া আসিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মেয়েদের কামরায় প্রবেশ করিল। এখানেও ভিড়ের অন্ত নাই। এক কোণে একটু জায়গা করিয়া লইয়া সম্মুখে স্টেশনের দিকে সে চাহিয়া রহিল দেখিল, অনেক কুলি—স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে সব সর্দ্দারের পিছনে পিছনে আসিয়া স্টীমারে উঠিতেছে।

জাহাজের বাঁশী পড়িল। খালাসীরা সিঁড়ি উঠাইতে লাগিল, নঙ্গরও উঠানো হইল। একটু পরে নদীবক্ষে একটা উদ্দাম কল্লোল তুলিয়া আস্ত জাহাজটা নড়িয়া উঠিল, এবং পূর্ণ গতি লইতে না লইতেই মনে হইল, চতুর্দ্দিকের নৌকা-জাহাজ ঘর-বাড়ি ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে। নদীবক্ষ মথিত করিয়া আপন গতিবেগে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে তাহার জলরাশি দূরে ঐ চক্রবালরেখার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

মনিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, বদলু মেয়ে-কামরার দরজার এক পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছে। মনিয়া অবাক হইয়া গেল বদলু কি করিয়া এখানে আসিল ?

বদলু মনিয়াকে দেখিয়াছে, যখন সে স্টীমারে উঠিয়াছিল, তখনই মনিয়ার পরনে পরিষ্কার ধপধপে সাদা কাপড় জামা থাকিলেও বদলুর মনিয়াকে চিনিতে দেরি হইল না, এবং তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার

একান্ত ইচ্ছা সে সম্বরণ করিতে পারিল না। এই উদ্দেশ্যেই সে মেয়ে-কামরার পাশে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

বাহিরে আসিয়া মনিয়া বদলুকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে এখানে? বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি? কত দিনের ছুটি ছিল? ফুলমণি কই? অনেকগুলি প্রশ্নই সে একসঙ্গে করিয়া ফেলিল।

বদলু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কল্যাণপুর বাগান হইতে পলায়নের ইতিহাস সবই বর্ণনা করিল, একটুও গোপন করিল না।

মনিয়া তখন জিজ্ঞাসা করিল, এখন তবে যাচ্ছ কোথায়?

আবার সেই চা-বাগানে। তবে এবার যাচ্ছি বাংলা মুল্লুকে।

সে আবার কোথায়? কল্যাণপুরে নয়?

না। এবার যাব সিলেটে। কল্যাণপুরে আর যাব না।

কিন্তু ফুলমণি?

ওকে সিলেটে নিয়ে আসব।

এখন যদি তাকে নিয়ে আসবে, তবে তখনই বা তাকে একা ফেলে চ'লে গিয়েছিলে কেন?

হাতে তখন মোটে পয়সা ছিল না যে।

কিন্তু ফুলি যদি এখন যেতে না চায়?

বদলু এ কথাটা আগে ভাবে নাই। বলিল, যাবে না? আমি নিতে চাইলেও যাবে না?

বদলুর এই আগ্রহ-ভরা ব্যস্ততা দেখিয়া মনিয়া কেমন যেন একটু ব্যথিত হইল। বলিল, কিন্তু যাবে কেন? সে তার বাপ-মাকে ছেড়ে যাবে কি? আর বাবুও যদি তাকে যেতে না দেয়। তখন?

বদলুর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, দেবে না? কি বলছিস

তুই মনিয়া? বাবুরা ফুলমণিকে আটকালে আমি ওদের মাথা ভেঙে দোব।

মনিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বাবু দুটোকে না হয় তুমি মারতে পার, কিন্তু পরিণামে জেলে প'চে মরতে হবে, সে কথাটা ভেবে দেখেছ কি? তখন তো আর ফুলমণিকে সঙ্গে পাবে না।

বদলু মহা মুস্কিলে পড়িল। ভাবিল, তবে কি করা যায়? বলিল, আচ্ছা মনিযা, আমি আনতে চাইলেও কি ফুলমণি আসবে না?

কি জানি, নাও আসতে পারে। তুমিই বা সিলেটে যাচ্ছ কেন? চল না আবার আমাদের বাগানে?

তা আর সম্ভব নয়।

কেন?

বাবু যদি আমাকে ফের মারধোব করে?

না না, কিছুতেই বাবু তা করবেন না।

কিন্তু আমাকে চাবুক মারতে চেয়েছিল কেন?

মনিয়া একটি বার স্থির দৃষ্টিতে জাহাজের চিমনিটাব দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া বলিল, না, আমাদের বাবু কখনও মারেন না। কাউকে তুমি মাবতে দেখেছ? তুমি নতুন বাবুর মাথা ভেঙে দিয়েছিলে ব'লেই তোমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন। যাক ওসব কথা। চল আবার আমার সঙ্গে কল্যাণপুরে। আমি বাবাকে ব'লে বাবু যাতে তোমাকে কিছু না বলেন, সে ব্যবস্থা ক'রে দোব।

বদলুর যেন একটা বড রকমেব সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। উল্লসিত হইয়া বলিল, ফুলমণিকেও কিন্তু এনে দেওযা চাই। দেবে তো ঠিক?

মনিয়া বলিল, চল তো কল্যাণপুরে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বদলু বিষণ্ণ হইয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু সিলেটে যাব ব'লে এক সর্দ্দারের সঙ্গে এসেছি, এখন কল্যাণপুরেই বা যাব কি ক'রে ?

তুমি সর্দ্দারকে ব'লে দাওগে, তুমি সিলেটে না গিয়ে কল্যাণপুরে যাবে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, ওরা টাকা দিয়েছে, লোটা কম্বল দিয়েছে !

ওগুলো ফিরিয়ে দাও। দরকার হয়, আমার কাছে টাকা আছে, আমি দোব। আর সর্দ্দারের যদি এতে কোন আপত্তি থাকে তো, নিয়ে এস তাকে আমার কাছে। আমি সব ঠিক ক'রে দোব। আর জান না বুঝি, তোমাকে জোর ক'রে কোন বাগানে কাজ করতে নিয়ে যেতে পারে না। নিয়ে গেলে সর্দ্দারের সাজা হবে। এখন আর এগ্রীমেণ্ট আইন খাটে না।

বদলু খুশি হইয়া বলিল, আচ্ছা, তবে তাই ঠিক। আমি যাব না, সর্দ্দারকে জানিয়ে দোব। কিন্তু আমার টিকিট ?

তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

আচ্ছা, তবে চললুম।—বদলু চলিয়া গেল।

মনিয়া পুনরায় মেয়ে-কামরায় প্রবেশ করিল।

২১

আমি সত্যিই অবাক হই দীপকদার কথা ভাবলে। মানুষ বদলায়। নইলে তাঁর মত লোকও আজ কুলিমজুরদের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় কি ক'রে ভেবে পাই না !

কিন্তু মিস দত্ত, দীপককে যারা ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের কাছে তার এ পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক বা অসম্ভব ব'লে মনে হবে না। আমি দীপককে ভালই জানি। কলেজে যখন পড়তাম, তখনই তার মধ্যে সুন্দর একটা আদর্শবাদের পরিচয় পাই। কিন্তু তখন ভাবি নি যে, তার ঐ আদর্শ কর্ম্মের ভেতর দিয়েও এমনই রূপ নেবে।

ছায়া আর বিরিঞ্চি তখন বাগানের এক প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে; ইতস্তত বিচরণশীল ছিন্নভিন্ন মেঘের সাদা টুকরাগুলি ক্রমশ পশ্চিমাকাশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল।

ছায়া বলিল, চলুন, বসা যাক। অনেকটা পথ হাঁটা হয়েছে।

হ্যাঁ, মাইলখানেক হবে বইকি।

বাগানের সেই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীটি এই জায়গায় একটি মোড় ঘুরিয়াছে। ইহারই খানিক উপরে একটা পাহাড়িয়া প্রকাণ্ড গাছ ঝড়ে শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া গিয়া অসংখ্য শাখাপ্রশাখা লইয়া স্রোতস্বিনীর বুকে এমনই ভাবে পড়িয়া আছে যে, অনেক পরিশ্রম, অনেক কোলাহল করিয়া তবে জলস্রোত আপন পথ খুঁজিয়া লইয়া চলিয়াছে।

এই জায়গাটা ছায়ার বড় প্রিয়। একা সে অনেকদিন এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। বিরিঞ্চিকে বলিল, চলুন, ঐ গাছটার ওপরে বসিগে।

বিরিঞ্চি বলিল, আপনি গাছের ওপরে উঠুন, আমি নীচেই বসব।—বলিয়া তীরে সবুজ ঘাসের উপরেই বসিবার উদ্যোগ করিল।

ছায়া বলিল, না না, চলুন, ঐ ডালটার পাশে গিয়ে বসি। ও, মাটিতে পড়া গাছে চড়তেও ভয় পাচ্ছেন?—বলিয়া খিলখিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

বিরিঞ্চি বলিল, ভয় পাচ্ছি সত্যি মিস দত্ত, কিন্তু সে আমার নিজের জন্যে নয়, আপনার জন্যে।

ও, আমার জন্যে? তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার এ জায়গায় বসা অভ্যাস আছে। আপনি উঠুন। কি? সত্যি ভয় হচ্ছে নাকি?

বিরিঞ্চি হাসিয়া জবাব দিল, নেহাৎ যদি আপনি তাই ভাবেন তো আর কি করা যায়। আপনি পারলে আমারও নিশ্চয়ই পারা উচিত, কি বলেন?

আমরা মেয়েমানুষ যা পারি, আপনারা পুরুষমানুষ তার সব কিছুই কি পারেন?

বিরিঞ্চি তখন স্যাণ্ডেল খুলিয়া আস্তে আস্তে গাছটার গোড়ায় উঠিয়া নদীটির মাঝখানে একটা ডালে বসিয়া অন্য একটা ডালে পা রাখিল।

ছায়াও তখন চট করিয়া উঠিয়া যেখানে প্রথম শাখাটি বাহির হইয়াছে, সেইখানেই বসিল। হাসিয়া বলিল, আপনার চেয়ে আমি তাড়াতাড়ি উঠলাম কিন্তু।

আপনারা হলেন জঙ্গলের মানুষ, লাফ দিয়ে গাছে উঠবেন—এ তো খুব স্বাভাবিক।—বলিয়া বিরিঞ্চি হাসিল।

ছায়া কিন্তু খোঁচাটা হজম করিতে পারিল না। স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাবশত বলিয়া ফেলিল, যারা ধানগাছে কাঠ হয় ব'লে জানেন, তাদের পক্ষে গাছে উঠতে পারাটাও তেমনই স্বাভাবিক মিস্টার রায়, কি বলেন?

বিরিঞ্চি আর কোন প্রত্যুত্তর করিল না। দুইজনেই নীরব। কেবল নীচে প্রতিহত জলরাশি সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের সম্মুখেই একটা হরিৎবর্ণ টিলা খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। বিরিঞ্চি সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মুখ তুলিয়া তাকাইতেই বিরিঞ্চির কপালের আঘাতের উপরে ছায়ার চোখ পড়িল। দাগটা তখনও বেশ গভীরই আছে। বলিল, আপনার কপালের ঐ দাগটা কিন্তু এ জীবনে মোছবার নয়।

বিরিঞ্চি কপালের উপরে একটি বার হাত বুলাইয়া বলিল, কই, না, তেমন কিছু তো মনে হচ্ছে না।

ছায়া বলিল, আপনার হয়তো মনে হচ্ছে না, কিন্তু যারা আপনাকে দেখে, তাদের কিন্তু মনে প'ড়ে যায়।

বিরিঞ্চি হাসিল, বলিল, উপায় কি বলুন, এদের মধ্যে কাজ করতে হ'লে এটুকুর জন্যেও তৈরি থাকতে হবে।

ছায়া বলিল, বাগানে কুলিদের মধ্যে আপনার লাগছে কেমন?

বিরিঞ্চি তেমনই ভাবেই জবাব দিল, বেশ ভালই লাগছে। আমার জন্যে এই সুদূর আসামের চা-বাগানে একটা বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র প'ড়ে আছে—এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি, মিস দত্ত।

শুধু এরই জন্যে কি ঘরবাড়ি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এই জঙ্গলে প'ড়ে রয়েছেন?

নইলে আমার আর এখানে কি প্রয়োজনই বা থাকতে পারে? তা ছাড়া আপনারা যদি পারেন, দীপকও যদি পারে, আমিই বা পারব না কেন? মানুষ যখন মানুষকে আকর্ষণ করে, তখন তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় আছে কি?

কথাটা বিরিঞ্চি এমনই কণ্ঠে বলিল, যাহা ছায়ার কানে নূতন ঠেকিল। সে বিরিঞ্চির দিকে চাহিয়া ভাবিল, মানুষ তো তাহারাও. কিন্তু কই, বাইশ বছর চা-বাগানে কুলিদের মধ্যে থাকিয়াও তো নিজেকে এতটুকু বিলাইয়া দিতে পারে নাই? অথচ সুখের ক্রোড়ে লালিত, উচ্চশিক্ষিত, বিলাতফেরত একটা লোক কত সহজেই না

নিজেকে এই কুলিদের আপন করিয়া তুলিল! ছায়া বলিল, কিন্তু মিস্টার রায়, কলকাতায় কি এর চেয়ে আরও বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র প'ড়ে নেই ?

তা আছে, কিন্তু সেখানে কেমন যেন প্রাণের উৎসটি পথ খুঁজে পেলে না। তা ছাড়া কলকাতার ঐ দলাদলি, ক্ষমতালিপ্সা, কাজ না ক'রে নাম কেনার প্রবৃত্তি, সব কিছু থেকে দূরে চ'লে আসাই শ্রেয় মনে করলাম। অবশ্য কলকাতায় বড় বড় বক্তৃতা ক'রে, দল পাকিয়ে সহজে নাম কেনা যেত, দেশসেবার নাম ক'রে দুটো পয়সাও রোজগার হ'ত; কিন্তু সত্যিকার দেশসেবা হ'ত না। যারা সত্যিই দেশের সেবা করতে চায়, তাদের এখন কলকাতা ছেড়ে দূর গ্রামে চাষীদের মধ্যে কিম্বা এমনই সব কুলিমজুরদের মধ্যেই চ'লে আসা প্রয়োজন। আমি রাশিয়াতেও দেখে এসেছি, ওরা চাষী এবং মজুরদের মধ্যে কাজ ক'রে ক'রে দেশের চেহারা বদলে দিয়েছে। পনরো বছরে দেশটাকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশে সবেমাত্র চাষী আর মজুরদের মধ্যে কাজ স্থরু হয়েছে। রাশিয়ার তুলনায় এ যে কত সামান্য, কি বলব! সিলেট-কাছাড়ের সব চা-বাগানে কুলির সংখ্যা দেড় লাখেরও বেশি, আর আসামে চার লাখেরও বেশি। কিন্তু এই সাড়ে পাঁচ লক্ষ মজুরের দুঃখ-দৈন্য অভাব-অনটন সুখ-সুবিধার কথা আলোচনা করবার মত, তাদের হয়ে দাবি জানাবার মত একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানও নেই। এবং ফলে বাগানের মালিকেরা কুলিদের এই অজ্ঞতা ও অন্ধতার যত কিছু সুযোগ নেওয়া সম্ভব, নিচ্ছে।

ছায়া বলিল, চা-বাগানে কুলিদের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রয়েছে, সে জানি; কিন্তু বাগানের মালিকেরা কুলিদের অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে—এ ধারণাটা আপনার ভুল।

না, ভুল নয়, মিস দত্ত। এমনই ক'রে ধনীর দল যে দরিদ্রের সহায়হীনতার সুযোগ নেবে, এতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? বর্ত্তমান জগতে এই তো হ'ল স্বাভাবিক ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি।

সে যাই হোক, কুলিদের জন্যেও বাগানের মালিকেরা কিন্তু যথেষ্ট করছে এবং কুলিরা বেশ ভাল অবস্থায়ই বাস করছে, সে তো আপনাকে আগেও বলেছি। তা ছাড়া বর্ত্তমান বাজারে চায়ের যে দর, তার তুলনায় কুলিদের জন্যে বেশি কিছু করাও সম্ভব নয়।

বিরিঞ্চি হাসিল। বলিল, আপনি যা বললেন, এ হ'ল ধনী ব্যবসায়ীদের চিরন্তন মামুলি যুক্তি। কিন্তু যখন চায়ের বাজার খুব চড়া ছিল, শতকরা একশো টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়েছে, তখনই বা কুলিদের জন্যে মালিকেরা কতটুকু কি করেছেন? আজ না হয় চায়ের বাজার মন্দাই মেনে নিলাম, অবশ্য তার কতটুকু সত্যি, জানি না; কেন না, এখনও তো বাজারে দশ বারো আনা চায়ের পাউণ্ড বিক্রি হয়, যদিও তৈরি-খরচা সবসুদ্ধ বোধ করি চার আনার বেশি পড়ে না।

কিন্তু এর বেশি করতে গেলে মালিকদের বাগান ছেড়ে পালাতে হবে।

বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিকতার যুগে কুলিমজুরদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের লাভের অঙ্কটা ফাঁপিয়ে তোলাই তো হ'ল ব্যবসার উদ্দেশ্য। কাজেই শতকরা একশো টাকাই যদি লাভ না করা গেল, তবে বাগান রেখে লাভ কি? কি বলেন?

খোঁচাটা ছায়ার লাগিল। বলিল, আচ্ছা, মিস্টার রায়, আপনারা ঐ কুলিমজুরদের কথাই শুধু বলছেন, ব্যবসার অন্য দিকটা তো আপনারা একেবারেই বিচার করছেন না!

এরা নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে, শুধু শ্রম কেন, দেহের বিনিময়ে

যে ধন উৎপাদন করে, তার ন্যায্য অংশ পাচ্ছে না ব'লেই ঐ হতভাগাদের কথা বলছি, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর তাদের দাবিই যাতে অগ্রগণ্য হতে পারে, সেই চেষ্টাই করছি; তাদের হয়ে দাবি জানাচ্ছি। চা-বাগানের কুলিরা যে এমনই অবস্থায় দিন কাটায়, তা কখনও কল্পনাও করি নি।

কুলিরা তাদের দাবি জানাবে, এ কিছু অন্যায় নয়, কিন্তু—

না, মিস দত্ত, কথাটা আমি ঠিক সে ভাবে বলি নি। শ্রমিকেরা ধনীর দুয়ারে অনুগ্রহের দান হাত পেতে নিতে চায় না, তারা চায় তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। শ্রমিক তো ধনীদের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী নয়।

ছায়া বলিল, সে তো ভাল কথা। যার যেখানে উপযুক্ত দাবি রয়েছে, সেখানে যাতে তা গ্রাহ্য হয়, সে চেষ্টা তো তারা করবেই। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই, সমাজে ধন উৎপাদন কেবল শ্রমিকদের দ্বারাই সম্ভব হয় না। এতে শ্রমিকদের দান অতি সামান্য। প্রকৃতি যোগায় কাঁচা মাল, একে কাজে লাগাবার জন্যে প্রথমতই প্রয়োজন মূলধনের, দ্বিতীয়—বুদ্ধির, যা যোগায় ঐ মধ্যবিত্তশ্রেণী; তৃতীয়ত প্রয়োজন শ্রমিকের। অথচ আপনারা আর সব কিছুকে বাদ দিয়ে কেবল শ্রমিকদের দাবিই জানান কেন? আপনাদের আইডিয়া তো সাম্য বা সমবণ্টন নয়; আপনাদের যেন ইচ্ছা, এ যুগের ধনতান্ত্রিক কাঠামোটিকে বজায় রেখে বর্তমান মালিকদের স্থানে ঐ শ্রমিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। অথচ কাঁচা মাল, মূলধন এবং বুদ্ধির প্রয়োজন মিটিয়ে যেটুকু থাকবে, শুধু ততটুকুই না শ্রমিকদের প্রাপ্য। তাই ভাবি, ওরা সবটুকু গ্রাস করতে চায় কোন্ যুক্তিতে? আর এরই নাম কি শ্রেণীস্বার্থভেদের লোপ?

আপনি গোড়াতেই ভুল করছেন। শ্রমিকদের স্থান সর্ব্বনিম্নে নয়, সর্ব্বাগ্রে। কেন না, শ্রমিকেরা কাজ করে ব'লেই জমিতে ফসল জন্মায়, কাঁচা মাল কাজে লাগে। নইলে শুধু কাঁচা মাল কি কাজে লাগত, কি দত্ত? কুমোর মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করে ব'লেই তো মাটিও দামে বিকোয়। নইলে মাটি তো বিশ্ব জুড়েই রয়েছে।

কিন্তু এ কথাটা ভুললে চলবে কেন যে, ঐ মাটিকে কি ক'রে কাজে লাগানো সম্ভব, সে বুদ্ধি জুগিয়েছে অপরে, ঐ কুলিমজুরের দল নয়।

আপনার কথা মেনে নিলেও শ্রমিকদের দানের তুলনায় এ অতি সামান্য। কেন না, শ্রমিকেরা সমাজে ধনোৎপাদনের জন্যে দিচ্ছে তাদের বুকের রক্ত।

তা হোক, কিন্তু সেজন্যে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কিছু ক'মে গেল না। কাজেই কেবলমাত্র শ্রমিকেরাই সমস্ত ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপরে একাধিপত্য করবে, এ কেউ মেনে নিতে পারে না। অথচ আপনাদের লক্ষ্য কিন্তু তাই।

বিরিঞ্চি একটু ভাবিয়া বলিল, বর্ত্তমান শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের নেতাদের কারও কারও মনে যে তা জাগে না, এমন নয়। Dictatorship of the Proletariat যাদের আদর্শ, তারা কতকটা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করে বটে, কিন্তু সেটা ঠিক আমাদের আদর্শ নয়। আমাদের লক্ষ্য হ'ল শ্রেণীগত স্বার্থভেদের লোপ করা। বর্ত্তমান capitalism-এর কাঠামোটি খাড়া রেখে শুধু মেরামতের কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং capitalist নামক শ্রেণীকে ধ্বংস ক'রে শ্রমিকদের দ্বারা তেমনই আর একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করতেও আমরা চাই না। আমরা চাই নতুন একটা রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে গ'ড়ে তুলতে, যেখানে উচ্চনীচ নেই, বড় ছোট নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই, যেখানে

থাকবে সমাজের উপার্জ্জিত ধনের ওপরে মানুষমাত্রেরই সমান অধিকার। আমাদের motto হ'ল, এক কথায় বলতে গেলে—তুমি রাষ্ট্রের, রাষ্ট্র তোমার, তুমি কেবল তোমার নিজের জন্যই নও, you are for the state, the state is for you, you are not for yourself alone। অথচ বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তিতে শ্রমিকদের এই মতবাদ মেনে নিতেই ধনীদের যত আপত্তি। তারা চায়, শ্রমিকদের যেটুকু না দিলে নয়, শুধু সেইটুকুই দিতে। গাড়োয়ানেরা গাড়ির ঘোড়াকে কতটুকু আহার দেয় জানেন? যতটুকু না দিলে ঘোড়াটা আর গাড়ি টেনে উঠতে পারবে না, ঠিক ততটুকুই মাত্র। ঠিক তেমনই মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক এই এক একটা চা-বাগানকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে ধ'রে রেখে অগণিত লোককে পশুর মত ব্যবহার ক'রে চলেছে। এতে তাদের বিবেক নেই, বিচার নেই, বিবেচনাও নেই। কলকারখানার মালিকদেরই বলুন আর এই চা-বাগানের মালিকদেরই বলুন, সকলেরই লক্ষ্য শুধু ব্যাঙ্কের অঙ্ক বাড়ানো। এতে মানুষ যদি ম'রেও যায়, তবু তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের লভ্যাংশ বাড়াতেই তারা ব্যস্ত। রাজা, জমিদার, ক্রোড়পতি সকলেরই শতকরা নব্বুই জনকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখার যে জঘন্য মনোবৃত্তি, একেই বলে—বণিক-মনোবৃত্তি, profiteering mentality। মালিকদের উদ্দেশ্য, শ্রমিকদের সর্ব্বদাই অভাবের মধ্যে রাখা, শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে যতটুকু না দিলে নয়, সেটুকুই মাত্র দেওয়া, নইলে শ্রমিকেরাও যদি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করে, তবে হয়তো তারা মালিকদের মেজাজমত কাজ করতে রাজি হবে না। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে ব্যবধান আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে, সেটুকু তো বজায় রাখা চাই! সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বিশ্ব জুড়ে মালিকদের দল শ্রমিকদের যে মজুরি দেয়, সেটা তৈরি-খরচার একটা

অংশ ব'লেই ধ'রে নেয়। ফলে মজুরির ভাগটা যতই কম হবে, কোন বস্তুর তৈরি-খরচাটাও সেই অনুপাতে ক'মে যাবে; তার ফলে লাভের অংশ যাবে বেড়ে। এই যে ইতর মনোবৃত্তি, এই হ'ল শ্রমিকদের শোষণের মূল কারণ। কাজেই ভেবে দেখুন দেখি, এ অবস্থার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে কি না।

কিন্তু আপনাদের এসব মতবাদের ফলে যদি দেশের বিত্তশালীরা আর কোন কলকারখানাতে মূলধন না খাটাতে চায় কিম্বা তাদের টাকা বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে ব্যবহার করে, তখন আপনাদের দেশের এই অসংখ্য দরিদ্র শ্রমিকের গতি কি হবে? ধনীদের ধ্বংস করতে গিয়ে দেশের ধন-উৎপাদনের মূল উপাদান মূলধনকে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট ক'রে দেবেন না যেন।

দেশের বুক থেকে মুষ্টিমেয় ধনীর দল মুছে গেলেই রাষ্ট্রের ধনোৎপাদনের সব মূল উৎসগুলোও ম'রে যাবে, এমন ভাববার কি কারণ থাকতে পারে, মিস দত্ত? আমরা তো চাই না যে, দেশের গোটাকতক লোকের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হোক, এবং তাই নানা ভাবে খাটিয়ে তারা ততোধিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হোক, এবং এই উপায়ে রাজ্যের যত মূলধন সব তাদের হাতে জমা হয়ে থাকুক। দেশের জমির অধিকারী থাকবে জনকয়েক জমিদার, এও আমরা সহ্য করব না। এই দুই শ্রেণীর লোকই তাদের নেহাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দেশের অর্থাগমের কেন্দ্রগুলোকে এমনই কৌশলে নিয়ন্ত্রিত করে, যাতে দেশ জুড়ে অগণিত লোক চিরদিন অভাব-অনটনের ভেতরে বাস করে, রাতদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও পরিবারের অন্নসংস্থানের মত অর্থ উপার্জ্জন ক'রে উঠতে পারে না। কতকগুলো লোক ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যে বাস করবে, আর বাকি সব মরবে না খেয়ে—এই কি হবে

দুনিয়ার নিয়ম? আমরা চাই ধনের সমবণ্টন। আমাদের মতে—রাষ্ট্রই হবে দেশের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনের মালিক। এক কথায়, state ownership of all property। কাজেই মূলধন যোগাবার দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রের। আর দেশের অর্থ বিদেশে খাটাবার যে ভয়, সে নেহাৎ অমূলক। কেন না, রাষ্ট্রতন্ত্র আইনের দ্বারা সে পথ অতি সহজেই বন্ধ ক'রে দিতে পারবে।

ছায়া বলিল, তার মানে হ'ল, শুধু বিদেশীদের হস্তগত এই সব চা-বাগানই নয়, দেশের সব ধনী, রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতিরও আমূল ধ্বংসসাধন, নয় কি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কেন না, এমনই একটা অসহনীয় অবস্থা মানুষ চিরকাল সইতে পারে না। ধন-বৈষম্যই বিশ্বের সকল সমাজে যত কিছু অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, চুরি, ডাকাতি, অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ সমস্তের মূল কারণ। এই সব অর্থলিপ্সুর দল দরিদ্রদের কি উপায়ে শোষণ করে, জানেন, মিস দত্ত? করে ঐ মধ্যবিত্তদের সাহায্যে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হ'ল, বাজারে যাকে বলে—পাইকার কিম্বা দালাল, এদের কাজ হ'ল নিজেদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে অল্পবুদ্ধিদের মাথায় হাত বুলিয়ে দুটো পয়সা ক'রে নেওয়া। আমাদের দেশে শুধু নয়, সারা দুনিয়াতেই আজকের সমাজ তিন শ্রেণীর লোকে গঠিত—বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, ধনী, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিকের দল। অথচ লোকসংখ্যার অনুপাতে এই ধনীর দল মুষ্টিমেয় হ'লেও তারাই আজ ব্যাঙ্ক, লিমিটেড কোম্পানি এবং বড় বড় কলকারখানা স্থাপন ক'রে দেশের যাবতীয় ধনোৎপাদনের পথগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত ক'রে রেখেছে। আর এতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছে তাদের ডান হাত। Capitalistরা রথরজ্জুটি ধ'রে ব'সে থাকে,

আর বুদ্ধিজীবীরা ঐ রথটাকে টেনে নিয়ে চলে বিত্তহীনদের বুকের ওপর দিয়ে। এই হয়েছে বর্ত্তমান সমাজের প্রকৃত রূপ। ধনীদের বড় বড় অট্টালিকার সৌধমূল ঐ বিত্তহীনদের হাড়-পাজরা দিয়েই তৈরি। ভেঙে দিন একবার ঐ ভিত্তি, দেখবেন, তার নীচে রয়েছে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের কঙ্কাল। শুধু তাই নয়, এই স্থূলবুদ্ধি ধনীরাই সূক্ষ্মবুদ্ধি মধ্যবিত্তের সাহায্যে দেশের রাষ্ট্রপ্রথাও নিয়ন্ত্রিত করছে, এবং নিজেদের সুযোগ এবং সুবিধানুযায়ী আইন প্রণয়ন ক'রে দরিদ্রদের শোষণের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করছে। দরিদ্রদের শোষণের ব্যাপারে মধ্যবিত্তেরাও বিত্তশালীদের সঙ্গে একপ্রাণ, আসলে এরা একই জাত। কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য, capitalistদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদেরও শ্রেণী হিসাবে লোপ ক'রে দেওয়া।

প্রচুর ধনসম্পদের মালিক যারা, তাদের বর্ত্তমান যে শোষণনীতি তার উচ্ছেদ সাধন করুন আপনারা, আপত্তি নেই; কিন্তু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত যারা, যাদের বলা হয় professional class, যেমন ব্যবহার-জীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সরকারী কর্ম্মচারী, সাধারণ ব্যবসায়ী, তাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা না ক'রে বরং ঐ শ্রমিকদেরই মধ্যবিত্তদের স্তরে উন্নত করতে চেষ্টা করুন না কেন? এরাও তো প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকেরই দলে। এরা তো অলস নিষ্কর্ম্মা জীবন যাপন করে না, খেটে খায়। এদেরই বা শ্রমিকশ্রেণী থেকে বাদ দেবেন কেন?

কেন ওদের বাদ দোব, আগেই বলেছি, মিস দত্ত। এরা এবং ধনীর দল জাত হিসাবে হ'ল একই, বিশেষ পার্থক্য নেই।

তা ঠিক নয়, মিস্টার রায়। যারা অনুপার্জ্জিত অর্থে একদিন ধনী কিম্বা জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাদের অনেকে অর্থের অপব্যবহার ক'রে ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এসে দাঁড়ায় সত্যি, কিন্তু এর আর একটা দিক

আছে। যারা এক সময়ে নিঃসম্বল দরিদ্র ছিল, তাদেরও অনেকে বুদ্ধি এবং কর্ম্মদক্ষতার দ্বারা কিছু ধনসম্পদ উপার্জ্জন করতে পারলেই এসে ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাই বৃদ্ধি করে। কাজেই দেখুন, শ্রেণী হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে একমাত্র মধ্যবিত্তরাই। আর আপনাদের আদর্শও এই হওয়া উচিত, যাতে ঐ বিত্তহীন দরিদ্রদের এবং বিত্তশালী ধনীদের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের স্তরে উন্নত এবং অবনত করতে পারেন। কিন্তু তা না ক'রে যদি আপনারা বড় যারা, উন্নত যারা, তাদের টেনে ঐ চাষী-মজুরদের স্তরে নামিয়ে নিতে চান তো, এতে দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই ভাল হতে পারে না। তখন সারা দেশটাই ঐ কুলিমজুরে ভ'রে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাল্‌চার এবং ট্র্যাডিশন যাবে নষ্ট হয়ে। তা ছাড়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বেঁচে থাকবার পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই, সমাজে এবং রাষ্ট্রে যত কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে, তা সম্ভব হয় অনেকাংশে ঐ মধ্যবিত্তদের দ্বারাই। এদের মধ্যে থেকেই জন্মায় রাষ্ট্র এবং সমাজের যত সেবক, এবং দেশ ও রাষ্ট্রতন্ত্রের নায়ক-নায়িকাও হয় এরাই। আপনার ও দীপকদার কথাই ধরুন না। একটু ভাবলেই বুঝবেন, আপনারাও মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত। কাজেই শ্রেণী হিসাবে এদের অস্তিত্ব না থাকলে দেশের পক্ষে হবে এক মহা দুর্দ্দিন। আর যে রাশিয়ার কথা আপনি বললেন, সেই রাশিয়াতেও ঐ মধ্যবিত্ত লোকেরাই বিপ্লব জাগিয়ে তুলেছিল, এবং তারাই আজ প্রাধান্য লাভ ক'রে দেশ শাসন করছে। এই হ'ল জগতের রীতি। তাই বলছিলুম, শ্রেণীভেদ উঠিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে চিরন্তন বৈষম্য লোপ ক'রে দেওয়ার যে সব কল্পনা আপনাদের রয়েছে, সে নিছক কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হবে। কারণ মার্ক্সের সে মতবাদ কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় নি, আদর্শ ই রয়ে গেছে। রাশিয়াতে তাই ঘটেছে, ঐ যে দলে

দলে লোক স্ট্যালিনের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এর গোড়াতেও রয়েছে ঐ কারণই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চিরতরে চেপে রাখবার যে চেষ্টা হয়েছিল, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। জোর ক'রে একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিয়ে কোন রাষ্ট্রপ্রথা গঠন করতে চাইলে পরিণামে এই হওয়াই স্বাভাবিক। একদিন যারা লেনিনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় নিজের মতবাদ বিসর্জ্জন দিতে ভেবেছিল, তারাও নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছে ঐ চাষী ও মজুরদের সঙ্গে, তাদের সে মতবাদ স্থায়ী হতে পারল না। সেই বুর্জোয়া মনোবৃত্তি মাথা তুলে উঠতে চাইল। এ চাওয়াটাও প্রকৃতির নিয়মে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কি বলেন, মিস্টার রায়?

আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, মিস দত্ত। সে সম্ভাবনা আছে ব'লেই দেশের ও রাষ্ট্রের নায়কত্ব আমরা কোন শ্রেণীবিশেষের হাতে তুলে দিতে চাই না। আমাদের লক্ষ্য হ'ল, শ্রেণী ও ব্যক্তিগত স্বার্থভেদ তুলে দিয়ে মানুষমাত্রকেই রাষ্ট্র এবং লোকসেবায় অনুপ্রাণিত ক'রে তোলা। যারা ব্যক্তিগত স্বার্থভেদ ভুলে গিয়ে সমষ্টি-স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করবে, তারাই হবে দেশের সত্যিকার নায়ক। সুতরাং সে যে শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, যদি রাষ্ট্র আমার জন্য, আমি রাষ্ট্রের জন্য—এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তাকে দেশ আপনা হতেই সাদরে বরণ ক'রে নেবে।

কিন্তু মিষ্টার রায়, আমার মনে হয়, আপনারা মার্ক্সের কল্পিত ঐ রাষ্ট্রপ্রথা প্রবর্ত্তন করতে গিয়ে এদেশেও জাগিয়ে তুলছেন একটা শ্রেণীসংঘাত।

এখনই কি সে সংঘাত নেই বলতে চান?

নিশ্চয় নেই।

বিরিঞ্চি হাসিল। বলিল, দেশের শতকরা নব্বুই জনকে দারিদ্র্যের কঠিন পেষণে ও আইনের নিগড়ে বেঁধে রেখে যদি বলেন, তা নেই, তবে নেইই বলতে হবে; এবং আমরা তা সৃষ্টি করতে চাই, এও স্বীকার ক'রেই নোব।

তাই বলুন। আপনারা শ্রেণীভেদ উঠিয়ে দিতে চান না; চান রাষ্ট্রব্যবস্থাটা ঐ চাষী ও মজুরদের হাতে তুলে দিতে, আমি প্রথমেই যা বলেছি। তা দিন না চা-বাগানের এক একটা কুলিকে আসামের এক একজন মন্ত্রী ক'রে।—বলিয়া ছায়া একটু শ্লেষের হাসি হাসিল।

বিরিঞ্চি বলিল, আমাদের লক্ষ্য কিন্তু তাই। যেদিন দেখব, এই চাষীমজুরের দলও তেমনই সুশিক্ষিত উপযুক্ত হয়ে নিজেদের অধিকার নিজেরা বুঝে নিয়েছে, সেদিনই বুঝব, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

কিন্তু এই শ্রেণীসংঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল তো জগতের অন্যান্য দেশে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন।

উপায়ই বা কি, বলুন? দেশের জনকয়েক লোক যদি স্বেচ্ছায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন না করে, তবে শ্রেণী-সংঘাত আসতে বাধ্য। মানুষ তার ন্যায্য অধিকার থেকে আর কতদিন বঞ্চিত হয়ে থাকবে, বলুন? কাজেই আসল কথা হ'ল এই, শ্রেণী-সংঘর্ষকে যে একেবারে বাঁদ দিয়ে চলতে পারব, সে আমরাও ভাবি না, চাইও না। চাষী এবং শ্রমিকদের মনে ঐ শ্রেণীগত স্বার্থভেদের চিত্র এঁকে দিয়ে একটা প্রবল বিপ্লবের সৃষ্টি না করলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির সূচনা হবে কি দিয়ে?

কিন্তু এই শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে দেশের বুকে রক্তের যে বন্যা বহাবেন, তাকে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবেন তো? দেখবেন, নিজেরাই এতে ভেসে যাবেন না যেন।

চিরকাল শ্রেণীবিবাদকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদেরও উদ্দেশ্য নয়, কোন প্রতিষ্ঠানেরই সে আদর্শ হতে পারে না। It's only a means to an end, not the end itself। আমাদের উদ্দেশ্য, শ্রেণীগত স্বার্থবুদ্ধির ফলে যে বিপ্লবের সূচনা হবে, তা দিয়েই শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধিব উচ্ছেদসাধন। আব এই রক্তের বন্যাব কথা যা বললেন, সে আপনার মিথ্যা ভয়, মিস দত্ত। শ্রমিকেরা চায় না কারও বক্ত নিতে, বরং তারা তা দিতেই প্রস্তুত আর দিচ্ছেও তাই। ভেবে দেখুন দেখি, বর্ত্তমান জগতের এই যে ধনতান্ত্রিক কাঠামোটি, একে বাঁচিয়ে রাখছে কিসে? ঐ শ্রমিকদের বুকের রক্ত, নয় কি? এও একটা মজাব কথা যে, ঐ ধনীর দল দেশ দেশ ব'লে একটা মিথ্যা দেশাত্মবোধের প্রেরণা শ্রমিকদের প্রাণে জাগিয়ে তুলে ঐ ধনতান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে তাদের উৎসর্গ করে। অথচ এই যে রক্তদান, এতে শ্রমিকদেব কিছুই লাভ হয় না; তারা যেমন ছিল, তেমনই থেকে যায়। মাঝ থেকে ঐ ধনী মালিকের দল দুটো পয়সা হাতিয়ে নেয়, দেশবিদেশে একটু সুনাম অর্জ্জন করে। তা ছাড়া একটা রক্তাক্ত বিপ্লবের সূচনাতেই ঐ ধনীর দল রাষ্ট্রের সহায়তায় তাদের সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শ্রমিকদের বুকে, আব তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যটিকে অঙ্কুরেই দেবে বিনষ্ট ক'রে। কাজেই অহিংস অসহযোগের ভেতর দিয়েই আমরা চাই এই বিপ্লবের সফলতা অর্জ্জন করতে।

কিন্তু একটা বিরাট বিপ্লবের মধ্যে না গিয়ে কি আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না?

তা হবে না ব'লেই তো মনে হয়।—বলিয়া বিরিঞ্চি কি ভাবিতে লাগল।

ছায়া তখন চায়ের ফ্লাস্কটা আনিতে নীচে নামিয়া গেল

২২

চা-ভরা থার্মোফ্লাস্কটা লইয়া ছায়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল। বিরিঞ্চি চা খায় না। কাজেই সে নিজেই ফ্লাস্ক্ হইতে বাটিতে চা ঢালিয়া একটা চুমুক দিয়া কহিল, আচ্ছা মিস্টার রায়, কুলিমজুরদের অবস্থার উন্নতি কি দেশের অ্যাসেম্বলি কাউন্সিল প্রভৃতির সাহায্যে সম্ভব নয়—অর্থাৎ সংস্কারমূলক ব্যবস্থার দ্বারা ?

সম্ভাবনা খুবই কম। বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা কল্পনারও অতীত। ভবিষ্যতেও দেখবেন, রাষ্ট্রব্যবস্থা এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং ধনীর দলই আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চাইবে। তবে যদি দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীমাত্রেই ভোটাধিকার পায়, এবং দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্ত্তন আসে, এবং তারা শ্রমিকদের সঙ্গে সমান অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত হয়, তবে হয়তো হতেও পারে, কিন্তু সে ভরসা রাখি না। ঐ কায়েমী স্বার্থবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন আসবে না কোন পরিবর্ত্তন, তেমনই সহজে তারা ঐ প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকার মেনে নিতেও চাইবে না, বরং বাধা দেবে। কাজেই আমার বিশ্বাস যে, বিরাট একটা বিপ্লব ভিন্ন ঐ কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমাজদেহ থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব হবে।

কিন্তু আপনাদের বিপ্লব-আন্দোলন দেশের বুকে কত অত্যাচার কত অনাচার এনে দেবে, একবার ভেবে দেখেছেন কি ?

তা কতকটা ভেবেছি বইকি? কিন্তু 'নান্যঃ পন্থাঃ', একটি পুরনো প'ড়ো প'ড়ো ইমারত যা সহস্র সহস্র শ্রমিকের বুকের হাড়-পাঁজরের ওপরে গ'ড়ে উঠেছে, তাকে ধ্বংস ক'রে নতুন সৌধ গ'ড়ে তুলতে হ'লে তার আনুষঙ্গিক আপদ-বিপদের জন্যেও আমাদের তৈরি হতে হবে বইকি। পুরনো কাঠামোটাকেই জোড়াতালি দিয়ে খাড়া রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং একে ভাঙতে গেলে যে ধুলোবালি উড়বে এবং দুচারজন কুলিমজুর ইটকাঠের নীচে চাপা পড়বে, তাতে ভয় পেলে আমাদের চলবে না। এই ভাঙা-গড়ার ভেতরেই রয়েছে আমাদের আদর্শের পূর্ণতা। আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল—organisation, revolution and reconstruction।

কিন্তু মিস্টার রায়, যাদের দিয়ে আপনারা নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করবেন, সে সৌধের চাপ সইবার মত ক্ষমতা তাদের আছে কি না, সে ধাতুতে তারা তৈরি কি না, তারও বিচার এবং বাছাই প্রয়োজন। শুধু উন্নত করব বললেই কাউকে উন্নত করা যায় না। বড় এবং উন্নত হওয়ার মত শক্তিসামর্থ্য নিয়ে জন্মানো চাই।

জানি মিস দত্ত, ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না। কিন্তু বড় হবার যে পথ, সেটা অন্তত তাদের কাছে খোলা থাকা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সেই পথ রুদ্ধ। তা ছাড়া কেবল জন্মস্বত্বের বিচার ক'রে কেউ কোন একটা স্বার্থ কায়েমীভাবে ভোগ ক'রে যেতে পারে না। মানুষমাত্রেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সুযোগের অভাবেই তার নিজের ক্ষমতা কতটুকু সে জানে না। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ঐ কায়েমী স্বার্থবাদী ধনতান্ত্রিক মতবাদ এবং রাষ্ট্রনীতি। আমরা চাই, এই রাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্ত্তন; চাষী ও শ্রমিকগণের মাঝ থেকেই জাগিয়ে তুলতে চাই সত্যিকার মানুষগুলিকে, যারা

গড়বে ভবিষ্যৎ ভারতের নতুন রাষ্ট্র, নতুন সমাজ। সে সমাজ হবে শ্রেণীবিহীন এবং ধনসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তা হ'লে সোজা কথায় বলতে গেলে, আপনাদের কল্পিত রাষ্ট্র হবে বর্ত্তমান রাশিয়ার রাষ্ট্রপদ্ধতির একটা ভারতীয় সংস্করণ মাত্র?

না, ঠিক তা নয়। তবে রাশিয়ার নাম শুনলেই আপনাদের মত আমরা শিউরে উঠি না। ওরা যদি বর্ত্তমান যুগে একটা আদর্শ রাষ্ট্রের, একটা নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন ক'রে থাকে, তবে তার যেটুকু আমাদের দেশের পক্ষে কার্য্যকরী, ততটুকু গ্রহণ না করবার মত অচল অনড় মনোবৃত্তি আমাদের নয়।

মনের চলনশীলতার দ্বারাই সংস্কারমুক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সত্যি। কিন্তু রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রথাকেই বা আপনারা একেবারে আদর্শ প্রথা ব'লে মেনে নিচ্ছেন কেন? সে কি কেবল মনের মুক্তির এবং সচলতার প্রমাণ দিতে চান ব'লে? যদি তাই হয়, তবে নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিজ্‌মকেই আদর্শ ব'লে গ্রহণ করুন না কেন? আর আপনাদের একনায়কত্বের মূল কথাও তো কতকটা তাই-ই।

আমাদের আদর্শের ওপর বৃথা কটাক্ষ করবেন না। কেন না, আমরা হিট্‌লার-মুসোলিনির প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রপ্রথার পক্ষপাতী নই। তার একমাত্র কারণ এই যে, ঐ দুটোর উদ্দেশ্য হ'ল, শ্রেণীভেদকে স্বীকার ক'রে নিয়ে ধনী এবং মধ্যবিত্তদের ক্ষতিটুকু সমা[illegible]পূর্ণ বজায় রেখে দরিদ্রের জন্যে যদি কিছু [illegible] তাই করা, নইলে নয়। কাজেই ফ্যাসিজ্‌ম [illegible] দরিদ্রের যেমন অভাব ঘোচে না, তেমনই [illegible] তাদের কোন স্থান নেই। তা ছাড়া পরধনলিপ্সা, পররা[illegible] পরজাতিপীড়নের যে স্পৃহা, সে তো আমাদের কল্পনারও বাইরে,

মিস দত্ত। সে ভাবধারাকে ধ্বংস করাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বটে।

কিন্তু দেখছেন তো, সমগ্র জগৎ আজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে উঠছে।

এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, মিস দত্ত। এ রকমটা হওয়াই খুব স্বাভাবিক। আজ পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলো যখন দেখছে, রাশিয়ার ঐ আদর্শবাদ এবং রাষ্ট্রপ্রথার ফলে চাষী ও শ্রমিক প্রভৃতি সাধারণ লোকের মধ্যে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট সচেতন ভাবধারা প্রসারলাভ ক'রে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থভোগী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহ ক্রমেই শক্তিসঞ্চয় ক'রে উঠছে, তখনই তাদের টনক ন'ড়ে গেছে; এবং ঐ ভাবধারাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে সদলবলে চেষ্টা চলছে। আর তারই ফলে হ'ল ঐ ফ্যাসিজ্‌ম ও নাৎসিবাদের জন্ম। কিন্তু এ দেখে আমরা মোটেই ভয় পাই নি। কেন না, ঐ ধনলিপ্সু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্বের দুর্ব্বল ও অনুন্নত দেশগুলিকে নিজেদের দখলে এনে দেশের অতিরিক্ত লোকের বসবাসের এবং কাঁচা মাল হস্তগত করার এবং তৈরি মাল বিক্রি করার যে চেষ্টা হচ্ছে, তারই ফলে পরস্পরের মধ্যে একটা বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হয়েছে, এবং পরিণামে এরা নিজেরা ধ্বংস হয়ে নিষ্কণ্টক ক'রে তুলবে আমাদের লক্ষ্যে পৌছানোর পথটিকে। অবশ্য আমাদের দেশেও সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিজ্‌মের সহায়করূপে এক [illegible] লোকের সৃষ্টি হচ্ছে; তারা হ'ল বিশেষভাবে দেশীয় রাজা, জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং মুষ্টিমেয় মোটা মাইনের রাজকর্ম্মচারীর দল। এদের সঙ্গে ভবিষ্যতের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবীই হয়ে উঠেছে মনে করছি। তার জন্যেই ঐ বাগিচার কুলিদের প্রস্তুত করুন।

ছায়া কি ভাবিল। ক্ষণকাল পরে বিরিঞ্চির দিকে চাহিয়া বলিল, না মিস্টার রায়, এ তর্কের শেষ নেই। তবে আপনারা যে একটা বিরাট সংঘর্ষের সম্মুখীন হচ্ছেন, এই ভেবে আমার কেমন ভয় হচ্ছে।

বিরিঞ্চি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, চলুন চলুন। আজই ভয় পেলে চলবে কেন? কথায় কথায় অন্ধকার হয়ে গেল যে। কিন্তু উঠিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল, ছায়া হঠাৎ পা ফসকাইয়া পড়িয়া যাইতেছে। বিরিঞ্চি তৎক্ষণাৎ ধরিয়া তাহাকে সোজা করিয়া বসাইয়া দিল। ছায়া সত্যই একটু ভয় পাইয়াছিল। বিরিঞ্চি কহিল, হঠাৎ কি হ'ল, আর একটু হ'লেই তো প'ড়ে যেতেন? আস্তে আস্তে নেমে আসুন। তারপর ছায়ার হাত ধরিয়া তাহাকে গাছ হইতে নামাইয়া নিজেও নামিয়া আসিল।

ছায়ার গৌরবর্ণ গণ্ডস্থল তখন সূর্য্যের শেষ রশ্মির মতই রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া পরিধেয় কাপড়-খানা ঠিক করিয়া লইল এবং সলজ্জভাবে বলিল, উঠতে গিয়ে পাটা কেমন পিছলে গেল।—বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

কিন্তু সে লজ্জা ছায়া সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। বিরিঞ্চির সম্মুখ হইতে তখনকার মত পলাইতে পারিলে যেন সে বাঁচিত। নিঃশব্দেই সে পথ চলিতে লাগিল।

বিরিঞ্চি কহিল, কোথাও লাগে নি তো?

না না, কিছু হয় নি।

কথাবার্ত্তা আর বিশেষ কিছু হইল না। কিছুক্ষণ পরে বিরিঞ্চি তাহাদের বাংলোর সামনে আসিয়া সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া, 'আচ্ছা, নমস্কার, আজ তবে আসি' বলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

ছায়া তখন এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিরিঞ্চিকে

প্রতিনমস্কারও করিল না। কিন্তু হঠাৎ তাহাকে উপরে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, দেখবেন, আমার প'ড়ে যাওয়ার কথাটা কাউকে বলবেন না যেন।

হাসিতে বিরিঞ্চির মুখ ভরিয়া উঠিল। না না, সেকি কথা! সে উপরে উঠিয়া গেল।

ঝোঁকের মাথায় বিরিঞ্চিকে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ছায়া কেমন যেন ভয়ানক লজ্জিত হইয়া পড়িল। ছি ছি, এ কি করিল সে! দিনের আলো তখন নিবিয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, নাঃ, মিস্টার রায়ের কাছে এমন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা তাহার ঠিক হয় নাই।

বাসায় ফিবিয়া হাত মুখ ধুইয়া ছায়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মিস্টার রায় তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে আজ নিশ্চয়ই সে ঐ ডাল-পালার মধ্যে পড়িয়া গিয়া কঠিন আঘাত পাইত। কথাটা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, মিস্টার বাযেব দেহে জোর আছে বটে। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারের পর কাল আবার সে কি করিয়া বিরিঞ্চির সম্মুখে যাইবে, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ভাবিতে ভাবিতে ছায়া ঘুমাইয়া পড়িল। হঠাৎ কাহার ডাকে জাগিয়া শুনিল, ঠাকুরমা তাহাকে খাওয়ার জন্য ডাকিতেছেন।

২৩

তুই রাজি ঠাকুরঝি?

না বউদি, কাজ নেই, আমার কেমন ভাল লাগে না

তুই শেষটায় ন্যাকামি সুরু করলি?

না থাক, বউদি।

চল চল। একসঙ্গে ব'সে কাজ করতে পারিস, গল্পগুজব করতে পারিস, বক্তৃতা করতেও আটকায় না, আর তাস খেলতেই যত কিছু লজ্জা! আমি যেন কিছুই জানি না!

ছায়ার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। কি জানে বউদি? তবে কি বিরিঞ্চিবাবু সেদিন বিকালের ঘটনাটা দীপকদা ও বউদিকে জানাইয়াছেন? ছায়া যেন কিছুই বুঝে নাই, এমনই ভান করিয়া বলিল, বা! কি জানিস তুই বউদি?

আবার ন্যাকামি?

সত্যি, আমি কিছু জানি না। তোর পা ছুঁয়ে বলতে পারি।

দেখ ঠাকুরঝি, তুই যা আমিও তাই। আমার কাছ থেকে লুকোবি কি ক'রে? বল দেখি, তুই বিরিঞ্চিবাবুকে ভালবাসিস কি না?

ছায়ার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। কথাটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বলিল, তুই সত্যিই ভারী ছ্যাবলা হয়ে উঠেছিস বউদি। কিন্তু মনের সন্দেহটা তাহার কাটিল না। বলিল, তাস তো খেলবি, কিন্তু মিস্টার রায় তাস খেলা জানেন তো?

তা অবশ্যই জানেন।—ড্রয়ারটা খুলিয়া মনীষা দুই সেট তাস বাহির করিয়া বলিল, সত্যি, এমনই একটা কিছু না করলে আজকের এই মেঘলা সন্ধ্যেটা কাটানো যায় কি ক'রে?

কেন? দীপকদার সঙ্গে আড্ডা মার না।

হুঁ, আর তুমি ঠাকুরপোর কাছে গিয়ে আরাম ক'রে গল্প করবে, না?

তাস লইয়া উভয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। রাত্রে খিচুড়ি খাওয়া হইবে ঠিক হইয়াছে, তাই হাঙ্গামা কম। মনীষা ঠাকুরকে সব বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছে।

বিরিঞ্চি বার্নার্ড শ'র 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান' বইখানা পড়িতেছিল। দীপক ডাকিল, বিরিঞ্চি, চল, খানিকক্ষণ তাস পেটা যাক।

কথাটা বিরিঞ্চির কানে গেল কি না বোঝা গেল না।

দীপক আবার ডাকিল, ওরে, শুনছিস?

বিরিঞ্চির তখন খেয়াল হইল। মুখ তুলিয়া বলিল, কি?

বইখানা রেখে উঠে আয়।

কেন?

তাস খেলব। দেখছিস না, ছায়া আর মনীষা এসে হাজির হয়েছে?

পাগল হয়েছিস?

কেন রে?

আমি তো তাস খেলতে জানি না।—বলিয়া একটু হাসিল।

দীপক বলিল, যা জানিস যথেষ্ট।

মনীষা তখন বিরিঞ্চির হাত হইতে বইখানা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, বই নিয়েই তো আছ সারাদিন ঠাকুরপো, বই এখন থাক। একটু ওঠ।

অগত্যা বিরিঞ্চিকে উঠিতে হইল।

চারিজনে চারিখানা চেয়ার লইয়া একটা টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া পড়িল। বিরিঞ্চি বসিল বটে, কিন্তু তাহার মাথায় সেই 'ম্যান সুপার্-ম্যানে'রই চিন্তা।

মনীষা কহিল, কে প্রথম তাস দেবে?

ছায়া বলিল, তোমার উৎসাহ যখন বেশি, তুমিই দাও।

তোমারও কিছু কম নয়।—মনীষা ছায়ার প্রতি একটা কটাক্ষ করিয়া তাস ভাঁজিতে লাগিল।

বিরিঞ্চি কহিল, কি খেলা হচ্ছে? টোয়েন্টিনাইন, না ডিক্লেয়ার?

মনীষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছায়াও মুখ টিপিয়া হাসিল। দীপক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তুই নেহাৎ সেকেলে! আজকাল ওসব কেউ খেলে?

তবে কি খেলা হবে?

মনীষা জবাব দিল, কেন? ব্রিজ অথবা ফ্লাস।

ব্রিজ! ও আমি প্রায় জানি না বললেই চলে। আর ফ্লাসের নামও তো শুনি নি।

মনীষা হাসিয়া বলিল, তাসের কোন্‌টার কি নাম, তা জানা আছে তো? নাও, ওঠাও তোমার তাস।

কিন্তু খেলা আর হইয়া উঠিল না। বাহিরে একটা ভীষণ গোলমাল শোনা যাইতেছিল। দীপক ও বিরিঞ্চি হাতের তাস ফেলিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কতকগুলি কুলি বাংলোর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। সকলেরই উত্তেজিত ভাব।

কুলিরা উপরে উঠিয়া হেঁট হইয়া বাবুদের নমস্কার করিল। ব্রীজ-মোহন সর্দ্দার উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, বাবুজি, আমাদের বাগানের ম্যানেজার খুন হয়ে গেছে।

খুন? সে কি রে?—দীপক ও বিরিঞ্চি উভয়েই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। দীপক পুনরায় প্রশ্ন করিল, খুন হয়ে গেছে মানে? তোদের কোন্ বাগান?

ফিরিঙ্গিমারা বাগান, বাবুজি। ম্যানেজার বড় অসৎ ছিল। তাই কয়েকটা কুলিতে মিলে ম্যানেজারকে লাঠি মেরেছিল। সাহেবটা তখনই মাটিতে প'ড়ে ম'রে গেছে, বাবুজি।

দীপক তখন কুলিদের নিকট হইতে ফিরিঙ্গিমারা বাগানের ম্যানেজারের খুনের কারণ সম্বন্ধে যাহা শুনিল, তাহা এইরূপ—

ফিরিঙ্গিমারা বাগিচার ম্যানেজারের অত্যাচারে কুলিরা বউ-ঝিদের ঘরে রাখিতে পারিত না। একটি একটি করিয়া দুইটি কুলিমেয়েকে সে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইতে সাহেবের খানসামাটা ভানুর বউকে ফুসলাইবার চেষ্টায় ছিল। এই ভানুর বউ কল্যাণপুর বাগানের ফুলমণি। বদলু ফুলমণিকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলে ফুলমণি আর বেশিদিন কল্যাণপুরে রহিল না। ভানু নামে একটি কুড়ি বাইশ বছরের যুবকের সঙ্গে পলাইয়া ফিরিঙ্গিমারা বাগানে চলিয়া গেল। ফিরিঙ্গিমারা বাগিচায় যাইবার অল্পকালমধ্যেই সে সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের খানসামাটা ফুলমণিকে সর্ব্বদাই নানা কথা বলিয়া ফুসলাইতে চেষ্টা করিত। চা-ঘরে, কল-ঘরে, পথে-ঘাটে সুযোগ পাইলেই কাছে আসিয়া চুপি চুপি কি সব প্রস্তাব করিত। এমনই করিয়া কিছুদিন গেল। ফুলমণি রাজি হয় না। সাহেব একদিন নিজে আসিয়া চা-ঘর হইতে ফুলমণিকে ডাকিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেল এবং অনেক বুঝাইয়া কিছুতেই যখন তাহার কুপ্রস্তাবে রাজি করিতে পারিল না, তখন পকেট হইতে রিভল্‌ভার বাহির করিয়া ভয় দেখাইল।

ফুলমণি সেদিন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া বাঁচে। অবস্থাটা সবিস্তারেই সে ভানুকে বলে।

এই সব কারণে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষভাব ক্রমেই বাড়িতেছিল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ফুলমণি জ্বালানি-কাঠের একটা বোঝা মাথায় লইয়া তাহাদের কুঁড়েঘরে ফিরিতেছে। পথটা একস্থানে মোড় ফিরিয়াছে; সেই মোড় হইতে আর একটা পথ সোজা সাহেবের বাংলোয় চলিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা উঁচু টিলা রাস্তাটাকে এমনই

আড়াল করিয়া রহিয়াছে যে, এক দিক হইতে অন্য দিকে কিছুই দেখিবার জো নাই।

ফুলমণি সেই মোড়ের মাথায় আসিবামাত্র সাহেবটা মদের নেশায় টলিতে টলিতে আসিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, কিধার যাতা হ্যায়, ফুলি? চল মেরে কুঠিমে?

ফুলমণির মাথা হইতে কাঠের বোঝাটা পড়িয়া গেল। ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই সময় কয়েকটা কুলি-যুবক কোদালি করিয়া বাগান হইতে লাইনে ফিরিতেছিল। হঠাৎ নারীকণ্ঠের চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, উন্মত্ত সাহেবটা ফুলমণিকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, আর ফুলমণি নিজেকে সাহেবের বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত করিতে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করিতেছে। সাহেবটা তখন প্রায় অজ্ঞান।

যুবকদের মধ্যে একটি—ফুলমণির স্বামী ভানু। ফুলমণিকে এইরূপে সাহেবের কবলিত দেখিয়া সে প্রথমে ফুলমণির হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল।

সাহেব তখন ভানুর নাকের উপর এক ঘুষি লাগাইল। মাথা ঘুরিয়া ভানু মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একসঙ্গে দুইটা কোদালি গিয়া ম্যানেজার সাহেবের মাথায় আঘাত করিল। সে আঘাত সাহেব সহ্য করিতে পারিল না, এক বিকট চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কুলিদের কাহিনী শেষ হইলে দীপক ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে ব্রীজমোহন, ভানু এবং অন্য দুইটি কুলি-যুবককে ঘরের ভিতরে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি কি সব পরামর্শ দিয়া বিদায় করিল।

বিরিঞ্চি বলিল, লক্ষ্য করেছিস কি, দীপক?

কি?

ফিরিঙ্গিমারার কুলিগুলো যেন একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। মনে হয়, সাহেবটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললেও যেন তাদের গায়ের ঝাল মিটত না। হ্যাঁ রে, এ ফিরিঙ্গিমারা নামটা কি আগে থেকেই আছে?

দীপক বলিল, হ্যাঁ, বহুদিন আগে এ বাগানে আরও একটা সাহেব খুন হয়। তখন থেকেই কুলিরা এ বাগানকে ফিরিঙ্গিমারা ব'লে ডাকত। এখনও সেই নামই প্রচলিত।

২৪

পরদিন।

রাত পোহাইল। দিনের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ফিরিঙ্গিমারায় কুলিদের কাজে যাইবার ঘণ্টা কিন্তু আজ আর বাজিল না। ১নং ২নং ৩নং—সকল লাইনের কুলিরাই ঘণ্টা না বাজার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। কাল সারারাতই প্রায় খুনের আলোচনাই হইয়াছে। যাহারা সমস্ত খবর রাখে না, তাহারা বলিল, কাল রাত্রে ম্যানেজারকে কে খুন করিয়া গিয়াছে। তারপর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব অনেক জল্পনা-কল্পনাই করিতে লাগিল।

ম্যানেজার খুন। ইহা তো সহজে যাইবে না। ভয়ে কুলিদের মধ্যে একটা অসহায় চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিয়াছে। পুলিসের উৎপীড়নের ভয়ে মেয়ে পুরুষ সকলেই উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। তাহারা আস্তে কথা কয়, পথ চলিতে ভয় পায়। পুলিসে কখন হানা

দিবে, সকলের মনে এই একই আতঙ্ক। কারণ, অকারণেও অনেক সময় তাহারা পুলিসের দেখা পায়। যে কোন অজুহাতে শহর হইতে পুলিসের বড় সাহেব সদলবলে সঙ্গিনধারী সৈন্য লইয়া বাগানে আসিয়া মাঝে মাঝে টহল দিয়া যান। উদ্দেশ্য, কুলিদের প্রাণে আতঙ্ক জাগাইয়া রাখা। আজ তো স্বয়ং ম্যানেজার খুন—সাদা চামড়া—পুলিস তো আসিল বলিয়া।

বারোটা বাজিল। সূর্য্য তখন মধ্য-আকাশে উঠিয়া আপন তেজে ধরণীবক্ষ পুড়াইয়া ফেলিতেছে। পুলিসের বড় সাহেব সত্যই সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন সাহেব মরিয়াছে; কারণ অজ্ঞাত এবং অনিশ্চয়তায় ঘেরা। রাজার জাত, তদন্তও হইল রাজকীয়। কিন্তু সচরাচর এই রকম তদন্তের যেরূপ ফল হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও হইল তাহাই। অর্থাৎ পুলিসের লোকেরা মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাইল না। কিন্তু একটা কিছু সন্তোষজনক জবাব না দিলে শিলং-শৈলের বড় কর্ত্তাদের এবং সুরমা ভ্যালি টি প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সন্দেহ মিটে না। কাজেই ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন লাঠিধারী কন্‌স্টেব্‌ল এবং খাকি পোষাক-পরিহিত পুলিসের বড় কর্ম্মচারীদের আনাগোনার পর ভানু এবং আরও দুই তিনটি যুবকের হাতে হাতকড়া পড়িল। লোকনের কোন খোঁজ হইল না।

কিছুদিন পর বিচারে ভানুর এবং অন্য একটি নির্দ্দোষ যুবকের যাবজ্জীবন দীপান্তরের হুকুম হইল।

২৫

ভান্থর জেল হইল। ফুলমণিরও আর ফিরিঙ্গিমারায় থাকা পোষাইল না। সে কল্যাণপুরে ফিরিয়া আসিল, এবং যখন আবার বদলুর ঘরণীরূপে বাস করিতে লাগিল, তখন কুলিমহলে যেমন ইহা লইয়া কোন আলোচনা হইল না, তেমনই ফুলমণিও ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু মনে করিল না। বদলুর কিন্তু আনন্দ ধরে না। সে কি খুশিই না হইয়াছে! এমনই অপ্রত্যাশিতভাবে এত সহজে যে তাহার ফুলমণিকে ফিরিয়া পাইবে, ভাবে নাই। কল্যাণপুরে ফিরিয়া আসা অবধি সর্ব্বদাই সে মনিয়াকে এই লইয়া বিরক্ত করিত। বলিত, কই মনিয়া, তুই না বলেছিলি ফুলমণিকে এনে দিবি? কিন্তু অনেকদিন তো কেটে গেল, ফুলমণি যে আসে না!

ফুলমণিও যে বদলুকে অপছন্দ করিত, এমন নহে, বরং তাহাকে তাহার ভালই লাগিত। কিন্তু তাহাকে একা ফেলিয়া রাত্রির অন্ধকারে যেদিন বদলু তাহার বাহু হইতে তাবিজখানা খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল, সেদিন হইতে বদলুর প্রতি তাহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারায়। তারপর ভান্থর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকেই পুনরায় বিবাহ করিয়া সে ফিরিঙ্গিমারায় চলিয়া গেল। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার সে বদলুর ঘরেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

আজ সন্ধ্যারাত্রেই বদলু তাহার সেই পুঁটলিটি খুলিল।

ফুলমণি বলিল, এটা কি?

বদলু বুকভরা তৃপ্তি লইয়া এমনই এক সজল দৃষ্টিতে ফুলমণির দিকে তাকাইল যে, ফুলমণি সেই দৃষ্টির সম্মুখে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল।

বদলু যখন পুঁটলি হইতে তাবিজটা লইয়া ফুলমণির হাতে দিল, তখন অশ্রুতে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

কেরোসিনের স্তিমিত আলোকে তাহার সেই পুরাতন গহনাখানাই দেখিয়া ফুলমণি বিস্ময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে কথা নাই; শুধু তৃষিত নেত্রে বদলুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিল। বদলু তাহার প্রাণাধিক প্রিয়ার চুলের মাঝে আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিল, ফুলমণি, আমি আর তাড়ি খাই না, ছুঁইও না।

কথাটা ফুলমণি বিশ্বাস করিল। কারণ সে জানিত, কল্যাণপুর বাগানে মদ বা তাড়ি আর কেহ খায় না, স্পর্শও করে না। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, তুই অমন ক'রে আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছিলি কেন?

বদলুর মুখে কোন উত্তর যোগাইল না।

এমন সময় বাহিরের দরজায় ধাক্কা মারিয়া কে ডাকিল, বদলু, ঘরে আছিস?

কণ্ঠস্বর অতি পরিচিত. বদলু বুঝিল, নূতন বাবু ডাকিতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অর্গলবদ্ধ দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, আমাক ডাকছেন, বাবু?

হ্যাঁ। মনে আছে, আমার সঙ্গে কাল সকালে শহরে যেতে হবে?

বদলু সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিল। বলিল, সত্যি বাবু, আমার খেয়াল ছিল না। এই আমি আসছি, আপনি চলুন। তাড়াতাড়ি তাহার লাঠিটা হাতে করিয়া সে বিরিঞ্চির অনুসরণ করিল। আজ রাত্রেই তাহাকে মালপত্র সব গুছাইয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে, কাল ভোরেই বাগানের লরিতে করিয়া শহরের বাসায় চলিয়া যাইতে হইবে।

২৬

আপনি ফিরলেন কখন ?

অনেকক্ষণ।

হাতমুখ ধোওয়া হয়েছে আপনার ?

হ্যাঁ, হয়েছে।

খেতে আসুন তা হ'লে।

ছায়ার আহ্বানে বিরিঞ্চি বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজে এলেন কেন ? বদলু কোথায় ?

আছে ওদিকে ব'সে।

বিরিঞ্চি আর কোন প্রশ্ন করিল না। এক সপ্তাহ হইল সে শিলচর শহরে আছে ; ছায়া এবং দীপকের মা আসিয়াছেন কাল। বিরিঞ্চি হাতের বইখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শিয়রের দিকে টেবিলের উপরে ইলেক্‌ট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া সে একখানা ইংরেজী নভেল পড়িতেছিল। বলিল, আপনার খাওয়া হয়েছে ?

না।

না কেন ? আপনার তো তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যেস ?

অভ্যেস তো আমার আরও অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু আজ আর কোন্‌টাই বা আছে ?

বিরিঞ্চি ঈষৎ হাসিল, বলিল, মার খাওয়ার কি হ'ল ?

তাঁর আজ একাদশী ; রাত্রে কিছু খাবেন না। তিনি শুয়ে পড়েছেন।

এমনই কথা বলিতে বলিতে বিরিঞ্চি এবং ছায়া আসিয়া পাকশালায়

পৌঁছিল। বদলু রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া ঝিমাইতেছিল। পায়ের শব্দে চেতনা পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া বিরিঞ্চি দেখিল, রাঁধুনি-বামুন নাই। কোমরে আঁচল গুঁজিয়া ছায়া নিজেই গিয়া ভাত বাড়িতে লাগিল।

বিরিঞ্চি কহিল, আপনি ভাত বাড়ছেন যে? ঠাকুর কই?

এসে দেখি, নেই।

নেই মানে?

কি ক'রে বলব? হয়তো পালিয়েছে।

তুই কিছু জানিস বদলু?

না, বাবুজি।

সে তবে গেল কোথায়?

ছায়া বলিল, সেই যে দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছে, আর ফেরে নি।

আর বোধ হয় ফিরবে না?

সম্ভব তাই।

তা রান্না করলে কে?

ছায়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কেন? আমি।

আপনি?—বিরিঞ্চি জোরে হাসিয়া উঠিল।

ছায়ার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়? ভাবছেন বুঝি, আমি রাঁধতে জানি না?

আমার কিন্তু তাই ধারণা ছিল।

সে আপনার ভুল। কিন্তু এখন খেতে বসুন, ভাত ঠাণ্ডা হচ্ছে।

বিরিঞ্চি দেখিল, মেঝেতে একখানা বড় পিঁড়ির সম্মুখে একটি গেলাসের উপরে একখানা ছোট থালা উপুড় করিয়া ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। পিঁড়ির সামনের স্থানটিও মুছিয়া পরিষ্কার করা। সে

পিঁড়িতে বসিলে ছায়া ভাতসুদ্ধ থালাটি আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল ; কিন্তু রাখিতে গিয়া তাহার মাথাটা হঠাৎ বিরিঞ্চির মাথায় ঠুকিয়া গেল। ছায়া লজ্জা পাইল। বিরিঞ্চি অপ্রস্তুতভাবে বলিল, লাগল নাকি আপনার ?

লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ছায়া বলিল, না না, মোটেই লাগে নি।

বিরিঞ্চি তখন দুই এক গ্রাস মুখে তুলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিল, বাঃ, বেশ রেঁধেছেন আপনি! আগেই বাঁধতে জানতেন তা হ'লে ?

ছায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মেয়েমানুষের রাঁধতে জানাটা কিছু আর অস্বাভাবিক নয়। আমরা তো আর পুরুষমানুষ নই যে, মেয়েরা সব গুছিয়ে রাখবে, আর তার আরামটুকু ব'সে ব'সে ভোগ করব !

পুরুষেরা ঠিক ইচ্ছে ক'রে মেয়েদের কাছ থেকে ঐ আরামটুকু নেয় না মিস দত্ত, মেয়েরা যেচেই পুরুষদের দেয় ; নইলে নিজেরাও আনন্দ পায় না যে।

এ কিছু সত্যি নয়, মিস্টার রায়। আমরা হেঁশেলে হাঁড়ি ঠেলব আর আপনারা তৈরি ভাত খেয়ে শুধু নাম কিনে বেড়াবেন, সে আমাদের সহ্য না হওয়ারই কথা। তাই কেবল এই নিয়েই জীবন কাটাতে অনেকে পছন্দ করে না।

আপনিও না, না ?

ছায়া বলিল, আমার কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু ঘরকন্নার কাজকেই বা আপনি ছোট কাজ ব'লে মনে করছেন কেন ?

বিরিঞ্চি বলিল, ছোট কাজ মোটেই মনে করছি না, তবে এটাই মেয়েদের একমাত্র কাজ, এও ভাবতে পারছি না যেন।

তাই বুঝি আজকাল মেয়েদের রান্নাবান্নাতে না দিয়ে বাইরের দিকে

আপনারা টানছেন বেশি ? মেয়েদের বাইরে বার করবার ঝোঁকটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই কিন্তু বেশি।

এ হ'ল তর্কের কথা। কিন্তু এ কথা মানতে আমি বাধ্য যে, মেয়েদের মাঝে মাঝে অন্তত রান্না করা উচিত। এই দেখুন না, আজ আপনি না রাঁধলে উপোষ দিতে হ'ত। কি বলেন ? আচ্ছা মিস দত্ত, মনে করুন, আপনার মত যাঁরা শিক্ষিতা, বি. এ. এম. এ. পাস করেছেন, তাঁরা সবাই কি রান্নাবান্না শেখেন কিম্বা শেখবার সুযোগ পান ?

নিশ্চয় পান। নইলে আমিই বা শিখলুম কি ক'রে ? আর এও তো শিক্ষারই একটা অঙ্গ, মিস্টার রায়—একটা আর্ট।

আর্ট বটে। তবে আমার ধারণা, মেয়েদের লেখাপড়ার ঝোঁকটা যতই বেড়ে ওঠে, ঘর-গৃহস্থালীর আকর্ষণটুকুও ততই ক'মে আসে।

তা একটু আসতে পারে। কিন্তু উপায়ই বা কি ? একই সঙ্গে তো দুদিকে তাল রাখা চলে না। ভাত আরও চারটি নিন। মাছের ঝোল রয়েছে, একটু দুধও নেবেন শেষে।

বিরিঞ্চি বলিল, আবার মাছের ঝোল ! অনেক রেঁধেছেন দেখছি। কেন বলুন দেখি, এই শীতের রাত্রে আমার জন্যে এত কষ্ট করতে গেলেন ? একটা ভাতে-ভাত বদলু নামিয়ে রাখলেই পারত।

শুধু যে আপনার জন্যেই রেঁধেছি, তাই বা মনে করছেন কেন ? বদলু আর আমারও তো খাওয়ার প্রয়োজন আছে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি মিস দত্ত, মন যাদের শিক্ষার উচ্চস্তরে উঠে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে, তারা মুহূর্ত্তের জন্যেও হেঁশেলে হাঁড়ি ঠেলতে পারে কি ক'রে ? আর চায়ই বা কি ক'রে ?

এ কিন্তু আপনার মেয়েদের ওপর অবিচার। মেয়েরা মুক্তি চায় বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যের বাঁধনকে এড়িয়ে নয়। ঘর গোছানো আর

ছেলে মানুষ করাটাকেই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং লক্ষ্য ব'লে হয়তো অনেকেই মেনে নিতে রাজি নয়। কিন্তু তা ব'লে ঘরের প্রতি তাদের কোন বিরক্তি নেই, স্বাভাবিক আসক্তিই আছে। তবে একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে আমারও মনে জাগে, আজকাল পুরুষের সমান অধিকার দাবি করতে গিয়ে মেয়েরা ঠিক কি চায়? যারা বলে, চাই পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্তি, তারাও হয়তো কথাটার ঠিক অর্থ বোঝে না। কেন না, নারী-পুরুষের পরস্পবের অধিকার একে অন্যটি পেতে পারে না। তা ছাড়া নারী-পুরুষের সত্যিকার সম্বন্ধের মধ্যে পরাধীনতার কোন রকম স্থান আছে কি না, ঠিক বুঝি না। আমি মনে করি, মানুষমাত্রেরই নিজস্ব এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে, সেখান থেকেই সে সমাজের সত্যিকারের সেবা করতে পারে। আর তেমনই থাকা উচিতও বটে।

কথাটা ঠিক বুঝলাম না, মিস দত্ত।

মনে করুন, দেশের সেবা। দেশ তো একটা নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়েই দেশ। সত্যিকার সেবার ভাব নিয়ে যদি দেশের কোন ব্যক্তিবিশেষের সেবাযত্নও করা যায়, তবে তা দেশসেবাই হবে। তা ছাড়া, একটা পরিবার গ'ড়ে তোলা, আত্মীয়-স্বজনের সেবাযত্ন এবং সন্তান-পালনই যে দেশসেবার কত বড় একটা অঙ্গ, তা আজকাল পুরুষেরাও বুঝতে চায় না। ভাবে, বাইরের কোলাহল-কলরবের ভেতরেই রয়েছে দেশসেবার একমাত্র ক্ষেত্র। নইলে দেশের জন্যে ভবিষ্যতের মানুষ তৈরি করবার ভার যাদের ওপর ন্যস্ত, তাদের সে দায়িত্ব যে কত বড়, কত বড় যে তার সম্মান, তারা তা বোঝে না; এবং বোঝে না ব'লেই নীড় বেঁধে থাকাটাকে তারা ছোট মনে করে।

এসব কিছুই অস্বীকার আমি করছি না; কিন্তু তাই ব'লে কেবল নীড় বাঁধাটাকেই নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে মেনে নিতেও পারছি না, মিস দত্ত।

ঐখানেই তো আমাদের ভুল, মিস্টার রায। বাইরের কোলাহলের একটা মাদকতা আছে। মনে আছে, আপনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন, কলকাতার সেই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে আপনি কেন এই আসামের জঙ্গলে এসেছেন? আপনি চেয়েছিলেন, ঐ কোলাহল থেকে দূরে স'রে এসে নীরব কর্ম্মের ভেতর দিয়ে সত্যিকার দেশের সেবা করতে। এই কুলিমজুরদের নিয়ে আছেন ব'লে সত্যিকার দেশসেবা করছেন না, এমন আপনি ভাবতে পারেন? তাই বলছিলাম, আমাদের দেশের মেয়েরা পাশ্চাত্যের ভাবের মোহে মস্তবড় ভুল ক'রে বসছেন। ইউরোপে তো অনেক দেশই দেখে এসেছেন, কিন্তু নারীর মুক্তি ব'লে যে একটা কথা শুনি, সে কেবল ঐ কথামাত্রই নয় কি? ওদেশেও সত্যিকার নীড় যারা বাঁধতে চায়, তারা ওসব মুক্তির বুলি আওড়ায় না, নিজেদের একটা নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে বেঁধে রাখতে চায়। আর এ বাঁধনের আকর্ষণ যেখানে নেই—

ছায়া কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। বিরিঞ্চির থালাতে ভাত নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি একখানা রেকাবিতে চারটি ভাত আনিয়া তাহার পাতে ঢালিয়া দিতেই বিরিঞ্চি বলিয়া উঠিল, ইস, কত ভাত দিলেন! এত তো খেয়ে উঠতে পারব না, নষ্ট হবে।

সেকি কথা! মাছের ঝোল রয়েছে, দুধও আছে। কথায় কথায়ই আপনার পেট ভ'রে গেল নাকি?

বিরিঞ্চি হাসিল, বলিল, সত্যি, আজকের মত খাই নি বহুদিন।

সত্য সত্যই তাই। একে সারাটা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনি, তাহাতে

ছায়া রান্নাও করিয়াছে ভাল। বিরিঞ্চি কহিল, বাগান ছেড়ে এসেও মেয়েদের হাতের রান্না খেতে পাব, ভাবি নি মিস দত্ত; ঠাকুরটা এ কটা দিন কি রান্নাই যে রেঁধেছে, তা আজই ভাল বুঝছি। কিন্তু রোজই কি আর আপনি এমন পেরে উঠবেন? আর আমার জন্যে কত রাতই বা ব'সে থাকবেন? কাল বদলুকে পাঠিয়ে একটা ঠাকুর ঠিক করব। তা ছাড়া ঠিক হাঁড়ি ঠেলতে আপনারা এখানে আসেনও নি। আপনি যদি এসবেই ব্যস্ত থাকবেন, আপনাদের কাজ করবেন কখন? খাওয়ার জন্যে অত সময় আপনার নষ্ট করা চলবে না, মিস দত্ত। মা আর আপনি দুজনেই কাল একটি বার বেরুবেন কিন্তু।

সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি সব ঠিক ক'রে নোব. কিন্তু রোজই কি আপনার ফিরতে এত রাত হয়?

তা হয়।

কেন, শহরের বাইরে কোথাও যান নাকি?

শহরের বাইরেই আমি থাকি।

কোথায় যান আপনি, জিজ্ঞেস করতে পারি?

স্বচ্ছন্দে। আমি রাত্রির অন্ধকারে বাগানে বাগানে কুলিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। কোন বাগানে কুলিদের অবস্থা কি, তার একটা রিপোর্ট তৈরি করছি।

আপনি কি একাই যান?

ঠিক একা নয়। কয়েকটা কুলি-ছোকরাও আমার সঙ্গে থাকে।

কিন্তু দিনের বেলা আপনি যান না কেন? রাত্রিতে বাগানের ম্যানেজারেরা যদি টের পায়?

টের পেয়েছে ব'লেই রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে যেতে হয়।

কথাটা শুনিয়া কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছায়ার বুক কাঁপিয়া

উঠিল। বলিল, তা হ'লে রাত্রিতে যাওয়া আপনার কিন্তু উচিত নয়। আচ্ছা, আপনার নিজের কি রাত্রে না গেলেই নয়?

না, না গেলে চলে না। দিনের বেলা যদি ওরা আবার দেখে যে, আমি কুলি-লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কুলিদের সঙ্গে কথা কইছি, আমায় খুন ক'রে ফেলবে।

কিন্তু কই, এমন তো কোন আইন নেই যে, বাইরের কেউ কুলিদের সঙ্গে মিশতে পারবে না, বা তাদের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে পারবে না।

আইন একেবারে নেই, এমন নয়। তা ছাড়া আইন তো অনেক কিছুই নেই, যা তারা নির্ভয়ে ক'রে যাচ্ছে। তাদের আইনই বা দেখাবে কে, আর বাধাই বা দেবে কারা? ওরা তো এক একটি ছোটখাটো হিট্‌লার বিশেষ। আসামকে কি আর শুধু শুধু বলে চা-করের রাজ্য!

কিন্তু এমনই রাত্রির অন্ধকারে যাওয়ায় তো নিশ্চিত ভয়ের কারণ রয়েছে, মিস্টার রায়।

বিরিঞ্চি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, উপায় কি বলুন?

কেন, কুলি-ছোকরাদের পাঠিয়ে কি কাজ হয় না?

বিরিঞ্চি আবার হাসিল, বলিল, না। তা ছাড়া তাদের জীবনেরও কি ভয় নেই, মিস দত্ত?

ছায়া লজ্জা পাইল, কহিল, আমি সে কথা বলি নি, মিস্টার রায়। তবে এ কথাও কিছু মিথ্যে নয় যে, জীবনের মূল্য দুজনেরই ঠিক সমান নয়।

সে হয়তো আপনার কাছে। কিন্তু কুলিদের আত্মীয়েরা হয়তো এই কথাটাকেই ঠিক অন্য দিক দিয়ে দেখবে, কি বলেন?

বিরিঞ্চির এই যুক্তিটা যত অকাট্যই হউক না কেন, ছায়ার ভাল

লাগিল না। বলিল, তর্কের যুক্তিতে সব সময়ে সব কিছুকে বিচার করা চলে না, মিস্টার রায়।

বিরিঞ্চি দুধটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া গেলাস হইতে খানিকটা জল ঢক ঢক করিয়া খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আজ কথায় কথায় অনেক খাওয়া হয়ে গেছে।

বিরিঞ্চিকে আহার করাইয়া ছায়া নিজের এবং বদলুর ভাত বাড়িয়া লইল।

আহারাদি সারিয়া ছায়া যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, পায়ের শব্দে মায়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মা বলিলেন, কে, ছায়া? খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, এই মাত্র খেয়ে এলাম।

বেশ, এখন শুয়ে পড। সারাটা দিনই খাটুনি গেছে তোমার।

ছায়া তখন বাতির সুইচটা টিপিয়া দিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

ছায়া বলিয়াছে, মেয়েরা পুরুষদের আহার করাইয়া একটা তৃপ্তি পায়। সে দাদু বৃদ্ধ রামলোচনবাবুকে কখনও কখনও রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছে বটে, কিন্তু আজ ছায়া এমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব তৃপ্তির আস্বাদন পাইয়াছে, যাহা জীবনে আর কখনও সে পায় নাই। শুইয়া শুইয়া সে ঐ অদ্ভুতকর্ম্মী যুবকটির কথাই ভাবিতে লাগিল। কি এক অনাবিল শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত দেহমন বিরিঞ্চির কাছে নিবেদন করিয়া দিতে উদ্যত হইল। কতদিন কতবার এই যুবকটির কথা সে ভাবিয়াছে, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দাদুর কাছে কতই না শুনিয়াছে; কিন্তু কই, আজিকার মত এমন তৃষিত আকুলতা তো তাহার হৃদয়ে জাগে নাই? ছায়া নারী, কিন্তু সে শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। সংযমশিক্ষা সে ভাল করিয়াই করিয়াছে, কিন্তু আজ বিরিঞ্চির চিন্তা তাহাকে যেন নেশার মত পাইয়া বসিল। অনাহারে অনিদ্রায় নিশিদিন কাটাইয়া, শীতাতপ

তুচ্ছ করিয়া, জীবনের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সে অবিশ্রান্ত খাটিয়া চলিয়াছে কাহার জন্য ? কোন্ সুখের কল্পনায় ? কিসের আকর্ষণে সে আসামের জঙ্গলে রাত্রিতে ঘুরিয়া মরিতেছে ? একটা নিছক কাল্পনিক আদর্শের মোহে নয় কি ?

আহারান্তে একটা আরাম-কেদারায় বসিয়া বিরিঞ্চি রোজই দৈনিক 'অমৃতবাজার'খানা দেখিত, আজও দেখিতেছিল। কিন্তু পড়াতে আজ সে মন দিতে পারিল না। সে ভাবিতেছিল, ছায়ার হয়তো আজ খুবই কষ্ট হইয়াছে। তাহার জন্য এই শীতে এত রাত্রি অবধি না খাইয়া জাগিয়া থাকিবার ছায়ার প্রয়োজন কি ? এ দেশের মেয়েদের এই এক দুর্ব্বলতা ! কিন্তু তাহার নিজের কি ছায়াকে এমনই কষ্ট দেওয়া উচিত হইয়াছে ? না, কাল সে নিজেই একটা রাঁধুনি-বামুন ঠিক করিয়া আনিবে, না হয় সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু কাল সকালেই বহুদূরে একটা বাগানে যাওয়া তাহার নিতান্তই প্রয়োজন, নহিলে গত কয়দিনের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইয়া যাইবে। খাওয়ার জন্য অত ভাবনার তাহার সময় কোথায় ? আর ছায়া তো নিজেই বলিয়াছে, রান্নাবান্নার জন্য তাহাকে ভাবিতে হইবে না। সে তো নিজে কিছু অনুরোধ ছায়াকে করে নাই। এমনই সব দ্বিধা ও সঙ্কোচের মধ্যে পড়িয়া বিরিঞ্চির আর কাগজ পড়া হইল না। পত্রিকাখানা চেয়ারে ফেলিয়া সে শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। ক্লান্তদেহে ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না। যখন জাগিল, চারিদিকে রোদ উঠিয়াছে বেশ। এখনই তাহাকে কাজে বাহির হইতে হইবে।

২৭

সমস্ত চা-বাগান তখন গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। কদাচিৎ দুই একটা কুলি-বস্তিতে এক আধটা বাতি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। কর্ম্মক্লান্ত কুলিদের মাদলের শব্দ এবং সঙ্গীতালাপও তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা বস্তিই সে ইতিমধ্যে ঘুরিয়া আসিয়াছে, আরও দুইটা বস্তিতে আজ যাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, নহিলে আর সময় হইবে না, হয়তো সর্দ্দারেরাও বসিয়া আছে।

বিরিঞ্চি এবং অন্য দুইটি কুলি-যুবক—হাবা ও বদলু, এই তিন জনে অতি সন্তর্পণে বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত চাগাছের সারি। সবুজ পাতা রাত্রির অন্ধকারে মিশিয়া চারিদিক আরও কালো করিয়া তুলিয়াছে।

দূর হইতে একটা মোটর-গাড়ির আলো দেখা গেল। হাবা চুপি চুপি বলিল, বাবু, ঐ গাড়িটা যেন এ বাগানেই আসছে।

বিরিঞ্চি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। ক্রমশই গাড়ির শব্দ স্পষ্টতর হইতেছে। গাড়িটা হঠাৎ একটা মোড় ফিরিতেই বিচ্ছুরিত আলোকধারা সারাটা বাগানের গায়ে যেন হাত বুলাইয়া গেল।

বিরিঞ্চি ব্যস্তভাবে বলিল, লুকো, শিগগির বেড়া ডিঙিয়ে চাগাছের ফাঁকে লুকিয়ে পড়।

তখনই তাহারা পথের পাশে তারের বেড়া ডিঙাইয়া চাগাছের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল।

সোঁ করিয়া মোটরখানা তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ম্যানেজার এইমাত্র শিলচর ক্লাব হইতে বাগানে ফিরিতেছে।

বাগানটা আবার তেমনই সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল। বিরিঞ্চিরা পথে নামিয়া আসিল। হাবা হঠাৎ সেইখানেই দাঁড়াইয়া গেল।

বিরিঞ্চি বলিল, কি রে, দাঁড়ালি যে?

না বাবু, একটা জোঁকে কেটেছে।

বিরিঞ্চিরাও তখন দেহের অনাবৃত অংশে অন্ধকারেই হাত বুলাইয়া লইল, বিশেষ করিয়া হাঁটুর নীচে হইতে পা পর্যন্ত।

তাহারা আরও একটু পথ চলিয়া একটা চৌমুহনিতে আসিতেই একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়াল হইতে দুইটা লোক বাহির হইয়া আসিল। একজন বদলুর একটা হাত চাপিয়া ধরিল, অপরটি ধরিল বিরিঞ্চিকে; এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, এই, তোমলোগ রাতকো এইসা বাগানমে ঘুমতা হ্যায় কেঁও? আওর দুরোজ তোমলোগোনকো দেখা, লেকিন পাকড়নে নেই শেকা। শালালোগ, এইসা চোরকা মাফিক ঘুমতা হ্যায়?—বলিয়া একজন বদলুর গালে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিল।

আর কথা নাই। এক টানে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বিরিঞ্চি সেই জোয়ান কুলিটার বগে এমনই ভীষণ একটা ঘুষি মারিল যে, কুলিটা 'শালা হামকো মার দিয়া' বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া অন্য কুলিটা ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। 'বাগিচামে চোর ঢুকা হ্যায়' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে লোকটা ছুটিয়াছিল।

তখন বিরিঞ্চিরাও বাধ্য হইয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

বিরিঞ্চি বলিল, শিগগির চল, পালাই। ম্যানেজার বেটা খবর পেলেই মোটর নিয়ে আসবে। তখন ধরতে পারলে মাটিতে আস্ত পুঁতে ফেলবে কিন্তু।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহারা ছুটিতে লাগিল। বাগানের এক

প্রান্তে আসিয়া পৌছিলেও, তখনও তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে আসিতে পারে নাই। কিন্তু আর যেন পারে না, পা আর কিছুতেই চলিতে চায় না। তাহারা একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়াইল। কিন্তু বনপথে চলিতে চলিতে শুকনা পাতার মর্ম্মরশব্দেও যেমন বন্য হরিণগুলি সচকিত হইয়া ছুটিয়া পলায়, হঠাৎ কি একটা শব্দ শুনিয়া তাহারাও তেমনই ছুটিতে লাগিল। বিরিঞ্চি বলিল, বেটারা দেখছি, আবার পিছু নিয়েছে।

কিন্তু আর ভয় নাই, তাহারা আসিয়া বড় রাস্তায় পড়িয়াছে।

অনুসরণকারীরা যখন দেখিতে পাইল, তাহাদের শিকার বড় রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে, তখন আর পশ্চাদ্ধাবন সমীচীন নয় ভাবিয়া ফিরিয়া গেল।

সেই কোলাহলে ইতিমধ্যে অনেকেরই ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল; ব্যাপার কি জানিবার জন্য কেহ কেহ লাঠি হাতে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ম্যানেজার সাহেবের কানেও এই হট্টগোলের খানিকটা পৌছিয়াছিল, কিন্তু তখনও তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া অবস্থাটা তেমনই রহিয়া গেল। আপাতত বাগানের পাহারাদারদের উপরেই কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিয়া তিনি শয্যা লইলেন।

২৮

বেলা দুইটায় দীপকের শহরে রওনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পারে নাই। 'ভারতীয় চা-বাগান শ্রমিক-সঙ্ঘে'র আসন্ন অধিবেশন সম্বন্ধে লেখাপড়ার যাহা কিছু কাজ, সবই তাহাকে করিতে হইতেছে কাজেই আর পারিয়া উঠে নাই। সোফার গাড়ি লইয়া অপেক্ষা

করিতেছে, আর দেরি করা চলে না। বিরিঞ্চির সঙ্গে কতকগুলি জরুরি বিষয়ের পরামর্শও নিতান্তই প্রয়োজন। কারণ কুলিদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেছে সে-ই। দীপক গরম জামা-কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া মোটরে উঠিতে যাইবে, এমন সময় উদ্দিপরা একটি কুলি আসিয়া দীপকের হাতে একখানা খাম দিল। সে দেখিয়াই বুঝিল, খামখানা আসিতেছে সাহেবদের ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সুরমা উপত্যকার শাখা-অফিস হইতে।

খামখানা ছিঁড়িয়া ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া পাঠ করিল। লেখা খুবই অল্প। চিঠিখানা পড়িয়া সে একবার শূন্যদৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের পানে তাকাইল, তারপর আবার খামে পুরিয়া কোটের পকেটে তাহা রাখিয়া দিল। সোফারকে স্টার্ট দিতে বলিয়া নিজেই গিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিল। সে নিজেই প্রায় গাড়ি চালায়, তবে সোফারটি সঙ্গে থাকে।

শীতের সন্ধ্যা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া উঠিতেছে। সেই জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়িখানা পথ করিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের কোলের ঠাণ্ডা বাতাস দীপককে যেন বিঁধিতে লাগিল। সম্মুখের কাচটার একটা টুকরা কবে ভাঙিয়া গিয়াছে।

দীপক যখন শহরে পৌছিল, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

দীপক আসিয়াই মার ঘরে প্রবেশ করিল। মা তখন লেপের নীচে জড়সড় হইয়া শুইয়া ছিলেন। পুত্রকে দেখিয়া লেপ ছাড়িয়া উঠিতে যাইবেন, দীপক বাধা দিয়া বলিল, তুমি আর এ শীতে উঠ না।—বলিয়া নিজেই লেপখানা আবার মার গায়ের উপরে ভাল করিয়া টানিয়া দিল।

মা বলিলেন, বউমাকে নিয়ে এলি না যে?

এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি, ঠাণ্ডা লেগে আবার বেড়ে যেতে পারে, তাই রাত্রে আর আনলুম না, সে কাল দিনের বেলা আসবে। যাব ঘর হইতে দীপক বাহির হইয়া গেল।

বদলু আসিয়া ছায়াকে সংবাদ দিল, বাবু এসেছেন।

ছায়া তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, বলিল, কোন্ বাবু রে? নতুন বাবু?

না দিদি, বড়বাবু বাগান থেকে এসেছেন।

ও, দীপকদা। আচ্ছা যা, আমি যাচ্ছি। ছায়া সকড়ি হাত ধুইয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীপকের আরও আগেই পৌঁছানোর কথা ছিল। ছায়া বলিল, এত দেরি হ'ল যে আপনার? বউদি কই?

আসে নি। ও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। কাল মোটর পাঠিয়ে দিনের বেলা আনানো যাবে। বিরিঞ্চি কই?

এখনও ফেরেন নি।

এখনও ফেরে নি মানে?

মিস্টার রায় তো রোজই খুব রাত ক'রে আসেন।

রোজই এত রাত্তির হয়?

তা হয়। সেদিন তো রাত্রি প্রায় বারোটায় ফিরলেন। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি ততক্ষণ ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে আসি। সে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দীপক কথাটা ঠিক বুঝিল না। ছায়া ফিরিয়া আসিলে বলিল, তুমি ভাত নামাতে গেলে কেন? ঠাকুর নেই?

না।

কদিন নেই?

আমি যেদিন এসেছি, তার পরদিন থেকেই নেই।

রান্না তা হ'লে তুমিই করছ?

হ্যাঁ।

যাক, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, নইলে বিরিঞ্চিকে নিশ্চয়ই উপোস দিতে হ'ত।

দীপকের কথায় ছায়ার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, সে কিছু মিথ্যে বলেন নি।

আচ্ছা, তোমাদের কাজের কতটুকু?

আমার ওপর যা ভার ছিল, সব হালকা ক'রে দিয়েছি। এখন মিস্টার রায় এলেই বাকি সব জানতে পারবেন।

রাত তখন এগারোটা বাজে। ছায়া এবং দীপক বসিয়া বিরিঞ্চির অপেক্ষা করিতেছিল। দরজায় খট খট করিয়া শব্দ হইল। বদলু দরজা খুলিতেই একটা কুলি আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বদলু ভাবিল, বাধা দেয়, কিন্তু কিছু করিবার সে অবসর পাইল না। হঠাৎ একটা কদাকার কুলি এই রাত্রে তাহার ততোধিক ময়লা এবং শতছিন্ন পরিধেয় লইয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে দীপক ও ছায়া উভয়েই কেমন ভীত এবং বিস্মিত হইল। কিন্তু এই ভয় ও বিস্ময় মুহূর্ত্তমধ্যে এক মহা হাস্যরোলে পরিণত হইল।

দীপক বলিল, আরে হতভাগা, তোর শেষে একি বেশ! ব্যাপার কি রে বিরিঞ্চি?

বিরিঞ্চি হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, কারণ ভিন্ন কি কার্য্য হয় রে?

কিন্তু সত্যি, কেন?

বলছি। আগে পোষাকটা বদলে নিই।—বলিয়া পাশেই তাহার ঘরে প্রবেশ করিল।

ছায়াও জানে, বিরিঞ্চি রাত্রিতে কুলিদের মধ্যে তাহাদের সমিতির কথা প্রচার করিয়া বেড়ায়, কিন্তু সে যে এই বেশে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিরিঞ্চি পুনরায় সেই ঘরে আসিয়া দৈনিক কাগজখানা টানিয়া লইয়া একখানা চেয়ারে চাপিয়া বসিল। বলিল, দিনে আর বাগানে যাবার জো নেই। সব বাগানের ম্যানেজারেরা হুকুম দিয়েছে, যদি কোন নতুন বাবু বা বাইরের অন্য কেউ বাগানে আসে, তবে তখুনি যেন তাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাত্রেও পাহারা বসিয়েছে। আজ ধ'রেই ফেলেছিল আর একটু হ'লে।

ছায়ার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। দীপকও ভীত হইয়া বলিল, বলিস কি ? কি হয়েছিল বল দেখি ?

বিরিঞ্চি তখন বাগানের ঘটনাটি বলিয়া গেল।

দীপক কেবল একবার 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিয়া গেল। একটু পরে পকেট হইতে সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া বিবিঞ্চিব হাতে দিল।

বিরিঞ্চি বলিল, ওটা কি ?

প'ড়েই দেখ না।

বিরিঞ্চি পড়িতে লাগিল। ইংরেজীতে লেখা চিঠিখানার বাংলা তর্জ্জমা করিলে এইরূপ হয়—

মহাশয়,

আপনি নিজে 'ভারতীয় চা-কর সমিতি'র সুরমা ভ্যালি শাখার অন্যতম সভ্য। অথচ আপনি নিজে উদ্যোগী হইয়া কুলিদের মধ্যে এমন কতকগুলি ভাবধারার প্রচার করিয়াছেন এবং করিতেছেন, যাহার ফলে কুলিদের মধ্যে ডিসিপ্লিন রাখা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। তদুপবি আমাদের বিশ্বাস এবং যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে যে, আপনার

কল্যাণপুর এবং তদধীনস্থ বাগান হইতে লোক আসিয়া সুরমা ভ্যালির প্রত্যেক চা-বাগানে কুলিদের মধ্যে গভীর বিদ্রোহের ভাব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। তাহা ছাড়া শুনিলাম, আপনি কুলিদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। আপনার এই কার্য্যের দ্বারা আসামের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের প্ল্যান্টার্সদের যে ক্ষতি করিতেছেন, তাহা কি নিজে একজন প্ল্যান্টার হইয়াও অনুভব করিতে পারিতেছেন না? আপনার কার্য্যের দ্বারা চা-বাগানের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই আশা করি, নিজে এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন এবং নিজেকে বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন।

ক্ষমা করিবেন। ইতি

ভবদীয়

সি. টি. গার্ডিনার,

সাধারণ সম্পাদক,

ভারতীয় চা-কর সমিতি,

সুরমা ভ্যালি শাখা, শিলচর।

বিরিঞ্চি চিঠিখানা বার দুই পড়িল। শেষে একটু হাসিয়া দীপককে বলিল, এ চিঠির অর্থ বুঝিস, দীপক?

তুই কি বুঝেছিস, বল না শুনি?

ছায়া বলিল, দেখি মিস্টার রায়, চিঠিখানা।

বিরিঞ্চি ছায়ার হাতে চিঠিখানা দিল। বলিল, আমার বিশ্বাস, এরা আমাদের লেবার কন্‌ফারেন্স করতে বাধা দেবে।

অতটা কি সাহস করবে?

করবে না কেন? মিলিটারি তো এখনও এদের হাত-ধরা।

আমি নিজে প্ল্যাণ্টার। অথচ আমিই এই কুলিদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছি, বাগানের সাহেবরা যে তা পছন্দ করবে না, জানি; কিন্তু আমাদের এই সভা করতেও ওরা বাধা দেবে, এ যেন ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না।

সে যাই হোক, তুমি কাগজপত্র সব মিস দত্তকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাও। কোন অবস্থায়ই প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি যেন অন্যের হাতে না পড়ে। যদি আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ওরা এখনই জেনে ফেলে, বড় বিপদের কথা হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দীপক, আমরা আজ যে দেড়শো যুবককে তৈরি করেছি, ওরা কিছুদিনের মধ্যেই দেড লক্ষে পরিণত হবে। কাজেই ওসব বাধাকে আমি আর বড় গ্রাহ্য করি না। তবে আরও কিছুদিন সময় পেলে ভাল হয়।

দুই বন্ধুতে তখন নানা পরামর্শ ও আলোচনা হইল। কন্‌ফারেন্সের দেরি আর মাত্র দুইটি দিন।

ছায়া চুপ করিয়া সব শুনিয়া গেল। ভবিষ্যতের জন্য বিরিঞ্চি যতই কেন নিশ্চিন্ত থাক না, ছায়ার কিন্তু গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া শেষে বলিল, চলুন দীপকদা, খাবার বোধ করি ঠাণ্ডাই হয়ে গেল। রাত তো কম হয় নি।

২৯

কর না একটা সাঙ্গা মনিয়া?

দূর পোড়ারমুখী, সাঙ্গা আবার কি রে? বিয়েই তো একবার করেছিলাম; ভাগ্যে যদি রইল না তো যাক।—বলিয়া মনিয়া খুব চাপিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ফুলমণি বলিল, একটা মন্দ না হয় ম'রেই গেছে ; তা ব'লে একটা সাঙ্গা করতে তো আর আমাদের বাধা নেই, আমরা তো আর বাবুদের বউ নই।

দূর, তাও কি হয় ?

কেন হবে না ? সুবল রোজ কতবার ক'রে আমার কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে, তুই তাকে বিয়ে করতে রাজি কি না।

মনিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, সুবলা আসে বুঝি ? তাই সেদিন হাসপাতালে একটা ওষুধ আনতে গিয়ে আমাকে দেখেই ফিক ক'রে হেসে ফেললে।

হাসলে বুঝি ? তোর কাছে একদিন নিয়ে আসব ?

দূর পাগলী, আমার কাছে নিয়ে আসবি কি রে ?

সুবল ছোড়াটা ভারী জোয়ান, আর ইস্কুলেও তো সবচেয়ে বেশি প'ড়েছে ওই। আমাদের বাবুও ওকে খুব পছন্দ করে, দেখিস নি ? ভুলুয়া-সর্দ্দারও তো ওকে খুব ভালবাসে।

ও কথা যাক, ফুলমণি। তোর বদলুর কথাই না হয় একটু বল। বদলু এখন খুব ভাল হয়ে গেছে, না রে ?

মানুষটা সত্যিই বদলে গেছে, মনিয়া।

তোকে বদলু খুব আদর করে, না ?

ফুলমণি লজ্জায় মুখ নীচু করিল। বলিল, এখন নতুন বাবু ডাকলে আর কোন কথা নেই, যেখানে যে ভাবে থাকে, ছুটে গিয়ে হাজির হয়।

নতুন বাবুটা একটা মানুষের মত মানুষ। আমাদের লাইনেই তো প'ড়ে থাকত। বাগানের কুলিদের যে সুন্দর ঘরবাড়ি, পথঘাট, কাপড়-চোপড়, রুজি-রোজগার, তার সবই তো ঐ বাবুর জন্যেই। নতুন বাবু

বললে আমাদের বাবু কিছুতেই আপত্তি করে না। কে, বাবা এসেছ ?—বলিয়া মনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

হ্যাঁ রে, এই আসছি।

ভুলুয়া আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল।

উঃ, আজ কতদিন তোমার কোন খবর পাই নি। তুমি কোন কোন্ বাগানে গিয়েছিলে ?

আমি সিলেট জেলার বাগান সব কটাই প্রায় ঘুরে এসেছি।

ঐ যে বাবু আসছেন।—বলিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দীপক তাহার বারান্দায় বসিয়াই দেখিয়াছিল, ভুলুয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। শ্রীহট্ট জেলার বাগানে কাজ কতটুকু কি হইয়াছে, জানিবার জন্য সে নিজেই আসিয়া তাহার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল, এই আসছিস বুঝি, ভুলু ?

হ্যাঁ, বাবু।

সব বাগানেই কাজ হ'ল ?

আমাদের লোক সব বাগানেই গিয়েছে। বড় বড় গুলোতে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। মনে হয়, কাজ খুব ভালই হবে।

লোকজন সভাতে যোগ দেবে ?

প্রত্যেক বাগান থেকে অন্তত দুটো সর্দ্দারও যাতে আসে, তার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি বাবু। আসবে, ঠিক আসবে।

দীপক মনে মনে আনন্দিত হইল। বলিল, আচ্ছা, আর সব খবর পরে শুনব। তুই এখন বিশ্রাম কর।—বলিয়া তাহার বাংলোর দিকে অগ্রসর হইল।

একটা লোক পিছন হইতে বলিল, বাবুজি, সেলাম।

দীপক ফিরিয়া দেখিল, একটি কুলি। প্রশ্ন করিল, কি চাই রে ?

কুচ নেই মাংতা, বাবুজি। লেকিন দুচারটো বাৎ পুছনেকো আয়া।

তুই কোন্ বাগান থেকে আসছিস?

ফিরিঙ্গিমাবা বাগানসে বাবুজি, হাম একটো সর্দ্দার হায়, উস বাগানকো সব কুলিলোগ মিলকে হামকো আপকো পাশ ভেজা।

কি জানতে চাস তোরা?

দু রোজ শহরমে কুলিলোগকা একটো সভা না হোগা?

হ্যাঁ, হবে তো।

উস সভামে যানেকা লিয়ে হামলোগ সব তৈয়ার হুয়া হায়। লেকিন বাগানকা নয়া ম্যানেজার যো আয়া, উ সবকিসিকো মানা কর দিয়া। বোলা কি, যো কুলি সভামে যায়েগা, উসকা এক হপ্তাকা তলব জরিমানা হো যায়েগা, আভি তো হামলোগ বহুৎ মুস্কিলমে পড় গয়া, বাবুজি।

দীপকের কপালে চিন্তারেখা দেখা দিল। কোন জবাব সে দিল না। কুলি-সর্দ্দারটিকে সঙ্গে করিয়া সে তাহার বাংলোতে গিয়া চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক পায়চারি করিতে লাগিল। কি উপায় হইবে? কোন কুলিই যদি না আসে, তবে তো সভার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সহসা দেখিল, একদল কুলি, সবারই মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি, তাহার বাংলোর দিকে আসিতেছে। দীপকের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, সত্য সত্যই বাগানের কর্ত্তারা নিজ নিজ বাগানে এই কুলি-কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন।

এতগুলি সর্দ্দারকে একসঙ্গে আসিতে দেখিয়া ভুলুয়াও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সর্দ্দারদের একে একে দীপকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সর্দ্দারেরা সেলামের পালা শেষ করিয়া দাঁড়াইলে দীপক প্রশ্ন করিল, তোমরা সব কি মনে ক'রে এসেছ? কিন্তু উত্তরে ঐ সমবেত সর্দ্দারদের নিকট হইতে যে সংবাদ পাইল, তাহা পূর্ব্ব-

সংবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। কি এক অপূর্ব্ব উৎসাহ, অদম্য উন্মাদনা এই কুলিদের মধ্যে জাগিয়াছে! অথচ সম্মুখে তাহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা। পারিবে কি এই নিঃসম্বল দুঃস্থ কপর্দ্দকহীন ক্রীতদাসের দল তাহাদের প্রভুদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিতে? দীপক বলিতে লাগিল, শোন সর্দ্দারের দল, তোমাদের ভালর জন্যেই আমি কুলি-সভার আয়োজন করেছি। বোধ করি তোমরা জানতে পেরেছ, এই সভাতে তোমাদের রুজি-রোজগার, খাওয়া-পরা, সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, সব কিছুরই আলোচনা হবে; তোমরাই তা করবে। তোমরা ভালই জান যে, তোমাদের হাজিরাই বল কিম্বা ঠিকে রোজই বল, বাগানের মালিকেরা বাড়িয়ে দিতে রাজি নয়। তা ছাড়া তোমরাও মদ খেয়ে যথেষ্ট টাকা ওড়াও। কাজেই কি ভাবে চললে তোমরা মানুষের ন্যায্য অধিকার পেতে পার, আর বাগানে তোমাদের অধিকারই বা কি, কোথায়ই বা তোমাদের স্থান, এসব কথাও ক্রমশ আলোচনা হবে। সেইজন্যে তোমাদের কাছে আমার কথা এই যে, তোমরা সকলে তোমাদের অধীনের সব কুলিদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে সভাতে যোগ দেবে। তারপর যদি তোমাদের ওপর কোন অত্যাচার হয়, আমি তার ব্যবস্থা করব।

কুলি-সর্দ্দারেরা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। রামদীন-সর্দ্দার বলিল, বাবুজি, ম্যানেজারলোগ এক হপ্তাকা রোজি কাট দেয় তো, হামলোগকা চলেগা ক্যাইসে?

দীপক ভাবিল, মস্ত বড় প্রশ্ন বটে। বলিল, তোমরা জান না সর্দ্দার, এ তোমাদের কেবলই ভয় দেখানো। বাগানের মালিকেরা ভালই জানে যে, সর্দ্দারদের অমতে একদিনও চা-বাগান চলতে পারে না। তোমরা সবাই মিলে যদি একজোটে এক কথায় কাজ করতে পার, বাগানের মালিকদের এমন ক্ষমতা নেই, তোমাদের সমবেত ইচ্ছের

বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আসল কথা, তোমরা সব একজোট হয়ে কাজ করতে পারবে কি না।

কুলি-সর্দ্দারেরা তখন কি সব পরামর্শে রত হইল। কেবলই ফিসফিস ফুসফুস শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। শেষে তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হুকুম কব দিয়ে বাবুজি, হামলোগ হুকুমকা নোকর হ্যায়। সভামে যানেকো তৈয়ার হো গয়া। যো কুছ হোগা, পিছে দেখা যায়েগা।

তোমরা সব সভাতে যাবে? বেশ, যদি কিছু অনিষ্ট হয়, আমার কাছে এস, আমি তার জন্যে দায়ী হব। কিন্তু সাবধান, এ কথা নিয়ে বাগানের ম্যানেজারদের বা কোন বাবুদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি কিম্বা মারামারি করতে যেও না। এই কথাটাই যেন সকলেব মনে থাকে। যদি ম্যানেজারেরা তোমাদেব ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তোমরা ব'ল, সভা কুলিদের, কুলি-সভাতে তোমাদের যেতেই হবে। এই পর্যান্ত, এর বেশি কিছু বলবার তোমাদের প্রয়োজন নেই।

কুলি-সর্দ্দাবেবা বলিল, নেহি বাবুজি, কোই হাঙ্গামা নেহি হোগা।

তবে তোমরা সব যাবে সভাতে?

জরুর যায়েঙ্গে।

আচ্ছা, তোমরা সকলে নিজ নিজ বাগানে যাও। আমিও এখন বিশ্রাম কবিগে।

বহুৎ আচ্ছা, বাবুজি। সেলাম।

সেলাম।—বলিয়া কুলি-সর্দ্দারদের বিদায় কবিয়া দীপক তাহার ঘরে প্রবেশ করিল।

৩০

রবিবার। আজ 'ভারতীয় চা-বাগান শ্রমিক-সঙ্ঘের' প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইবে বেলা দুইটায়। কল্যাণপুর বাগানের ছুটি। বাগানের রক্ষীদল ভিন্ন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মোটর-লরি চড়িয়া শহরের দিকে চলিয়াছে। কতিপয় কুলি-যুবক সভাগামী স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রয়োজনমত সাহায্য করিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে এই কুলির দল কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও একান্ত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে পারে, এই দিনের আগে কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিতে পারাও যায় না। শহর হইতে প্রতি এক ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া ঘাঁটি করা হইয়াছে, যেখানে আসিয়া আশপাশের বাগান হইতে কুলিমজুরেরা একত্র হইবে, তারপর মোটর-লরি তাহাদের লইয়া সভামণ্ডপে রাখিয়া আসিবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে দুই বা তিনটি করিয়া কুলি-যুবক সমবেত কুলিদের, বিশেষ করিয়া মেয়েদের, সুবিধা করিয়া দিতেছে।

কুলির দল আজ উৎসাহিত এবং চঞ্চল, বিশেষ করিয়া তরুণের দল ফিরিঙ্গিমারা বাগান কল্যাণপুরের সংলগ্ন বাগান। কাজেই ঐ বাগানে কল্যাণপুরের ছোঁয়াচ ভালই লাগিয়াছে। ফলে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার কোন অল্পতা নাই। তাই কানাইয়ার রওয়ানা হইতে এখনও দেরি দেখিয়া বন্ধু টেংরীর আর তর সহিতেছে না। কতক্ষণ ধরিয়া সে তৈয়ারি হইয়া বসিয়া আছে। এইবার তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। টেংরী কানাইয়াকে বলিল, হ্যাঁ রে কানু, তুই কি আর যাবি না?

সভা যে কি, সে সম্বন্ধে টেংরীর ধারণা যাহাই থাকুক না কেন, আসন্ন মোটর চড়ার স্ফূর্তি হইতে নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করিতে সে প্রস্তুত

নয়। তাই সে অনেকক্ষণ ধরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া কানাইয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সঙ্গে তাহার বোন সোহাগীও চলিয়াছে।

একটু দাঁড়া না, অত তাড়াতাড়ি কিসের? কানাইয়া একবার তাহার ঘর হইতে বাহির হইল, এবং দুই দিকে পিতলে বাঁধানো বাঁশের লাঠিটা বেড়ার গায়ে ঠেসাইয়া রাখিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, টেংরীর বোন সোহাগীও দাঁড়াইয়া আছে। কানাইয়া সোহাগীকে বলিল, তুইও যাবি নাকি, সোহাগী?

সোহাগী বলিল, যাবই তো, যাব না?

বেশ তো, চল না।—বলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। টেংরীর কিন্তু আর দেরি সহিতেছিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, অত দেরিতে গেলে কি আর সভার কিছু থাকবে? হয়তো শেষই হয়ে যাবে।

কানাইয়া ঘরে ঢুকিয়া হাতে এক খামচা তেল লইয়া মাথায় দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু জলও দিল; শেষে একখানা কাঠে বাঁধানো আয়না সামনে লইয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল। সে ঘরের ভিতর হইতেই জবাব দিল, সভা এখনই শেষ হয়ে যাবে কি রে? সভা যে বিকেলে।

কিন্তু মোটর যদি চ'লে যায়, তখন? তুই শিগগির আয়।

আমাদের ফেলে যাবে না। কানাইয়া তাহার ধূলিময়লা-নিষিক্ত চুলগুলিতে চিরুনি দিয়া রীতিমত একটা টেরি কাটিয়া ফেলিল এবং চেহারাখানা আর একবার আয়নাতে দেখিয়া লইল। টেংরী কানাইয়ার এত দেরি করার কারণ ঠাওরাইতে না পারিয়া দরজায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল, আয়না সামনে লইয়া কানাইয়া চুল আঁচড়াইতেছে। সেও নিজের চুলগুলিতে একটি বার চিরুনিটা বুলাইয়া লইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কানাইয়ার হাত হইতে চিরুনিখানা লইয়া নিজের এলোমেলো চুলগুলি ঠিক করিয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তৈলহীন

রুক্ষ চুলগুলি বিদ্রোহ করিয়া রহিল। টেংরী কহিল, চল কানু, আর দেরি নয়।

দাঁড়া, জামাটা গায়ে দিয়ে নিই।—বলিয়া কানু তাহার ছিটের শার্টটা কাঁধে ফেলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বাঁশের তৈয়ারি দরজাটা টানিয়া বন্ধ করিল। তারপর সোহাগীর দিকে তাকাইতে সোহাগী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তখন দুই বন্ধু এবং সোহাগী পথে নামিয়া আসিল। কিন্তু একটু পথ চলিয়াই কানাইয়া বলিয়া উঠিল, যাঃ, আমার লাঠিটা তো নেওয়া হয় নি। বাইরেই র'য়ে গেছে। সে আবার তাহাদের লাইনের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

এইবার টেংরী রীতিমত রাগিয়া বলিল, তোর ঐ রকম, লাঠিটা আবার ভুলে গেলি!

কানাইয়া মিনিট দুই পরই লাঠি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলে দুই বন্ধু ফিরিঙ্গিমারা বাগানের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু এত দ্রুত চলিতে লাগিল যে, সোহাগী হাঁপাইয়া উঠিল। বলিল, তোরা অত তাড়াতাড়ি হাঁটলে আমি পারব না যেতে। একটু আস্তে চ না, দাদা।

তাহারা যখন কুলি-ঘাঁটিতে আসিয়া পৌছিল, তখনও গাড়ি আসে নাই। সেই ঘাঁটিতে তখন আরও কয়েকজন কুলি মেয়ে পুরুষ জমা হইয়াছে। একটু পরেই দূরের একটা ঘাঁটি হইতে কয়েকটি কুলিকে বহিয়া একখানা লরি আসিয়া উপস্থিত হইল। টেংরীর আনন্দ ধরে না। সে সকলের আগেই গাড়িতে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একটি কুলি-যুবক তাহাকে এক পাশে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আরে দাঁড়া, গাড়িকে থামতে দে। শেষটায় চাপা পড়বি নাকি?

টেংরীর একটু ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু উপায়ই বা কি? এই ভলাণ্টিয়ারদের

হুকুম মানিতেই হইবে। ঘাঁটিতে কল্যাণপুরের যে সব কুলি-যুবক দাড়াইয়া আছে, তাহাদের কথা না শুনিলে চলে না। গাড়ি দাঁড়াইলে তাহারা অন্যান্য কুলিদের সঙ্গে তাহাতে উঠিয়া পড়িল।

গাড়ি যখন শহরে আসিয়া পৌছিল, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। সারাটা শহর কুলিদের চঞ্চল পদবিক্ষেপে এবং কোলাহলে মুখরিত। শিলচর শহরে স্টেশনের কাছেই যে একটা পতিত জায়গা আছে, সেখানেই মস্ত বড় একটা খড়ে ছাওয়া ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে। কুলির দল নিজেরাই খাটিয়া-খুটিয়া সযত্নে তৈয়ারি করিয়াছে। ইহার সম্মুখে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইলে টেংরী বলিল, ও কি রে?

কানাইয়া বলিল, ঐ তো আমাদের সভা-ঘর।

টেংরী কিছুই বুঝিল না। সবাই বলে সভা, সেও বলে সভা। কহিল, এতবড় একটা ঘর!

হুঁ। না হ'লে কি সবাই রোদ মাথায় ক'রে বসবে?

সত্যি ভাই কানাইয়া, তুই কখনও আগে সভা দেখেছিস?

বাঃ, দেখি নি বুঝি? আমি যে বাবুদের পাঠশালায় রোজ পড়তে যাই।

পড়তে গিয়ে কি দেখিস?

আমাদের ইস্কুলে কতদিন কত সভাই না বসে! বাগানের বাবুরা আমাদের কত ভাল ভাল কথা বলে! দেখিস, যখন আমরা সবাই লেখাপড়া শিখে বড় হব, তখন তো এসব বাগান আমাদেরই হবে।

তা তো হবে বুঝলাম, কিন্তু সভা তুই দেখলি কোথায়?

কেন, আমাদের ইস্কুলেই তো দেখেছি।

কি দেখেছিস?

ঐ সব লোক একসঙ্গে ব'সে কথাবার্ত্তা কইছে। আমার বাবাও তো মাঝে মাঝে যায়।

আচ্ছা কান্নু, ইস্কুলে না গেলে বুঝি সভা দেখা যায় না? তুই আমায় ইস্কুলে নিয়ে গেলি না কেন?

তোর বাবা যে মানা করলে?

বাবার ঐ রকম। বাবা সাহেবকে বড় ভয় করে। আমাকে তো সভায় আসতে বারণই করেছিল। আমি আর সোহাগী তো পালিয়ে এসেছি। তোর বাবা বুঝি তোকে বারণ করে নি?

দূর, বাবা বারণ করবে কি রে? আমার বাবা তো রোজ শহরে আসত, সেই তো এই ঘর তৈরি করেছে। আমি বাবার সঙ্গে এসে তো পরশুই একবার দেখে গেছি।

হ্যাঁ রে কানাইয়া, ঐ যে ঘরটার ওপরে একটা মস্ত বড় লাল নিশান উড়ছে, ওটা কি?

ওটা, ওটা,—ঐ নতুন বাবুটা যেন সেদিন কি বলেছিল ভাই, ভুলে গেছি।—বলিয়া কানাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মাথার ভিতরে তোলপাড় করিয়া শেষে হঠাৎ বুঝি তাহার মনে পড়িয়া গেল, বলিল, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, ঐ হ'ল আমাদের কুলিমজুরদের পতাকা।

ওটা কেন?

না ভাই, নতুন বাবু যেন কি সব কথা বলেছিলেন, ভুলে গেছি। তবে ঐ পতাকা দেখলেই মাথা নুইয়ে সেলাম করতে হয়।

টেংরী তৎক্ষণাৎ পতাকার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইল। শেষে বলিল, আচ্ছা কানাইয়া, তুই না বললি, আরও একটা সভা দেখেছিস? সেও কি আমাদের সভাই ছিল?

না না, সে ছিল বাবুদের সভা। আমি বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, একটা বাবু মাঝখানে দাড়িয়ে কি সব বলছে।

তুই ভেতরে গেলি না কেন?

আমাকে কি অমনই যেতে দেয়? পয়সা লাগে। আর তাতে যে বাবুরা ছিল রে।

বাবুরা থাকলে বুঝি আমাদের যেতে নেই?

দূর, তা কেন? পয়সা থাকলে সবাইকে দেয়। আমার কিনা পয়সা ছিল না, তাই যেতে দেয় নি।

আমি তো আজও পয়সা আনি নি। সোহাগী, তোর কাছে পয়সা আছে?

না, আমিও পয়সা আনি নি।

কান্তু, তুই পয়সা এনেছিস বুঝি? কিন্তু আমাদের যদি ভেতরে যেতে না দেয় কান্তু, তখন কি হবে?

আচ্ছা হাবা তো তুই! আজ আবার পয়সা কি রে? আজ যে আমাদেরই সভা। বিরিঞ্চিবাবুটাকে তুই দেখিস নি বুঝি? বড ভাল একটা বাবু এসেছে রে! ঐ বাবুটাই তো এতদিন আমাদের পডাত।

তুই কোন্ বাবুটার কথা বলছিস?

ঐ যে সেদিন তোকে দেখালুম, বাবুদের বাগানে আমার বাবার সঙ্গে কথা কইছে।

ও, সেই বাবুটাকে তো দেখেছি।

হ্যাঁ, তার কথাই তো বলছি। ওর কথায়ই তো বাবা মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মদ খেয়ে বাবা মা মারধোর করত ভাই!

সারাটা মণ্ডপ এদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। মণ্ডপের অভ্যন্তরে এক পাশে মহাত্মা গান্ধীর একখানি বৃহৎ চিত্র পত্রপুষ্পে

সজ্জিত রহিয়াছে। তাহারই দুই পাশে আগত জনমণ্ডলীকে বসানো হইয়াছে। মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি ও হাতে মোটা লাঠি লইয়া কুলি-যুবকেরা এই জনতার মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। পূজা, দেওয়ালী কিম্বা হোলি, এই সব উৎসব ভিন্ন তাহারা এমনই ভাবে কোথাও একত্রিত হইবার অবকাশ পায় না, তাহার কারণও ঘটে না।

৩১

দুইটা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। বৃদ্ধ রামলোচনবাবু ভুলুয়াকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন আসিয়া রামবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া যথাস্থানে বসাইল। বিরিঞ্চি ইতিমধ্যেই শিলচর শহরে কয়েকটি শিক্ষিত যুবককে তাহার সহায়করূপে পাইযাছে। তাহাদের সকলেই সভাতে উপস্থিত। শহরের সমবেত শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতেছিল। মণ্ডপমধ্যে উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই। অনুগ্রহ করিয়া যাঁহারা কুলি-সভায় যোগ দিতে আসিতেছেন, তাঁহারা কুলিদের সঙ্গে একাসনেই উপবেশন করিতেছেন। যাঁহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন কিম্বা এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছেন। সারা শহরময় এও এক আলোচনার বিষয়। 'ইণ্ডিয়ান প্ল্যাণ্টেশন লেবার ইউনিয়নে'র নামই কেহ আজ পর্য্যন্ত শুনে নাই। অথচ ইহারা এতবড় একটা সভার আয়োজন করিয়া বসিয়াছে!

কুলিদের মধ্যে হঠাৎ একটা রব উঠিল, বাবুরা এসেছেন।

একখানা মোটর আসিয়া মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইল। মোটর হইতে নামিয়া আসিল দীপক, বিরিঞ্চি, মনীষা ও ছায়া। বাবুদের আগমনে সমবেত কুলির দল চঞ্চল হইয়া উঠিল, অনেকে তাহাদের দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

দীপক ও বিরিঞ্চি ধীরে ধীরে মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ রামলোচনবাবুর পাশে মেঝেতে উপবেশন করিল। মনীষা এবং ছায়া কুলিরমণীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের এক পাশে গিয়া বসিল।

আসন গ্রহণ করিয়া দীপক এবং বিরিঞ্চি পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিল। এতবড় জনসমাবেশ, যাহার প্রায় সবই চা-বাগানের কুলিমজুর, দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল, আনন্দিত হইল। তাহারা রামবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ছলছলনেত্রে এই জনমণ্ডলীর দিকে তাকাইয়া কি এক ভাবঘোরে যেন তন্ময় হইয়া আছেন। রামবাবুর অন্তর দীপক এবং বিরিঞ্চির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সভার কাজ সুরু হইল। বিরিঞ্চি গিয়া পার্শ্বে রক্ষিত একটা ছোট টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইল। সমবেত নরনারী রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। সেই পাঁচ হাজার কুলিমজুরের সম্মুখে দাড়াইয়া সে মহাত্মা গান্ধীর তৈলচিত্রের প্রতি করজোড়ে নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া জনসঙ্ঘকে আহ্বান করিল।—

সমবেত ভাই, ভগ্নী ও সহকর্ম্মীগণ,

যে মহামানব ভারতের অগণিত দুঃস্থ, দুর্গত এবং পতিতের উদ্ধারকল্পে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যিনি সুদূর আফ্রিকাদেশেও তোমাদেরই ন্যায় কুলিমজুরদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে অশেষ নির্যাতন

ভোগ করেছেন, তোমরা সেই সর্ব্বত্যাগী গুর্জ্জর-সন্ন্যাসীর তৈলচিত্রকেই আজিকার সভার সভাপতিত্বে বরণ কর, এই আমাদের ইচ্ছা।

মণ্ডপমধ্যে তখন সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—মহাত্মা গান্ধীকি জয়।

জনরব শান্ত হইল। বিরিঞ্চি পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমরা বাগানের কুলিমজুর। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে-ছুড়ে এসে এই আসামের জঙ্গল কেটে বাগান তৈরি করেছ। এর প্রতিটি গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়েছ তোমাদের বুকের রক্ত। আজ যে কোটি কোটি টাকা চা-বাগানের মালিকের উদর পূর্ণ করছে, সে তোমাদেরই পরিশ্রমলব্ধ। তোমাদের শ্রম না হ'লে মালিকদের একদিন—একদিন কেন, এক মুহূর্ত্তও চলে না, চলবে না; তাই আমার একটিমাত্র কথা, তোমরা আজ থেকে ভাবতে শেখো, বাগানের তোমরা কে? এই ধন উৎপাদনে তোমাদের দানই বা কি এবং কতটুকু? আর বাগানে তোমাদের স্থানই বা কোথায়?

একমাত্র আসামের চা-বাগানেই তোমরা রয়েছ আট লক্ষের ওপর; তা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আছে আরও লক্ষ লক্ষ। তোমাদের না আছে শিক্ষা, না আছে জ্ঞান, না আছে সঙ্ঘশক্তি, না আছে অর্থ; আছে শুধু হাড়ভাঙা খাটুনির অফুরন্ত ক্ষমতা। বাগানের উপার্জ্জিত অর্থে রয়েছে তোমাদের সম্পূর্ণ অধিকার, এ তোমাদের নিজস্ব সম্পত্তি; অথচ তোমরা নিঃস্ব, তোমরা অজ্ঞ, তোমরা অবজ্ঞাত। তোমরা জান না, তোমাদের শক্তি কি এবং কতটুকু। তোমরা একবার সমবেত কণ্ঠে বল, 'আমরা মানুষ, মানুষের অধিকার আমরা চাই। অনাহার, অত্যাচার, অবিচার, অসহায় নির্যাতন আমরা আর সইব না, অনেক সয়েছি। আমরা চাই মুক্তি, চাই প্রাণ, চাই স্বাধীনতা।

সমবেত কুলিমজুরেরা বিরিঞ্চির কথাগুলি কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না। স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিয়া গেল মাত্র।

তারপর ধীরে ধীরে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠিল ছায়া। বিশেষভাবে কুলিরমণীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিয়া সে আসন গ্রহণ করিল।

তারপর দাঁড়াইল ভুলুয়া-সর্দ্দার। সে হিন্দীতে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

সমবেত সহকর্ম্মীগণ, এস, আজ আমরা বাগানের কুলিরা সব প্রতিজ্ঞা করি, আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বাবুদের নির্দ্দেশ মন্ত্রের মত মেনে চলব। আমরা যে পথে চলেছি, সে পথ বড় কণ্টকময়। অত্যাচার, উৎপীড়ন, অনাহার অর্দ্ধাহার, হয়তো বহুদিন আমাদের ভাগ্যে রয়েছে। কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। আমাদের এই দুঃখবরণ সফল হবে সেদিন, যেদিন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এই পথ কণ্টকশূন্য ক'রে যেতে পারব। যেদিন নির্ভয়ে বলতে পারব. 'কোদাল যার, বাগান তার'।

জনসঙ্ঘ ভুলুয়ার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া শুধু একটি বাব মাত্র উচ্চারণ করিল—'কোদাল যার, বাগান তার'। সহসা 'হট যাও, হট যাও, রাস্তা ছোড়' শুনিয়া সকলেই ভীত চকিত নেত্রে সম্মুখের দিকে তাকাইল। দেখিল, পুলিসের বড় সাহেব এক দল লালপাগড়িওয়ালা লাঠিধারী কন্‌স্টেব্‌ল ও বহু পুলিসকর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া যেখানে দীপক, বিরিঞ্চি প্রভৃতি বসিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। এদিকে এক দল গুর্খা সৈন্য মণ্ডপের সম্মুখে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ভয়ে কুলিদের মুখ শুকাইল। মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিল, এবং অনেকেই উঠিয়া যথেচ্ছা পলায়ন করিতে লাগিল। পুলিসের

লাঠি এবং সঙিনের গুঁতার ভয়ে ভীত কুলির দল হুড়মুড় করিয়া একে অন্যের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। কেহ কেহ পলাইয়া বাঁচিল, কেহ বা ঘাড়ে ধাক্কা খাইল, কেহ বা 'মৃদু' লাঠি-সঞ্চালনের আস্বাদ মাত্র পাইয়া বাঁচিয়া গিয়া ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

পুলিস-সাহেব সম্মুখে গিয়া বিরিঞ্চি এবং ভুলুয়াকে গ্রেপ্তার করিলেন. বিরিঞ্চি সেই ছত্রভঙ্গ কুলিদিগকে শান্ত সংযত থাকিতে উপদেশ দিয়া বলিল, ভাইগণ, আমি চললাম, কিন্তু জেনো, আমাদের কাজ ন্যায় এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জয়ও নিশ্চিত। দেখো, আমার আরব্ধ কার্য্য যেন মধ্যপথে বন্ধ না হয়। বিরিঞ্চি দীপককে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল। দীপকের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

ছায়ার অজ্ঞাতেই একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকের ভিতরটা খালি করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। মনিয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইল। পিতাই যে তাহার এ সংসারে একমাত্র অবলম্বন।

৩২

কান্তু, চল ভাই শিগগির। আবার হয়তো পুলিস আসবে। বাপ রে বাপ, আগে জানলে কে আসত ?

কেন, হয়েছে কি শুনি ?

আর শুনে কাজ নেই ; চল এবার।

দাঁড়া না। আসবার সময় তো তর সইছিল না। তুই বড় ভীতু।

হুঁ, ভীতু। অমন পুলিস দেখলে সবাই ভয় পায়। তুইও যেন ভয় পাস নি আর কি ?

আমি তোর মত ভীতু নই। পুলিস কি করবে? না হয় জেলে দেবে, দিক না? আমাদের নতুন বাবুটাকেই যদি নিয়ে গেল তো, আমাদের যেতে দোষ কি?

ঐ যে বাবুটাকে পুলিস নিয়ে গেল, সে খুব ভাল বাবু ছিল, না রে?

বড় ভাল বাবু ছিল রে, টেংরী। আমাদের কত আদর করত, বই কিনে দিত, পেন্সিল দিত, আমাদের সঙ্গে খেলা কবত।

কিন্তু বাবুটাকে এখন কি করবে? পুলিস খুব মারধোর করবে বুঝি?

কি জানি ভাই। আমার কেমন মন খারাপ হযে গেছে।

চল না ভাই, ফিরে যাই। দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

বাবা আসুক, একসঙ্গে যাব। ঐ তো বাবা, বড়বাবুর সঙ্গে কি সব কথা কইছে।

বড়বাবু কই?

ঐ যে, তাঁকে ঘিরে দাড়িয়ে সবাই কি সব শুনছে, দেখছিস না?

চল না, আমরা গিয়েও শুনি।

চল। ঐ যে, বাবা এদিকেই আসছে।

কানাইয়ার পিতা ব্রীজমোহন আসিলে কানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নতুন বাবু আর বড সর্দ্দারকে পুলিস কোথায নিয়ে গেল, বাবা?

থানায।

কেন?

ওদের জেল হবে।

জেল হবে?

কানাইযা, টেংরী এবং উপস্থিত আর সকলেই কেমন বিষণ্ণ

হইয়া উঠিল। কানাইয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, আর কাউকে নিলে না, বড়বাবুকে না, তোমাকে না, মধু-সর্দ্দারকে না, ছায়াদিকেও না. শুধু নতুন বাবুটা আর ভুলো-সর্দ্দারকে নিয়ে গেল কেন, বাবা?

পুত্রের প্রশ্নে পিতার মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ব্রীজমোহন বলিল, নেবে বাবা, নেবে, সবাইকে নেবে, কেউ বাদ যাবে না। ওবাই কিনা কুলিদের নিয়ে দিনরাত থাকত, তাই ওদেরই আগে ধরলে।

আমাদেরও ধরবে বাবা? কানাইয়া পিতার মুখের প্রতি এক ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কেমন একটা শঙ্কার ভাব উপস্থিত সকলের মুখের উপরই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ব্রীজমোহন বলিল, না না, তোদের ধরবে কেন?

কিন্তু তুমি যে বললে, বাবা?

থাক, ও কিছু নয়। অ্যাঃ, ঐ যে দেখছি ফুলমণিটা কাঁদছে; ব্রীজমোহন তাহার দিকে অগ্রসর হইল। ফুলমণি চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে, আর বদলু কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিতেছে, তুই অত কেঁদে মরছিস কেন ফুলু? চল, ঘরে যাবি চল। কিন্তু উপস্থিত কেহই বুঝিল না, ফুলমণির বেদনা কি এবং সে বেদনার উৎসই বা কোথায়।

ব্রীজমোহন ফুলমণির কাছে গিয়া বলিল, ফুলি, অমন ক'রে কাঁদে না, ছিঃ! এখন ঘরে যা। বদলু, ফুলমণিকে নিয়ে যা তো। নতুন বাবু ফুলমণিকে বড় আদর করত, তাই ওর কষ্ট হচ্ছে খুব।

ফুলমণি উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুঁপাইয়া উঠিল।

সেই সময় ছায়া এবং মনীষা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল তখনও সমস্ত কুলিমেয়েরা সভাস্থান ত্যাগ করিয়া যায় নাই বলিয়া তাহারাও যাইতে পারে নাই।

ছায়া ফুলমণিকে বলিল, ছি ফুলি, অমন ক'রে বুঝি কাঁদে। চল, ঘরে যাবি।—বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ব্রীজমোহন ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা তখন অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ জনতাকে নিজ নিজ বাগানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ব্রীজমোহন এবং অন্যান্য কতকগুলি কুলি মেয়ে-পুরুষ একটা মোটর-ট্রাকে বসিয়া আমড়াছড়া বাগানে চলিয়াছে। একটি কুলি ব্রীজমোহনকে বলিল, দেখলে তো সর্দ্দার, আমি আগেই বলি নি, ওসব সভা-টভাতে না যাওয়াই ভাল? তোমার পীড়াপীড়িতে এসে এখন কি কাণ্ডটাই না হ'ল।

কি হ'ল তোর?

হবে আর কি? লাঠিপেটা হতে হতে কোন রকমে বেচে গেছি। এখন যদি বাগান থেকে তাড়িয়ে দেয়, বল দেখি, কি খাব আর যাবই বা কোথায়? মাংরুটা যে আসে নি, এখন দেখছি সেই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

ব্রীজমোহন বিরক্ত হইল। বলিল, তোর যেমন বুদ্ধি, কথাটাও বললি তেমনই। বাগান থেকে তাড়ানো অত সহজ আর কি!

কিন্তু আজই গিয়ে যদি শুনি, ম্যানেজার ঘরদোর ছেড়ে দিতে নোটিস দিয়েছে, তখন সবাইকে নেবে তোমার ঐ বাবুদের বাগানে?

সে ভাবনা তোকে করতে হবে না মংরু, সাহেব তোকে কিছু বলবে না, বললে আমাদের সর্দ্দারদেরই বলবে। আর ডাকলে কি জবাব দিতে হবে, সব ঠিক না ক'রেই বুঝি আমরা সভাতে গিয়েছিলাম ভেবেছিস?

কিন্তু সভাতে গিয়েই বা লাভটা কি হ'ল শুনি?

সভাতে গিয়ে কি লাভ হয়েছে, আজ ঠিক তা বুঝতে পারবি না। যাক আরও কিছুদিন, তখন বুঝবি।

সন্দিগ্ধ মনে মংরু বলিল, হুঁ, যা হবে তা তো দেখেই এলাম। এই বাবুদের প্রথমে ধ'রে নিয়ে জেলে পুরে দিলেই সব ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

এই সময়ে একটি যুবক ঘাড় উঁচাইয়া বলিল, কি যে বলছ মংরু ভাই, অত সহজেই লাঠিপেটা ক'রে দমিয়ে দেবে? আজ শুধু বাবুরা বারণ করেছিল ব'লে, নইলে দেখে নিতাম ঐ পুলিসের লোকগুলোকে।

ব্রীজমোহন বলিল, মেরেই যদি আমাদের চুপ করিয়ে দিতে এখনও পারে, তবে আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব, আমাদের হাজিরাও বাড়িয়ে দেবে না, ঠিকাও না। ঘরদোরেরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটবে না, ইস্কুল তো দূরের কথা।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে তাহারা আসিয়া আমড়াছড়াতে পৌছিল। বাগানে পৌছিতেই কতকগুলি ছেলেমেয়ে আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, সভাতে কি কি হইল প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল।

৩৩

দীপক ও রামলোচনবাবু এখনও ফিরেন নাই। বিরিঞ্চি এবং ভুলুয়াকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে কি না, জানা নাই; না হইলে হাজতবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; এই সব কারণেই তাঁহাদের রাত্রি হইতেছিল।

মনীষা বলিল, ঠাকুরঝি, তোর আর আজ রান্না ক'রে কাজ নেই, আমিই রাঁধব।

কেন বউদি, তুই আবার আজ রাঁধতে যাবি কেন? তোর শরীর

এখনও ঠিক সুস্থ হয় নি। আমিই রান্না চড়াই, তুই বরং আমাকে সাহায্য কর।

তুইই বরং তাই কর।—বলিয়া মনীষা ছায়ার হাত হইতে জলের ঘটিটা কাড়িয়া লইল।

ছায়া অগত্যা চুপ করিয়া পাশেই একটা মোড়ার উপরে বসিয়া পড়িল। আজ পুলিসের আক্রমণটা অপ্রত্যাশিত না হইলেও আকস্মিক বইকি। বিরিঞ্চি এবং ভুলুয়াকে একেবারে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে, এতটা কেহই আশঙ্কা করে নাই। তাহাদের ধারণা ছিল, পুলিস আসিয়া খুব বেশি কিছু করে তো সভাটা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে। কিন্তু পুলিস আসিয়া বিরিঞ্চি ও ভুলুয়াকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল দেখিয়া ছায়া সত্য সত্যই দমিয়া গেল। এতদিন যে অজ্ঞাত প্রেরণা এই অনভিপ্রেত কাজেও তাহাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, আজ তাহার কেমন অভাব বোধ হইতে লাগিল। অন্য দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেয়েদের মধ্যে কাজ করিয়া আসিয়াও যখন আবার রাত্রিতে রান্না করিতে হইত, তখনও দৈহিক বা মানসিক ক্লান্তিবোধ সে করে নাই। কিন্তু আজ এই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও দারুণ ক্লান্তি এবং অবসাদে সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

এদিকে মনীষা ঠাকুরঝিকে দুই একটা ছোটখাটো ফরমাশ করিয়াও যখন কোন সাড়া পাইল না, বুঝিল, ছায়া কি এক ভাবনায় ডুবিয়া আছে। সে বলিল, কি দরজার কপাটে অমন মাথা রেখে ব'সে আছিস যে? ওঠ, চারটি পাঁচফোড়ন এগিয়ে দে।

তুই নে বউদি, আমি আর উঠতে পারছি না। আমি বরং একটু শুইগে। শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।

মনীষা বলিল, তোকে এখন যেতে দেয় কে? বসেছিস, আমার

সঙ্গে গল্প কর। শরীরও ভাল হবে, মনও হালকা হবে। আচ্ছা ঠাকুরঝি, একটা কথা বল দিকি আজ খুব পষ্ট ক'রে?

তোর কি কথা, তা জানাই আছে। থাক, আমি শুইগে।—বলিয়া ছায়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু মনীষা খপ করিয়া তাহার ডান হাতটা ধরিয়া বলিল, না না ঠাকুরঝি, তামাসা করছি না। আমার একটা কথার জবাব দিতেই হবে তোকে আজ।

ছায়া পুনরায় বলিল, বল তোর কি কথা, আজ সব জবাব দোব। তবু তুই খুশি হ। বল, কি জানতে চাস?

দাঁড়া ভাই, ডালে ফোড়নটা দিযে নিই। মনীষা তপ্ত কড়ায় ঘিয়ের মধ্যে তেজপাতা, লঙ্কা ও কতকগুলি ফোড়ন ছড়াইয়া দিল। ফোড়নগুলি পট পট করিয়া ফুটিয়া উঠিলে কড়ায় ডাল ঢালিয়া বার দুই ঘাঁটিয়া দিয়া বলিল, তুই রাগ করেছিস নাকি, ঠাকুরঝি?

দূর পাগল। ছায়ার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল।

মনীষা বলিল, বিরিঞ্চিবাবুকে তোর কেমন লাগে ঠাকুরঝি—লোকটির সঙ্গে তো এতদিন ধ'রে কাজ করছিস? সত্যি বলিস কিন্তু।

ভালই লাগে।

আমার মনে হয়, বিরিঞ্চিবাবু তোকে ভালবাসে। তোর কি মনে হয়?

মনীষার কথায় ছায়ার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। বলিল, কি জানিস বউদি, আমি এদিক দিয়ে ওঁকে ঠিক বুঝতে চাই নি, আর পারিও নি।

সে কি কথা?

হ্যাঁ, বউদি। কেমন খেয়ালী লোক, আর অল্পভাষী, বাজে কথা আমার সঙ্গে কখনও হ'ত না।

তা বেশ, কিন্তু তোর নিজের দিক দিয়ে?

ছায়া বিব্রত হইল। কি জবাব দিবে সে? ভাল সে বিরিঞ্চিকে বাসিযাছে নিশ্চয়। নহিলে আজ তাহার প্রাণ অমন কাঁদিয়া উঠে কেন? কুলিদের জন্য? মোটেই না। আজ বিরিঞ্চির কথা যেমন করিয়া তাহার মনে পড়িতেছে, কই, ভুলুয়ার কথা তো তাহার মনকে তেমন করিয়া তোলপাড় করিতেছে না? লাঠি-খাওয়া কুলিদের কথাও তো মনে পডিতেছে না? আজ বিরিঞ্চির জন্যই না সে এমন করিয়া ভাঙিয়া পডিতেছে? বিরিঞ্চির শুকনা মুখ দেখিলে তাহার প্রাণে অমন ব্যথা বাজিত কেন? আর এই শীতের রাত্রিতে বিরিঞ্চির পথ চাহিযা না খাইয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতই বা সে কি কারণে?

ছায়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

কই ঠাকুরঝি, বড চুপ ক'রে গেলি যে?

এই দুঃখভারাক্রান্ত মনেও ছায়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা বউদি, ও কথা জেনে তোর লাভটাই বা কি শুনি?

অত লাভ-লোকসানের হিসেব আমি দিতে পারব না বাপু। আমি তো আর বি. এ. এম. এ. পড়ি নি যে, হিসেব ক'রে প্রেম করতে যাব।

যাঃ, তোর মুখে ছাই পড়ুক।

তা পড়ুক। কিন্তু তুই মনের কথাটি খুলে বল।

ছায়া আবার হাসিল। বলিল, কি জান বউদি, আজ যেন সত্যিই কিছু ভাল লাগছে না। ভাল তো আর আগে কাউকে বাসি নি, কাজেই ঠিক একেই তোরা ভালবাসা বলিস কি না, জানি না। কিন্তু সত্যি বউদি, যতই মিস্টার রায়কে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করেছি,

ততই তাঁর কথা ভেবেছি, আর যেন আকৃষ্টও হয়ে পড়েছি। আজ পুলিস যখন তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল, তখন দাঁড়িয়ে আমি সে দৃশ্য দেখতে পারলাম না। বুকটা যেন আমার ফেটে যাবার মত হ'ল।—বলিতে বলিতে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ছায়ার ব্যথা মনীষাও অনুভব করিল। বলিল, ঠাকুরঝি, মন যদি অমন ক'রেই তাকে পেতে চাইছিল, আমাকে আগে বলিস নি কেন ?

তোকে ব'লে লাভ হ'ত কি, বউদি ? মন যা চায়, তা কি সব সময়েই পাওয়া যায় ?

তা যায় না জানি। কিন্তু এ পাওয়াটা তেমন কিছু অসম্ভব ছিল না, ঠাকুরঝি।

কিন্তু চাইলে যে পাওয়া যেতই, এমন মনে করবারই বা কি আছে ?

সে তখন বোঝা যেত, পাওয়া যায় কি না! তা ছাড়া যে দুয়ার লৌহ অর্গলে বন্ধ রয়েছে ব'লে মনে হয়, তাতে ঘা দিয়েই তো নারী পায় আনন্দ, তাতেই তো প্রয়োজন হয় শক্তির। আর একটি বার যদি ঐ দুয়ার ভেঙে দেওয়া যায় তো তার অন্তরের সবটুকুই যেমন সমগ্রভাবে পাওয়া যায়, তেমন বুঝি অন্য কিছুতেই হয় না।

শক্তির পরিচয় দিয়ে যে পাওয়া সেই পাওয়াতেই সত্যিকারের আনন্দ, মানি; কিন্তু নিজের জন্যে অপরকে এমনই ক'রে আঘাত করাতেই কি শক্তির জয় ?

নিশ্চয়, যদি আমি বুঝি যে, এই লৌহ-কবাটের পশ্চাতেই রয়েছে আমার একান্ত কামনার ধন, তো তাতে আঘাত করব বইকি। তাতে যেমন আমার লাভ, তেমনই তারও যে লাভ।

কিন্তু অত লাভ-লোকসান খতিয়ে আমি দেখি নি, সত্যি বউদি।

দেখ ঠাকুরঝি, তোর ঐসব কথাতে আর কিছু না থাক, প্রচুর ঝঙ্কার রয়েছে, মানি। কিন্তু একটা নারী তার জীবনটাকে নিঃশেষে নিংড়ে ফেলে দিচ্ছে, অথচ তার বিনিময়ে সে পাবে না কিছুই? আমি বিরিঞ্চিবাবুকে কোন মতেই খাটো করব না। জানি তিনি মহৎ, ত্যাগও তাঁর বিরাট; কিন্তু তাই ব'লে তোমারও যে তাঁকে না পেয়ে বেদনা সয়ে মরার যুক্তিটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ঠাকুরঝি। এ তো তোমার নিজের ওপর ঘোর অবিচার।

অবিচার কেন বলছ?

বলব না অবিচার? একটা পুষ্পিত নারীহৃদয় মরীচিকার পেছনে সারাটা জন্ম ছুটে চলবে, অথচ না পাবে সে তার নাগাল, না দেবে সেও তাকে ধরা। ঐ উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ যদি তার গতিধারা না পেয়ে একটা মরু-প্রান্তরের বুকে অকালে শুকিয়ে মরে তো, তাতে দুঃখ জাগবে না? একেও কি অবিচার বলব না?

এ তোর ভুল, বউদি।

কিচ্ছু ভুল নয়। কেন ঠাকুরঝি, তুই কি বলতে চাস, এ ত্যাগ তোর না করলেই নয়?

এ কিছু ত্যাগ করা নয়, এ হ'ল নিছক কর্তব্যের আহ্বান।

সে তুই যাই কেন না বলিস ঠাকুরঝি, একে আমি বলব অসম্ভবের পেছনে ছোটা; আর এমনই ছোটার চেয়ে বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখে চলাই উচিত। জীবন এতেই পায় পূর্ণতা।

বাস্তব যে ঠিক কি এবং কোন্‌টা এবং জীবনে পূর্ণতাই বা আসে কিসে, হাতে না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ তা নিশ্চয় ক'রে কিছু বলতে পারে কি? তোমার পক্ষে যা হবে পূর্ণতা, আমার বেলা তাই হয়তো হবে শূন্যতা। কাজেই নিজ নিজ ভাবে আপন আপন আদর্শকে লক্ষ্য ক'রেই

মানুষ পথের সন্ধান পেতে পারে। কেন না, দুই ভিন্নমুখী ভাবধারা একত্র মিলিত হতে গেলেই হয় সংঘর্ষের সৃষ্টি।

যদি তাই বুঝে থাকিস তো, এ আগুনে হাত পোড়াতে গেলি কেন?

এ 'কেন'র কোন জবাব নেই, বউদি। হাত যখন পোড়বার, তখন কিছুতেই তা আটকাতে পারে না। আগুন কি পতঙ্গকে ডেকে আনে, বউদি? ওরা আপনা থেকেই আসে। কাজেই বিরিঞ্চিবাবু যদি পতঙ্গের ভয়ে নিজেকে একটা কালো আবরণে ঘিরে রাখতে চান, তবে তাঁকেই বা দোষ দিই কি ক'রে?

তুমি দোষ না দিতে পার ঠাকুরঝি, কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না। নারীব সংস্পর্শে এলেই যে পুরুষের আদর্শভ্রষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে, কর্ম্মবিচ্যুতি ঘ'টে যায়, তাকে দিয়ে জগতে কোন মহৎ কাজই আশা করা যেতে পারে না। এতে তার পৌরুষ কোথায়?

আদর্শভ্রষ্ট হবাব ভয় নয় বউদি, ভয়—সংসারে জড়িয়ে পড়বার। কাজেই তুমি মিস্টার রায়ের ওপরও যেমন অবিচার করছ, আমাব ওপরও করছ তেমনই। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, ভাল আমি তাঁকে বেসেছি, কিন্তু তাঁর পত্নীত্ব চাই নি।

কথাটা ভাল শেষ হইল না। তর্কটা হয়তো আরও খানিকক্ষণ এমনই চলিত: রামবাবুর ডাকে বাধা পাইল।

দাদু ডাকছ কি?—বলিয়া ছায়া উঠিয়া গেল।

রামবাবু বলিলেন, রান্না করছে কে?

বউদি।

বেশ, কিন্তু বিরিঞ্চিকে জামিন দিলে না, দিদি।

খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনায় ছায়ার মনের ভারটা অনেকটাই হালকা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কথা শুনিয়া আবার ভারী হইয়া উঠিল।

আহারান্তে ছায়া শয্যায় শুইল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতেছে ; চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। ছায়া উঠিয়া বিরিঞ্চির ঘরে প্রবেশ করিল। শূন্য শয্যা সাদা খদ্দরের চাদরে আবৃত। ছায়ার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—জেলের ছারপোকা-পরিপূর্ণ ময়লা কম্বল-শয্যা। কম্বলগুলি নিশ্চয়ই বাগানের কুলি-কম্বল হইতে ভাল হইবে না। উঃ, কি ভীষণ খসখসে আর কুটকুটে ঐগুলা! কি করিয়া মিস্টার রায় ঐ বিছানায় শয়ন করিবেন? ছায়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। না, আর সে ভাবিতে পারে না। সে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। আবার ঘুমাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। উঠিয়া গিয়া পুনরায় সে বিরিঞ্চির ঘরে প্রবেশ করিল।

দুই হাত বুকে ঠেকাইয়া কহিল, আর যে পারি না দেবতা! আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি। তুমি আমায় গ্রহণ কর। হ্যাঁ, আমিও জেলে যাব, জেলে যাব। তোমারই পাশে স্থান নোব। থাক প'ড়ে ওসব। কি হবে আমার কুলিমজুর দিয়ে? কুলির উন্নতি কুলিরা করুক। আমি কেন? আমি তো এ পথে আসতে চাই নি। তুমিই আমায় টেনে এনেছ এ পথে। আমাকে পথে নামিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় এমনই ক'রে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে চ'লে যাবে, তা কে জানত? ছায়া আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। বালির বাঁধ ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত নদীজল যেমন দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিয়া চলে, ছায়ার অশ্রুজলও তেমনই তাহার দুই গণ্ড ভাসাইয়া বুকের জামা কাপড় সিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। দুই হাতে মুখ চোখ চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ

সে কাঁদিল। বুক চাপিয়া একবার উচ্ছ্বসিত বক্ষস্পন্দন থামাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতেই বিরিঞ্চির শূন্য শয্যায় আছড়াইয়া পড়িল। কতক্ষণ এমনই কাটিলে তাহার হুঁস হইল, এ কি করিতেছে? সে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে নিভৃত গৃহকোণে এমনই ক্রন্দন কি তাহার এখন কর্ত্তব্য? বিরিঞ্চি তো তাহাকেই সমস্ত কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া গিয়াছে। যাইবার সময়ও না বলিয়া গিয়াছে, আমার আরব্ধ কার্য্য যেন বন্ধ না হয়! ছায়া পুনরায় তাহার শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সুখ-শয্যাতে শয়ন অসম্ভব হইল, সে কেবল মেঝের উপর একখানা শতরঞ্জি বিছাইয়া এই শীতের রাত্রে ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘুম আসিল না, আসিল অফুরন্ত চিন্তা আর দারুণ শীতের কম্পন। এমনিভাবে ছটফট করিয়া ছায়া রাত কাটাইতে লাগিল।

৩৪

আজ বিরিঞ্চির বিচারের দিন। চারিদিকের বহু বাগান হইতে দলে দলে কুলিরা আসিয়া শিলচরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রাঙ্গণটি লোকারণ্য করিয়া তুলিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং এ মোকদ্দমার বিচার করিবেন। সাহেব ভিন্ন এ মামলার বিচার চলিতে পারে না। কুলি-মজুরদের স্বাধীন মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা যে চা-বাগানের মালিকদের চক্ষে কত বড় অপরাধ, যাহারা আসামের অবস্থা জানে না, তাহারা তাহা বুঝিবে না।

অফিসের সম্মুখে বড় বড় কয়টা বটগাছ অগণিত শাখাপ্রশাখা মেলিয়া ছায়া বিস্তার করিয়া আছে। আজ সমস্ত স্থানটা অসংখ্য

কুলি-নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছে। অনেকে গিয়া পুলিস-ইন্স্পেক্টরের অফিসের বারান্দায় পর্য্যন্ত উঠিয়া বসিয়াছে। কুলিদের কাহারও হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি; কাহারও বা তৈলনিষিক্ত চুলে টেরি কাটা, হাতে চুরুট, গায়ে ছিটের জামা, পায়ে শক্ত চামড়ার নাগরা; আবার কাহারও কাহারও শতছিন্ন কটিবস্ত্র মাত্র সম্বল, গায়েও শতছিন্ন একটি জামা। সভাব দিন যাহারা আসে নাই, বিচারের দিন তাহারাও আসিতে বাকি রাখিল না। তাহাদেরই জন্য একটা বাবু এমনই করিয়া জেলে যাইতেছে, আর তাহারা তাহাকে একটি বার চোখের দেখাও দেখিবে না, ইহা কি হইতে পারে? এই সরলবিশ্বাসী মূর্খ কুলিরা স্ত্রী পুরুষ সকলেই আজ দলে দলে আসিয়াছে। রমণীদের কাহারও কপালে মেটে সিঁদুরের প্রকাণ্ড ফোঁটা, পরনে কালো শাড়ি, গায়ে আধময়লা লাল শেমিজ। যুবতীরা নিজ নিজ শিশুসন্তানকে বাগানে একা ফেলিয়া আসা সম্ভব নয় বলিয়া একখানা কাপড়ের সাহায্যে সন্তানটিকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছে। যাহাদের বাগান অতি নিকটে, তাহারা একটি সন্তানকে কোলে এবং অপর একটিকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। সমবেত সকলের মুখে একই কথা—বাবুটির আজ কি হইবে?

ট্রেজারির ঘণ্টাতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনখানা ট্যাক্সি আসিয়া কোর্টের সম্মুখে দাঁড়াইল। কুলিমজুরেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সামনের মোটর হইতে কতকগুলি বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্য নামিয়া দ্বিতীয় মোটরখানা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কুলিরা বুঝিল, বিরিঞ্চি এই গাড়িতেই আছে। সিপাহীদের বেষ্টন করিয়া কুলির দল ভিড় জমাইয়া তুলিতেই 'হট যাও, হট যাও' শব্দে তাহারা আবার পিছাইয়া গেল। যাহারা সামনে ছিল, তাহারা ধাক্কা খাইয়া পিছনের

ব্যক্তির গায়ে গিয়া পড়িল। সেই মোটর হইতে বিরিঞ্চি এবং ভুলুয়া উভয়েই নামিয়া আসিল।

বিরিঞ্চি এবং ভুলুয়াকে কোর্টের ভিতরে লইয়া গেলে পর কুলির দল তৃতীয় গাড়িখানা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দীপক, রামবাবু প্রভৃতিকে নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিল।

বিরিঞ্চির বিচার আরম্ভ হইল। বিচারকের কামরাটি শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং উকিল-মোক্তারে ভরিয়া গিয়াছে।

সাহেব ইংরেজীতে বিরিঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন কি?

বিরিঞ্চি বলিল, না।

সাহেব বলিলেন, আপনি কি আপনার কাজের দ্বারা বাগানের কুলিমজুরদের মধ্যে স্বেচ্ছায় উত্তেজনা ও বিপ্লব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন?

বিরিঞ্চি উত্তর দিল, আমার মনে হয়, আমি এমন কিছু করি নি। আমি কুলিমজুরদের শান্ত, সংযত ও অহিংস ভাবেই তাদের দাবি জানাতে উপদেশ দিয়েছি। এ ছাড়া আমি আর যা বলেছি, তাতে দরিদ্র কুলিমজুরদের প্রতি ধনী মালিকদের যে অবিচার, তার প্রতিবাদ আছে; দুর্ব্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার করবার যে চিরন্তন প্রবৃত্তি, তা প্রতিরোধ করবার প্ররোচনা আছে; মূর্খের প্রতি শিক্ষিতের যে উপেক্ষা, তার প্রতি অবজ্ঞা আছে; আর আছে ঐ সমস্যা-সমাধানের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত।

এমনই আরও দুই চারি কথাব পর সাহেব ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া কি ভাবিয়া লইলেন। সমস্ত কক্ষটি রুদ্ধনিশ্বাসে ডেপুটি-কমিশনারের বক্তব্য শুনিবার অপেক্ষায় রহিল। ক্ষণকাল পরে সাহেব

উঠিয়া দাঁড়াইয়া রায় দিলেন, বিরিঞ্চির দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। সরাসরি বিচার হইয়া গেল।

ভুলুয়ারও একই অপরাধে একই দণ্ডাদেশ হইল।

বাহিরে সমবেত কুলিমজুরের দল এই সংবাদ পাইয়া 'হায়, হায়' করিয়া উঠিল। এক দল কুলি-যুবক তো ক্ষেপিয়াই উঠিল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সর্দ্দারেরা বহুকষ্টে এই উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিতে লাগিল। এমন সময় বিরিঞ্চি আসিয়া কোর্টের বারান্দায় দর্শন দিল। এখনই মোটরে উঠিয়া দুইটি বছরের জন্য তাহাকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইতে হইবে। কুলির দল নর নারী ছেলে বুড়ো সকলে, বিরিঞ্চির পা ছুঁইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে উন্মত্তের ন্যায় সেই দিকে ছুটিল। বিরিঞ্চি বলিল, আমার পা তোমরা এসে ছোঁও, সে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু কুলির দল মানিবে কেন? তাহারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল।

দীপক এবং বিরিঞ্চি শেষবারের মত উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল। বিরিঞ্চির মুখে একটা বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল, দীপকের চক্ষুকোণে অশ্রু দেখা দিল। দীপক তারপর ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া যখন তাহাকেও বাহুমধ্যে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, ভুলুয়াও আর চোখের জল সংবরণ করিতে পারিল না। পাশে দাঁড়াইয়া মনিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সমবেত কুলিরা নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। মনিয়া সেদিন যদিও বা নিজেকে সামলাইতে পারিয়াছিল, আজ আর পারিল না। মেঘ এতটুকু উত্তাপের সংস্পর্শে যেমন করিয়া ঝরিয়া পড়ে, ভুলুয়ার চোখে জল দেখিয়া নারী মনিয়া সংসারে তাহার একমাত্র অবলম্বন পিতাকে জেলের দুয়ারে ঠেলিয়া দিয়া আজ আর কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিল না।

বিরিঞ্চি মোটরে আরোহণ করিল। সেই সময় দেখা গেল, সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে কে একটি কুলিরমণী কতকগুলি লাল ইস্তাহার বিলি করিতেছে ; উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"কোদাল যার, মাটি তার"। যাহারা পড়িতে জানে, তাহারা মাথা হেঁট করিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিল, ইহাতে বিরিঞ্চির সেদিনের বক্তৃতাটি ছাপার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। আর আছে সর্ব্বনিম্ন বলিয়া কথিত কুলিমজুরদের কতকগুলি দাবি।

পুলিসের লোক জনতার হাত হইতে লাল ইস্তাহারগুলি যে কয়খানা পাবিল কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু হঠাৎ গিয়া একটি কুলি-যুবতীর হাতে অনেকগুলি পাইল। সে তখনও ইস্তাহার বিলি করিতেছিল। একটা কন্‌স্টেব্‌ল তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি ?

মেয়েটি কন্‌স্টেব্‌লের মুখের দিকে একটি বার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, আমার নাম ফুলমণি। জেলে দিবি নাকি ? দে না। সে নিজের হাতটা কন্‌স্টেব্‌লের মুঠার ভিতর হইতে এক টানে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, গায়ে হাত দিস কেন ? মুখে বলতে পারিস না ?

কন্‌স্টেব্‌লটি হতভম্ব হইয়া ফুলমণির দিকে আবার তাকাইল, কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করিল না।

ফুলমণিকে একটি দারোগার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইলে দারোগা বলিলেন, তোর স্বামীর নাম কি ?

কেন, আমার নাম বদলু।—বদলু পিছন হইতে জবাব দিল।

ফুলমণি অবাক হইয়া ফিরিয়া দেখিল। ফুলমণিকে গ্রেপ্তার হইতে দেখিয়া বদলু তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দারোগা কি ভাবিয়া ফুলমণিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, যা, এযাত্রা রক্ষা পেলি, আর কোন দিন ওসব করবি তো, তোকে জেলে পাঠাব।

দে না দেখি জেলে।—বলিয়া ফুলমণি বদলুকে বলিল, চল যাই। জেলে দেবে, ভারী যেন ভয় করি!

ছায়ার অবস্থা আজ শান্ত, স্থির, গম্ভীর। বিরিঞ্চি এই কয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাহার কর্ম্মভার তাহারই হাতে তুলিয়া দিয়া যেন বিশ্রাম লইতেছে। টেবিলের সম্মুখে বসিয়া মাথাটা টেবিলের উপরে রাখিয়া ছায়া কত কিই ভাবিতেছিল। হঠাৎ ফুলমণি আসিয়া বলিল, আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল দিদি।

কে?

একটা কন্‌স্টেব্‌ল।

তারপর?

দারোগা ছেড়ে দিলে। আমি বললাম, নিয়ে যা না জেলে। নিলে না।

জেলে তুই যাবি কেন এখনই? এখনও কত কাজ বাকি যে!

যাব, যাব দিদি, আমিও জেলে যাব। নতুন বাবুটা যে দুটা বছর কি ক'রে জেলে থাকবে, সে মনে হ'লেই আমার কান্না পায়। ফুলমণি চোখে আঁচল দিল।

ছায়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল, একি রে ফুলমণি, কাদছিস যে তুই?

বদলু বলিল, ওর ঐ রকম দিদি। নতুন বাবুর একটু কিছুতেই ফুলমণি কেঁদে অস্থির হয়।

ছায়া কিছুই বুঝিল না। বলিল, কি রে ফুলমণি, অমন ক'রে কাঁদে বুঝি, ছিঃ!

না দিদি, তুই তো জানিস না, নতুন বাবুটা আমাকে কত ভালবাসত!—বলিয়া সে ছুটিয়া ছায়ার নিকট হইতে পলাইয়া গেল।

ছায়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে ফুলমণির গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল। ব্যথাভরা একটা রুদ্ধ নিশ্বাস তাহার বুক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩৫

ভারতবর্ষের ঐ ম্যাপখানা নাও দেখি, ছায়া।—বলিয়া দীপক সম্মুখে বইয়ের আলমারির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

ছায়া উঠিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট ম্যাপখানা লইয়া আসিয়া পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করিল।

দীপক ম্যাপের উপর একটি বার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, হ্যাঁ, পেয়েছি। দেখ, তোমাকে যা বলছিলাম—

কই দেখি, আর কোন্ কোন্ প্রদেশে চায়ের চাষ হয়?

ভারতবর্ষের মানচিত্রে কতকগুলি মসিলিপ্ত স্থানের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দীপক বলিতে লাগিল, এই দেখ, এই সব জায়গা-গুলোতেই চায়ের চাষ হয়। আসাম উপত্যকার প্রায় সবটাই, সুরমা উপত্যকারও অনেকটা; তা ছাড়া বাংলা দেশে হয় দার্জ্জিলিঙের নিকটে—যাকে বলে ডুয়ার্স, চট্টগ্রামেও কিছু কিছু হয়। বিহার প্রদেশে ছোট নাগপুরে হয় কিছু, পাঞ্জাবে কাংড়া ভ্যালিতে হয় সামান্য। যুক্তপ্রদেশে দেরাদুনেও কতক হয়, আর হয় মাদ্রাজে।

আসামের পরেই মাদ্রাজে যেন বেশি হয় দেখছি?—বলিয়া ছায়া ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। বলিল, মাদ্রাজে, মালাবার কোস্টে, কোয়েম্বেটুর আর আন্নামালাইয়েও হয় দেখছি। কিন্তু প্ল্যাণ্টেশন বলতে কফি এবং রবারও আছে তো?

তা আছে বইকি। এই দেখ না, মালাবার, কুর্গ প্রভৃতি স্থান ছাড়া আসামে লুসাই পাহাড়েও কিছু কিছু হয়।

এর সবই কি বিদেশীদের হাতে?

প্রায় সবই। আসাম এবং উত্তর-ভারতে তো প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ। মাদ্রাজের তো প্রায় সবটুকুই। তা ছাড়া ভারতীয়দের হাতে বাগানের সংখ্যাও যেমন কম, আয়তনেও সেগুলো তেমনই ছোট।

কিন্তু এই গোটা ইণ্ডাস্ট্রিটা অমন ক'রে বিদেশীদেব হাতে গেল কি ক'রে?

দীপক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কোন্ ইণ্ডাস্ট্রিটাই বা তোমাদের হাতে আছে যে, চায়ের কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছ? যে দেশের আদর্শ—পায়ের ওপর পা তুলে খাওয়া, সে দেশে পরদেশীদের হাতেই যে ধনোৎপাদনের মূল উৎসগুলো থাকবে, এই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু দীপকদা, আমি বিস্মিত হই এই ভেবে যে, চা-বাগান করতে গিয়ে একটা সমগ্র প্রদেশের ভূস্বামী হয়ে গেল ঐ ইউরোপীয় বণিকের দল, অথচ আমাদের দেশবাসীরা এদিকে একবারও ফিরে তাকালে না! একটুও অনুভব কবলে না যে, তিলে তিলে সব মাটি স'রে যাচ্ছে তাদের পায়ের তলা থেকে যার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে পতন ও মৃত্যু কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল, দীপকদা?

কি ক'রে সম্ভব হ'ল তাই বলছি, শোন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরেজরা এদেশে একটা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার সফলতার দিকে যতই

এগিয়ে যেতে লাগল, ততই তাদের দেশের অতিরিক্ত জন-সংখ্যার জন্য এ দেশে কোন উপনিবেশ স্থাপন করা চলে কি না, তাও দেখতে লাগল। তখনই তারা দেশের শীতপ্রধান সব উঁচু উঁচু স্থানগুলো বেছে নিতে আরম্ভ করলে। কিন্তু কেবল ঘরবাড়ি তৈরি করলেই তো চলবে না, আহারেরও সংস্থান করা চাই। এ দেশটা হ'ল কৃষিপ্রধান, কাজেই কৃষিজাতীয় কিছু করা চলে কি না, এই যখন তারা সন্ধান করতে লাগল, তখনই খোঁজ পেলে আসামের জঙ্গলে দেশীয় চাগাছের। বাস, আর যায় কোথা! কাজের লোক তারা, বড় বড় সব ফার্ম ক'রে, কোম্পানি ক'রে আসামের জঙ্গল কেটে বাগান তৈরি আরম্ভ করলে। ক্রমশ, আজ যা দেখছ, সমগ্র প্রদেশটাই গিলে ফেলেছে।

কিন্তু এ দেশে স্থায়ীভাবে বসতি করার ধারণা তো ইংরেজরা ত্যাগ করেছে ব'লে জানি।

তা বটে। শেষ পর্য্যন্ত কমিশন বসিয়ে যখন তারা দেখলে, উপনিবেশ স্থাপন করার পক্ষে বহুপ্রকারের বিঘ্ন বর্ত্তমান, তখন তা একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলে, এমন কি আইন ক'রে তা নিষেধ ক'রে দিলে।

কিন্তু আসামের বাগানে দেশীয় চাগাছের খোঁজ পাওয়া যায় তো প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

হ্যাঁ, ঐ রকম একটা সময়েই হবে।

বেশ, তা হ'লে এই যে প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে আর অজস্র টাকা ঢেলে ইউরোপীয় প্ল্যাণ্টাররা একটা ইণ্ডাস্ট্রি গ'ড়ে তুলেছে, এর ওপর আপনারা একটা দাবি জানালেই কি তারা সেটা মেনে নেবে?

স্বেচ্ছায় নেবে না তো।

তা হ'লে বলুন যে, আপনারা বলপ্রয়োগে তাদের দেশছাড়া

করবেন? নইলে কুলিদের পক্ষ থেকে আপনাদের দাবির যে ফিরিস্তি দেখেছি, তাতে তো বাগানগুলোকে সব প্রায় সরকারী সম্পত্তি ব'লেই ধ'রে নেওয়া হয়েছে।

সে তুমি যাই বল না কেন ছায়া, আমাদের এই হ'ল সর্ব্বনিম্ন দাবি। দাবি ক্রমশ আরও বেড়েই চলবে। এ না মেটালে আমরা ধর্ম্মঘট করবই। বিবিঞ্চির জেল থেকে ফিরে আসাবই যা অপেক্ষা। সে এলেই ভারতীয় চা-কর সমিতির সুরমা ভ্যালি শাখাকে চরমপত্র দোব।

কিন্তু যদি চরমপত্র অগ্রাহ্য হয়? আর হবেও, তা নিশ্চিত।

তা হ'লে ধর্ম্মঘটও নিশ্চিত ধ'রে নিতে পার।

কিন্তু এর ফলে নিঃসম্বল কুলিমজুরদের অবস্থা কি হবে, বুঝতে পারছেন তো? তাদের খাওয়া-পরার উপায় হবে কি? এ করতে গিয়ে বেচারীদের দুঃখকষ্টের বোঝা আরও বাড়িয়ে তুলবেন না যেন।

আমাদের সমিতির জরুরী ফাণ্ড কেন আছে তবে? আর একটা কথা মনে রেখো ছায়া, চা-বাগানের কুলিমজুর এবং অন্যান্য কল-কারখানার শ্রমিকের মধ্যে একটু বৈষম্য রয়েছে। কোন বাগানেই এমন অপর্য্যাপ্ত মজুর নেই, যাতে তারা কতকগুলো মজুরকে বাদ দিয়েই কাজ চালাতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেক জেলাতে আমাদের যে এক একখানা বাগান আছে, তার সবগুলোতে জড়িয়ে অন্তত দু তিনটে বাগানের কুলিদের কাজ দিতে পারব খুবই, অবশ্য যদি একান্তই প্রয়োজন হয়। এখন যত অবজ্ঞাই আমাদের করুক না কেন, একটি বার ধর্ম্মঘট আরম্ভ হ'লেই বেটাদের টনক নড়বে।

ধর্ম্মঘট না হয় হ'ল বুঝলাম। কিন্তু ১৯২০।২১ সালে প্রথম অসহযোগ-আন্দোলনের দিনেও তো এমনই ধর্ম্মঘট হয়েছিল, পরিণামে কুলিদের কি দুর্গতি হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।

সে ধর্ম্মঘটের শিক্ষাটা আমাদের রয়েছে ব'লেই আমরা সমস্ত চা-বাগানকে একই সময়ে ধর্ম্মঘট করতে বলব না। এক একটা জেলা বা কেন্দ্র ক'রে হাত দোব।

কিন্তু এর ফলে যদি আপনাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানটাই বে-আইনী ব'লে ঘোষিত হয়, আর আপনাদেরও আবার গ্রেপ্তার ক'বে নিয়ে যায়, তখন কি হবে শুনি?

সভা ভেঙে দেওয়া আর গ্রেপ্তাব ক'বে নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এ দেশে নতুন নয়, ছায়া। একবার তো ওরা সভা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু তার ফল আজ কি হয়েছে, বুঝতেই পারছ। এই কাজটা ক'বে ওরা আমাদের শক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রাণ পেয়েছে। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, মানুষ যখন তার আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, তখন ঐ ধরাধরি আর মারামারিতে কেউ যেমন ভয় পায় না, তেমনই এর গতিও কেউ প্রতিহত করতে পারে না। এও একটা স্রোতের মত। আজই হোক, কালই হোক, সে তার পথ ক'রে নেবেই। কাজেই, যদি আমাদের আবার গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়ই, জানবে, ঐ কুলিরাই তখন এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করবে। আর আমরা তো সেদিকে লক্ষ্য রেখেই চলেছি। আমরা শুধু হুকুম করব, আর কিছু না বুঝে শুনে সবাই তা মেনে চলবে—এ কিছুদিন বাদে ওরাও বরদাস্ত করবে না, আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়। কাজেই, ভুলেও যদি চা-করেরা আবার আমাদের আঘাত করে, দেখবে, কিছুদিনের মধ্যেই চা-কর সমিতি ঐ স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতই ভেসে যাবে।

কিন্তু তবুও যেন আমার কেমন লাগে, দীপকদা। আমার ইচ্ছে ওদের সঙ্গে একটা আপোষ-রফা চলে কি না, তারই চেষ্টা করা। একটু

একটু ক'রে আপনাদের দাবি ওদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিন। একসঙ্গে এত সব দাবি করলে ওরাই বা তা আপনাদের দিতে পারবে কেন? আর আপনাদের মজুরদেরও সে শিক্ষা এখনও হয় নি যে, সব সুবিধে হাতে পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করবে। ওরা নিশ্চয়ই তার অপব্যবহার করবে।

এ তোমার আত্ম-অবিশ্বাস ছায়া, আর ঐ শ্রমিকদের সঙ্ঘ-শক্তির প্রতি তোমার বিরুদ্ধ মতবাদের একটা অভিব্যক্তি। তোমার হাত দিয়েই তো সমস্ত লেখালেখি চলেছে। যদি আরও একটা চরম-পত্র দিতে চাও, আপত্তি নেই। আমাদের সব দাবিগুলো কিন্তু স্পষ্ট ক'রে লিখে জানিয়ে দিও। তবে তোমার ঐ চরমপত্রের জবাব যে কি আসবে, সে বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ। ধর্ম্মঘট অনিবার্য্য মনে ক'রে সব কাজ ক'রে যেও কিন্তু।

কিন্তু আমার মনে হয়, অন্তত কয়েকটা বিষয়ে ওরা কিছু নেমে আসতে রাজি হয়ে যাবে।

দীপক মৃদু হাসিল। বলিল, তুমি ও জাতকে জান না ছায়া। ওরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। এ দেশের লোকের জন্যে এদের কোন দরদ নেই। এরা চায় শ্রমিকদের প্রাণের বিনিময়েও অর্থ উপার্জ্জন করতে, আর করছেও সত্যিই তাই। কাজেই জেনো ছায়া, তোমদের সর্ত্ত ওরা নেহাৎ অনন্যোপায় না হ'লে মেনে নেবে না। এরা হ'ল সব দুর্য্যোধনের দল। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্র মেদিনী'।—বলিয়া আবার একটু হাসিল।

ছায়া বলিল, সে যাই হোক, আমি আরও একটা চরমপত্র দিয়ে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি।

তা দিতে পার।

দীপক এবং সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩৬

আজ রবিবার, ছুটি। দীপক মনীষাকে বলিল, চল, একটু ঘুরে আসি, ঘরে ব'সে যেন আর ভাল লাগছে না।

তাই চল।—বলিয়া মনীষা উঠিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে তখন টিলার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে পথে নামিয়া আসিল।

সকালবেলা, রৌদ্রে সাবাটা বাগান ভরিয়া গিযাছে ; তবে রাত্রিতে যে বৃষ্টির বিরাম ছিল না, তাহা পথের দিকে চোখ পড়িলেই বুঝা যায়। তাহারা চলিয়াছিল, কিন্তু কয়েক পা যাইতে না যাইতেই দেখিল, রামবাবু এবং ছায়া এদিকেই আসিতেছেন।

তাহাদের মুখামুখি দেখা হইল। মনীষা রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ কেমন আছেন, দাদামশায় ?

আজ অনেকটা ভাল আছি, দিদি। তাই তো বেরিয়েছি। তবে একটি অবলম্বন সঙ্গে না নিয়ে এখনও বেরুতে যেন সাহস হয় না।

তা দিদিমাকে নিয়ে বেরুলেই পারতেন !

উনি তো আর এখন অবলম্বন নন, একটা বোঝা হযে দাঁড়িয়েছেন যে !—বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মনীষাও মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, তাই বুঝি দিদিমাকে ছেড়ে এখন ছায়াকে অবলম্বন করেছেন। যাক, ছায়ার তা হ'লে আর কোন ভাবনা নেই। দাদামশায়কে কাঁধে ক'রেই বেড়াতে পারবে।

সকলে মিলিয়া তখন পথ চলিতে লাগিল উদ্দেশ্যহীনভাবে।

ছায়া বলিল, সিলেটের বাগানে কাকে পাঠাবেন, কিছু স্থির করেছেন, দীপকদা ?

অজয়কেই পাঠাব ভাবছি।

অজয়বাবু গেলে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু এতে শিলচর সেণ্টারের কাজের ক্ষতি হবে না তো?

না, আমি নিজেও তো আছি। সিলেটে একজন দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরই প্রয়োজন।

ওরাও তাই লিখেছে। কালও ওদের চিঠি পেয়েছি।

বেশ তো। অজয়কে আজই তৈরি হতে বলব। আমাদের সিলেটের বাগানের সম্পূর্ণ ভার তার ওপরেই থাকবে। তাকে কাল ভোরের এক্সপ্রেসেই পাঠিয়ে দোব। কেমন?

তাই ভাল।

ছায়া বলিল, কিন্তু অজয়বাবু সেখানে গিয়ে প্রথম থেকেই জরুরী ফাণ্ডের দিকে যেন বিশেষ মনযোগ দেন, এ কথাটা ভাল ক'রে ব'লে দেবেন কিন্তু। ঐ ফাণ্ডটাকে বাড়িয়ে তোলা চাইই চাই। শেষে যদি টাকার অভাবে কাজ পণ্ড হয়, ভাবী দুঃখের কারণ হবে, দীপকদা।

দীপক বলিল, ঐ ফাণ্ডে এখন পর্য্যন্ত কত টাকা জমেছে?

ঠিক সংখ্যাটা এখনও বলতে পারছি না। আজ বিকাল পর্য্যন্ত একটা হিসাব পাব। সর্দ্দারদের সব আজ বিকালেই আসবার কথা। তবে হাজার পঞ্চাশের বেশি হবে।

রামবাবু দুর্ব্বলতাবশত ক্লান্তি বোধ করিতেছিলেন। বলিলেন, চল দিদি, আজ আর বেশি হাঁটতে পারছি না। আচ্ছা দীপক, আমরা এখন আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আর এগুবেন না।—বলিয়া দীপক এবং মনীষা ফিরিল। রামবাবু এবং ছায়াও তাঁহাদের বাসার পথ ধরিলেন।

মনীষা মুখ ফিরাইয়া বলিল, ঠাকুরঝি, আজ বিকালে কিন্তু আসিস একবার।

আচ্ছা, যাব বউদি।—বলিয়া উভয়েই মুখ টিপিয়া একটু একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

মনীষা বলিল, তোমায় তো এতদিন বলি নি—

দীপক বিস্মিত নেত্রে স্ত্রীর প্রতি তাকাইয়া বলিল, কি কথা?

না, এমন কিছু নয়। ছায়া বিরিঞ্চিবাবুর জন্যে কেঁদে মরে, জান তো?

ছায়া বিরিঞ্চিকে খুবই ভালবাসে বুঝি?

নইলে তোমাদের এ কুলিদের নিয়ে বুঝি ছায়া প'ড়ে থাকত? আর তুমি লোক পেলে না? কোন্ কালে একটা মাস্টারি বা কিছু নিয়ে সে বাগান থেকে স'রে পড়ত।

তবে কি বলতে চাও, ছায়ার এসব কাজে কিছু মন নেই?

তা কেন? মন খুবই রয়েছে। তবে এ মনের পেছনে প্রেরণা যোগাচ্ছে বিরিঞ্চিবাবুর প্রতি ছায়ার ঐ আকর্ষণ।

কিন্তু বিরিঞ্চি কি বিয়ে করবে?

আমিও তাই ভাবি। বিরিঞ্চিবাবু পাথরের মানুষ।

সে কিছু মিথ্যে নয়। ওর বাইরে একটা পাথরের আবরণ, অথচ ভেতরে যে কি উঁচুদরের একটা প্রাণ আছে, সে সন্ধান তোমরা ঠিক পাও নি বুঝি?

সত্যি, তাকে বোঝা বড় কঠিন। আচ্ছা, ছায়ার কথা ঠাকুরপো তোমাকে কোন দিন কিছু বলেছে?

ওসব প্রেম-টেমের ধার সে ধারে না। সে বোঝে কাজ, আর তাই নিয়েই আছে। তবে ছায়ার কাজে সে খুবই সন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে বলত, আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিতা মেয়েদের এই ছায়ার কাছে থেকে শেখবার অনেক কিছু আছে। এমনই সব দু এক কথা।

আর কিছু ?

কোন দিন তার মুখ থেকে কিছু শুনি নি। তা ছাড়া বিরিঞ্চি স্বল্পভাষী লোক তো !

এখন আছেন কোন্ জেলে ?

সিলেট জেলে।

মনীষা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, আমার মাঝে মাঝে কেমন ভয় হয়, তোমাদেরও ধ'রে নিয়ে যাবে।

দীপক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভয় কিসের, মনীষা ? যেদিন জীবনে এ পথ বেছে নিয়েছি, সেদিনই জেলের ভয় তো দূরের কথা, প্রাণের ভয়কে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি।

থাক, তুমি ওসব কথা আমার সামনে আর ব'ল না।

দীপক এবং মনীষা আসিয়া তাহাদের কুঠিতে পৌছিল।

এদিকে ছায়া এবং রামবাবু আসিয়া তাহাদের বাসায় পৌছিলেন। রামবাবু একখানা ডেক-চেয়ারে বসিয়া আরাম করিতেছিলেন, ছায়া পাশে বসিয়া একটা হাত-পাখার সাহায্যে তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। একটু পরে উঠিয়া গিয়া এক বাটি গরম দুধ ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিয়া দাদুর মুখের কাছে দুধের বাটিটা ধরিলে রামবাবু অল্প অল্প চুমুকে দুধটুকু নিঃশেষ করিলেন এবং একটু জল খাইয়া মুখটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

একটা কুলি-মেয়ে আসিয়া গ্লাস ও বাটিটা উঠাইয়া লইয়া গেল।

রামবাবু ছায়াকে বলিলেন, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে দিদি।

ছায়া পাশে বসিয়া রামবাবুর শুভ্র কেশের ফাঁকে ফাঁকে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিল। রামবাবু অর্দ্ধনিমীলিত চোখে আরামটুকু উপভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, তোমাকে আজ একটি কথা জিজ্ঞেস করব, ছায়া।

রামবাবুর জিজ্ঞাসার ভাবে ছায়ার বুকের ভিতরটা ঢিপ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। দাদুর এমন কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে? কিন্তু একটু পরেই মনে মনে প্রশ্নটার মীমাংসা হইয়া গেল। একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কথাটাকে একটু হালকা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বলিল, এমন কি কথা, দাদু? ঐ জরুরী ফাণ্ডের কথা?

হ্যাঁ, কথাটা অনেকটা ঐ সম্বন্ধেই। আচ্ছা ছায়া, মানুষ মানুষকে ভালবাসে এ কিছু আশ্চয্য নয়, অসম্ভবও নয়। কিন্তু এই ভালবাসার কথা ভাবতে গিয়ে কেউ নিজের স্বাস্থ্যের দিকে পর্য্যন্ত অমনোযোগী হয়ে পড়বে, সেই বা কেমন কথা?

ছায়ার বুকটা আবার লাফাইয়া উঠিল। ছায়ার মুখে একটু হাসি ফুটিল। সে হাসিতে সৌন্দয্য আছে, কিন্তু প্রাণ নাই। ছায়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রামবাবু আবার বলিলেন, অমন ক'রে যদি ভেঙেই পড়তে হবে তো, এ পথে গেলেই বা কেন, দিদি?

কোথায় ভেঙে পড়েছি, দাদু? তোমার শুধু খামকা কথা। কি রকম খাটুনিটা পড়েছে, দেখছ না?

খামকা কথা আমার নয়। খামকা কথা তোমার, দিদি। খাটুনি তো আজও আছে, কালও ছিল। কিন্তু কই, তখন তো এমন ক'রে শুকিয়ে যাও নি? যদি শরীরটাকেই ঠিক রাখতে না পার তো, এতবড় দায়িত্ব বইবে কি ক'রে?

ছায়ার মনটা যেন এক অসহনীয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া অভিমানের কণ্ঠে বলিল, আমি তো এতে যেতে চাই নি, দাদু। তুমিই তো আমাকে এর ভেতরে টেনে নিলে। নইলে কে যেত ঐ সব ঝকমারি কাজে!—বলিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না, দাদুর কাঁধে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রামবাবু বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাহার চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। নাতনীর মাথায় মৃদু মৃদু হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, অমন করলে তো চলবে না, দিদি। আমিই তোমাকে এর ভেতরে টেনে নিয়েছিলাম সত্যি। কিন্তু ভাল ভেবেই তো নিয়েছি, দিদি। দাদু কি তোর কিছু অনিষ্ট করতে পারে রে, ছায়া? তুইই যে তোর দাদুর সর্ব্বস্ব, দিদি। তুই ছাড়া তার আর কেই বা আছে? কিন্তু দিদি, তোমাকে আরও শক্ত হতে হবে। তুমি বিরিঞ্চিকে ভালবেসেছ, এতে আমি খুশি বই অখুশি হই নি। তোমার ভালবাসা সৎপাত্রেই দান করেছ, আর তা তুমি করেছ ভাল ক'রে জেনে শুনেই। তাই তোমাকে আজ খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতেও কুণ্ঠিত হই নি। কিন্তু তোমার তো এই কথাটি ভুললে চলবে না দিদি যে, ভালবাসা যেখানে গভীর, বেদনাও সেখানে প্রচুর। এ বেদনায় ভেঙে পড়া তো চলে না। ভাবনা তোমার আসবে ঠিক, কিন্তু তোমরা যে কাজে নেমেছ, তার পুরস্কার তো সুখ-স্বচ্ছন্দতা নয়? এর পুরস্কার হবে অশেষ দুঃখ, আজীবন বেদনাভোগ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদের দুঃখ সইবার ক্ষমতা দিন।—রামবাবু আর যেন বলিতে পারিলেন না। তাঁহার গলাও ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি স্তব্ধভাবে বসিয়া ছায়ার মাথায় তেমনই হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ছায়ার বুকের পাঁজরে একটা ঝাঁকানি দিয়া একটা নিশ্বাস হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

৩৭

জীবনে দুইটি বছর আর এমন কিছু বেশি সময় নয়। কিন্তু যখন একটির পর একটি করিয়া দিনগুলিকে গুনিয়া গুনিয়া কাটাইতে হয়, তখন দুই বছর হইয়া উঠে যেন দুই শতাব্দী, আর দেহমন দুইই হইয়া উঠে কেমন ভারী ও অবসন্ন। একই লোকজন, একই চেনা মুখ, একই থালা-ঘটি, একই দেওয়াল-কোঠা, খাওয়া-পরা—তেমনই কারাপ্রাচীরে রুদ্ধ অদূরপ্রসারিত দৃষ্টি এমনই একঘেয়ে যে, একেবারেই অসহ্য। তদুপরি যখন ঐ একটানা দিনগুলিকে নিঃসঙ্গ এবং নিষ্কর্ম্মের ভিতর দিয়া কাটাইতে হয়, তখন কারাজীবন সত্যই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। তবে যারা একটি আদর্শের জন্য কারাগারে যায়, তারা ইস্পাতের মত মন লইয়াই জন্মায়।

বিরিঞ্চির কারাগৃহের দিনগুলিও প্রথমে ভারী হইয়া যেন বুকে চাপিয়া বসিতেছিল। যখনই মনে হইত সে বন্দী, মুক্তি তার স্বেচ্ছাধীন নয়, তখনই মন তার কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। কিন্তু কাল-প্রবাহে সবই সহিয়া যায়, বিরিঞ্চির মনও অবস্থাটা ক্রমশ সহ্য করিয়া লইল; কিন্তু পারিল না দেহটি। পেটের গোলমাল দেখা দিল।

জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে বিশিষ্ট কয়েদী বলিয়া গণ্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিরিঞ্চি নিজেই বিশেষ সুবিধা সব প্রত্যাখ্যান করিল। জেলে আসিয়া সাধারণ কয়েদী-জীবনের অভিজ্ঞতাই যদি না হইল তো,

কারাবাসের এই সুদীর্ঘ দুইটি বৎসব যে একেবারেই বৃথা হইয়া যাইবে। না ছাড়া জেলে আসিয়াও যদি কৌলীন্যই বজায় রাখিতে হয় তো, বাহিবে মানুষের সমান অধিকারের কথা বলিয়াই বা লাভ কি? বিরিঞ্চি কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত থাকিলেও তাহার অতীত অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান অবস্থাতে বিশেষ কোন কাজে লাগিল না। একে পেটের পীড়া, তা ছাড়া রাত্রিতে শয়নকালে কর্ণকুহরে মশকের গুঞ্জনধ্বনি এবং পৃষ্ঠদেশে ছারপোকার দংশনজ্বালা প্রভৃতি সমস্ত রকম উৎপাতে মিলিয়া তাহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। তাহার অটুট স্বাস্থ্য ক্রমশই ভাঙিয়া পড়িল, দেহের ওজন হ্রাস পাইতে লাগিল। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে তখন হাসপাতালে স্থানান্তরিত কবাই স্থির করিলেন।

শ্রীহট্টের কারাগার। হাসপাতালে দ্বিতলের পূর্ব্বদিকের কক্ষটি তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এখন বিছানায় শুইয়া শুইয়া বই পড়াই তাহাব প্রধান কাজ দাঁড়াইল। দ্বিতীয় হইল, পার্শ্বেব জানালাপথে উন্মুক্ত আকাশপানে চাহিয়া থাকা। সম্মুখে পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে দুই চারিটা চিল শকুনি খাদ্য অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকিত, আবার কখনও বা ভ্রাম্যমান শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি আকাশের গায়ে ইতস্তত বিচরণ করিত। এমনই একটা কিছুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে ভাবঘোরে তন্ময় হইয়া যাইত। নিত্যই দেখিত, একই স্থানে একজোড়া টিকটিকি দেওয়ালের গায়ে বসিয়া থাকিয়া তাহাদের খাদ্য আহরণের অপেক্ষায় আছে।

এত সব চিত্রই সে দেখিত, আরও দেখিত তাহার গত জীবনের দিনগুলি। বাল্যে মাতৃহীন সে, পিতা এবং দাসী-চাকরের কোলে মানুষ। শেষে পিতাও গেলেন, কলেজের পাঠও সাঙ্গ হইল। সেও বাহির হইয়া পড়িল ইউরোপ ভ্রমণে। তারপর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন

এবং সর্ব্বশেষ আসামের চা-বাগানে কুলিমজুর, দীপক, রামলোচনবাবু ও ছায়া। কিন্তু তার সব বিচ্ছিন্ন চিন্তা যে কখন ছায়াকে ঘিরিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া যাইত, বিরিঞ্চি টেরও পাইত না। কেমন যেন একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ, একটা অনির্দ্দিষ্ট অভাব সে অনুভব করিত। ছায়ার সুন্দর মুখখানি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এ মুখখানা ভাবিতেও যেন কেমন ভাল লাগে। এই নিঃসঙ্গ একা জীবনে সেই মুখখানা যেন অনেক সময়েই সঙ্গীহীনতার অভাব দূর করিয়া দেয়। ছায়ার কর্ম্মনিপুণতা, সেবাবৃত্তি, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, আরও কত কিছু দৈনন্দিন চিত্র যাহা তাহার অবসরহীন জীবনে সে ভাল করিয়া দেখিবারও সুযোগ পায় নাই, আজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভাবিতে সে কত ভালবাসে! বিশেষত শিলচরের সেই দিনগুলি তাহার প্রাণে কেমন পুলক জাগায়!

কিন্তু একটা মোহাবিষ্ট ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে, এই কি ঠিক? একই প্রতিষ্ঠানে ছায়া তাহার সহকর্ম্মী মাত্র। তাহার সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করা কি তাহার উচিত? এ দুর্ব্বলতা তাহার কেন? কুলিমজুর দীন-দরিদ্রের তরে উৎসর্গীকৃত জীবনে নারীর স্থান কোথায়? তাহার পক্ষে একটি সহকর্ম্মীর কথা ভাবিতে গিয়া মোহাবিষ্ট হওয়া কেবল অন্যায়ই নহে, পাপ। শেষটায় কি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া সে নিজেকে ডুবাইবে? যদি জীবনে আদর্শভ্রষ্টই হইতে হয় তো, তার চাইতে মৃত্যুই যে শ্রেয়। এমনই করিয়াই তাহার অবসরপ্রাপ্ত দিনগুলি কাটিতেছিল।

সাধারণ কয়েদীরা তাহার কামরার সামনেও বড় একটা আসিত না। তাহারা জানিত, এই বাবুটি একটি স্বদেশী কয়েদী। একটি মাত্র বিহারী কয়েদীকে সে তাহার সেবকরূপে পাইয়াছিল। সে

আসিলে যেন বিরিঞ্চি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। তাহার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া নানা গল্পগুজবে নিজের চিন্তাভাবাক্রান্ত মনকে হালকা করিয়া রাখিত।

এই বিহারী কয়েদীটির নাম চামারিয়া।

একদিন বিরিঞ্চি চামারিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর জেল হ'ল কেন রে, চামারিয়া?

চামারিয়া একটা ব্যথাভরা নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু এ কয়দিনে সে এই বাবুটিকে যেন চিনিয়াছে। এই বাবুটির কণ্ঠে যেমন একটি সহানুভূতির সুর, তাহা জেলে কেন, বাহিরেও অনেকের কাছে সে পায় নাই। চামারিয়া বিরিঞ্চির খাটের পাশে মেঝেতে বসিয়া পড়িল। বলিল, বলছি শুনুন, বাবু। আমি বাগিচার কুলি ছিলাম।

বিরিঞ্চি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বাগানে?

আসামে তারাপুর বাগানের নাম শুনেছেন, বাবু?

শুনেছি, তুমি ব'লে যাও।

আগে আমাদের গিম্মিট (agreement) দিতে হ'ত, জানেন?

হ্যাঁ জানি, তুমি বল।

গিম্মিট যখন উঠে গেল, তখন বাগানের ম্যানেজার অনেক নতুন ফাঁদের সৃষ্টি করল।

সে কি রকম?

আমাদের দশ বারোটা টাকা আগাম দিয়ে দিত। বুঝতেই পাবেন বাবু, আমরা কুলিমজুর, অভাবের আমাদের অন্ত নেই। এমনই হাতের কাছে টাকা এগিয়ে দিলে আমরা তা না নিয়ে পারি কি? আমরা তো আর আপনাদের মত অমন ভাগ্যবান নই, বাবু।

বিরিঞ্চি একটু হাসিয়া বলিল, জেল-খাটাটা কি খুবই ভাগ্যের লক্ষণ নাকি রে?

তবুও বাবু, আমাদের সঙ্গে আপনাদের কি তুলনা হয়? আর বাবু তো কিছু চুরি-ডাকাতি করেন নি? বাবু তো নাকি স্বদেশী কয়েদী?

বিরিঞ্চি বলিল, তোমাদের এ সংবাদ কে দিলে?

শুনেছি, বাবু।

আচ্ছা যাক। এখন বল দেখি তোমার কথা।

এই আগাম টাকাটার সর্ত্ত এই যে, টাকা না দিতে পারলে খেটে দিতে হবে। অথচ বাবু, একটি বার এতগুলি টাকা নিলে বাগানের রোজগার থেকে বাঁচিযে কাঁচা টাকা ফেরত দেয় কার সাধ্য? ফলে বেগার খাটতেই হয়। কিন্তু সে যাক। শেষে ক্রমশ আসামের বাগান আর আমার ভাল লাগল না। আমি ছেড়ে চ'লে এলুম।

টাকা ফেরত দিলে না?

না বাবু, টাকা আর ফেরত দিই নি। আপনার কাছে আজ আর মিথ্যে বলব না। টাকা না দিয়েই চ'লে এলুম।

তাতেই কি জেল হয়েছে?

না বাবু, ঠিক তাতে নয়।

তবে?

ঐ টাকা নিয়ে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আমি বাগান থেকে পালিয়ে এসে গৌহাটি শহরের পাশে একখানা জায়গা নিয়ে ক্ষেতি করেছিলাম। আমার খোঁজ পেয়ে বাগানের একটা সর্দ্দার সর্ব্বদা এসে বিরক্ত করত। একদিন আমি বাড়ি ছিলাম না। ক্ষেতি করতে গেছি, আর সর্দ্দার এসে আমার বউকে গালাগালি করতে লাগল। তখন দুপুরবেলা। ক্ষেত থেকে ফিরেছি, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। ঘরে তখন বসতে না বসতেই দেখি, সর্দ্দার এসে হাজির। বউ তখন বললে যে, সর্দ্দার তাকে যা ইচ্ছে তা গালাগালি করেছে। সর্দ্দার তখন আমাকেও একটা গালি

দিলে। বললে, টাকা ফিরিয়ে দে, নয়তো তোর বউকে ধ'রে নিয়ে যাব। আমার মাথায় খুন চেপে গেল। পাশেই পাচনবাড়িটা প'ড়ে ছিল। উঠিয়ে নিয়ে দিলাম বাবু, এক ঘা বসিয়ে বেটার মাথায়। ব্যাস, তার পরেই দু বছরের ম্যাদ হয়ে গেল।—বলিতে বলিতে লোকটা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বিরিঞ্চি প্রশ্ন করিল, এখন তোমার বউ ছেলে মেয়ে আছে কোথায়, জান?

আমার বাড়িতেই আছে।—বলিয়াই কি যেন সে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিল এবং একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া গেল।

বিরিঞ্চিও ভাবনায় ডুবিল।

৩৮

জেল-প্রত্যাগত বিরিঞ্চি এবং ভুলুয়া বাগানে আসিতেছে। কল্যাণপুরে আজ সকলের মুখে ঐ একই কথা। দীপক নিজে গাড়ি লইয়া জেল-ফটকে উপস্থিত ছিল। বাগানে আসিবার পথে স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বাগানের বহু কুলি মোটর আটকাইয়া তাহাদের নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল। ক্রমশ মোটরখানা আসিয়া কল্যাণপুর বাগানের পথে নামিতেই শত শত কুলি ছেলে মেয়ে যুবক বৃদ্ধ সমবেত কণ্ঠে 'নতুন বাবুকি জয়' বলিয়া আনন্দধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল; এবং এক অদম্য উৎসাহে তাহাদের লইয়া সারাটা বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইল। এমনই একটা উত্তেজনা, উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে সারাটা দিন অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যার পর আবার সেই চিরপরিচিত সান্ধ্য বৈঠক বসিবার কথা। লেবার ইউনিয়নের যা কিছু কাগজপত্র সবই ছায়াকে ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে এবং এই তুই বৎসর কি ভাবে কাজ চলিয়াছে তার সব কিছুই বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলিতে হইবে। তবেই ছায়ার মুক্তি। এই ঝকমারি কাজে ছায়া নিজেকে বিলাইয়া দিতে যেন আর পারে না।

বৈঠকের আজ আবার একটু নতনত্ব আছে। ছেলেদের স্কুলঘরে আজ বৈঠক বসিবে। কুলি-সর্দ্দারদের অনেকেরই আজ বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা।

ছায়া চেয়ারে বসিয়া অনেকগুলি কাগজপত্র সম্মুখে লইয়া কি সব লিখিতেছিল। ফুলমণি দরজার চৌকাঠের একপাশে বসিয়া তার ছেলেটাকে মাই খাওয়াইতেছিল। মাস ছয় হইল, ফুলমণির একটা ছেলে জন্মিয়াছে। ফুলমণি হঠাৎ কি ভাবিয়া খুশি হইয়া বলিল, দিদি আজ আমার বড় খুশি লাগছে, নতুন বাবু এসেছে। নতুন বাবুটা আমায় কত ভালবাসে দিদি!

ছায়া ফুলমণির দিকে একটি বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আবার একখানা কাগজে কি লিখিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হইয়া গেল। একটু সময় কলমটা তেমনই ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া ফুলমণিকে বলিল, ফুলমণি, নতুন বাবু তোকে কি বলত রে?

ফুলমণি বলিল, কই, কিছু বলত না তো! কিন্তু সত্যি খুব ভালবাসত দিদিমণি। দেখ নি দিদি, ঐ নতুন বাবুটা না এলে কি বাগানের এমনই ভাল হ'ত, না কি বদলুটাই অত ভাল হয়ে যেত? তোমার বুঝি মনে নেই, ঐ বদলুটা মাতলামি ক'রে নতুন বাবুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল?

ছায়া ব্যথিত হইল। বলিল, বদলু তো এখন খুবই ভাল হয়ে গেছে রে, ফুলমণি। এখন তো সে একজন ভাল কর্ম্মী।

কিন্তু ওকে ভাল করেছে কে, দিদি? ঐ ছোটবাবু না এলে কি ওর স্বভাব বদলাত? আমাকে কেবলই মারধোর করত।

হুঁ।—বলিয়া ছায়া আবার যেন অন্যমনস্ক হইল। আজ ক্ষণে ক্ষণেই কেমন যেন একটা আনন্দমিশ্রিত বেদনায় তাহার বুকটা ভরিয়া উঠিতেছে। কেমন যেন একটা শঙ্কার ভাব। একবার মনে হয়, আজকের বৈঠকে না আসিলেই যেন ভাল ছিল। অথচ না আসিয়াও যে উপায় নাই। সমস্ত কাজের চাপই তো তার উপরে রহিয়াছে। বিরিঞ্চিকে আজ সমঝাইয়া দিলেই তার নিষ্কৃতি। ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া যখন দেখিল, ছটা বাজে প্রায়, তখনই তাহার বুকের ভিতরটা আবার কেমন ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। মিস্টার রায় হয়তো আসিয়া উপস্থিত হইবেন এখনই। কেমন একটা দোলায়মান অবস্থায় যেন সময়টা কাটিতে লাগিল।

হঠাৎ ফুলমণিটা ছেলে কোলে লাফাইয়া উঠিল, বলিল, নতুন বাবু আসছেন, দিদি।

ছায়ার হৃৎপিণ্ডটা যেন দপ দপ করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

বিরিঞ্চি স্কুলঘরের দরজায় আসিতেই ফুলমণি ছেলেটাকে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল।

বিরিঞ্চি ফুলমণিকে দেখিয়া বলিল, কেমন আছিস, ফুলমণি? বদলু আর মারে না তো? এ কার ছেলে রে?

ফুলমণি লজ্জায় মরিয়া যাইয়া মুখ নোয়াইয়া বলিল, আমারই, বাবুজি।

বিরিঞ্চি তখন ছেলেটাকে একটু আদর করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া

ছায়ার প্রতি তাকাইয়া বলিল, এই যে মিস দত্ত, একেবারে আগেই এসে সব কাগজপত্র নিয়ে ব'সে আছেন দেখছি! তা আপনার ওপর কাজেরও যা চাপ পড়েছে! আপনি বাগানে না থাকলে কি ক'রে যে এত সব কাজ চলত!

দুপুরবেলা বিরিঞ্চি যখন বাগানে পৌছিয়াছিল, তখন কাহারও সঙ্গেই তেমন বেশি কিছু আলাপ-আলোচনা হইতে পারে নাই। শুধুমাত্র এই দীর্ঘ দিন অদর্শনের পর প্রীতি-নমস্কার বিনিময়ই হইয়াছিল।

যে নারীহৃদয় মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেও এক অজ্ঞাত শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন হঠাৎ এক অফুরন্ত আনন্দে পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিরিঞ্চির কথার সে কোন প্রত্যুত্তরই করিতে পারিল না। নিরুত্তরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বসুন।

বিরিঞ্চি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না না, আপনি ব'সে কাজ করুন। আমি বসছি।—বলিয়া পাশেই একটা টুল লইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, আপনার ওপর বোধ করি বা আমরা খুব অন্যায় করেছি?

ছায়া বলিল, কেন?

আপনি নেহাৎ বাধ্য হয়েই এ কাজে আটকা প'ড়ে আছেন কিনা। আমি যদি জেলে না যেতাম তো, আপনি নিশ্চিতই অতটা জড়িয়ে পড়তেন না। তা ছাড়া আপনার নিজের ভাবধারার সঙ্গে এ ঠিক খাপ খায় নি, এও আমরা জানি।

ছায়া কেমন যেন বিষণ্ণ হইল। বলিল, কিন্তু মানুষমাত্রেই কি আর নিজের পছন্দমত কাজ পায়?

পায় না সত্যি। তাই তো বলছি মিস দত্ত যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনকে কোন কাজে নিয়োজিত ক'রে রাখতে গেলে মনের সঙ্গে অবিরতই যুদ্ধ করতে হয়। তাই আমি অনেক সময় ভেবে অবাক হই যে, আপনি

এই রকম একনিষ্ঠভাবে কি ক'রে কুলিদের মধ্যে কাজ করতে পারছেন। আপনার ইচ্ছা-শক্তির প্রশংসা না ক'রে পারি না।

ছায়া কেমন লজ্জিত হইতেছিল। অথচ মিস্টার রায়কে থামানোও মুস্কিল। সে নিরুত্তরেই বসিয়া রহিল।

বিরিঞ্চি আবার বলিল, যাক, আমি যখন এসে পড়েছি, তখন আপনাকে বিশ্রাম দেওয়া চলবে।

ছায়া ভাবিল, বিশ্রাম? হ্যাঁ, বিশ্রামই সে চায়। কেন, কি জানি বুক ফাটিয়া এখন তাহার কান্না আসিতে চাহিল।

এমন সময় দীপক, রামবাবু এবং অনেকগুলি কুলি-সর্দ্দারে ঘরখানা প্রায় ভরিয়া উঠিল।

উপস্থিত সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর দীপক, শ্রমিক-ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করা যে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া দিল।

ব্রীজমোহন সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, কবে থেকে কাজ বন্ধ করতে হবে, বাবু?

পয়লা বৈশাখ কিম্বা তারই কাছাকাছি একটা দিন দেখে। তবে একটি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে, যাতে কাজ বন্ধ করার পর বাগানে কুলিদের মধ্যে কিম্বা অন্য কোথাও কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা না বাধে।

ব্রীজমোহন বলিল, না বাবু, সে দিকে আমরা খুব হুঁসিয়ার থাকব। আচ্ছা, নতুন বাবু থোড়া কিছু বলবেন না?

তখন বিরিঞ্চি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি নতুন ক'রে আজ আর কি বলব সর্দ্দারগণ? গত পাঁচ বছর তো অনবরত আমার কথা ব'লেই আসছি। তোমরা কাজ ক'রে যাও, ভগবান তোমাদের সহায় হবেন। তোমাদের এই কাজের ওপরেই আসামের কেন, সমগ্র

ভারতবর্ষের চা-শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আর দেশের ভবিষ্যৎও এরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

আরও অনেক আলাপ-আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

রামবাবু ছায়ার হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। বড়ই অন্যমনস্ক চিন্তান্বিত ভাব। এই ধর্ম্মঘটের ভবিষ্যৎ ফল যে কি হইবে, কে জানে? আবার যদি বিরিঞ্চি প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে, তখন? রামবাবু যেন আর ভাবিতেও পারিলেন না।

ছায়া বলিল, তুমি বড় ভাব দাদু, কেন অত ভাব বল দেখি? ওদের বাগান, ওরা যা খুশি করুক, তোমার অত ভাবনা কিসের?

রামবাবু কেমন একটা বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, কেন ভাবি জিজ্ঞেস করছিস, দিদি? জানিস তো, ওরা সাহেবের জাত। অত সহজে ওরা লেবার ইউনিয়নের দাবি মানতে রাজি হবে না। তা ছাড়া কুলিতে কুলিতেই একটা হাঙ্গামা বেধে যাওয়া বিচিত্র কি? যাক, ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই হবে।

ছায়াও নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল।

৩৯

ফিরিঙ্গিমারা বাগান। কুলিরা কোদালি-কাজে ব্যস্ত।

বুড়া এখন রোজই প্রায় ফাঁকি দেয়। এক কোপে কোদালের মুখে যে একখণ্ড মাটি উঠে, সেটুকুকে উল্টাইয়া ফেলিয়া সম্মুখের অকর্ষিত স্থানের যতটুকু সম্ভব ঢাকিয়া রাখিয়া আবার কোপ ধরে। এমনই করিয়া সে তাহার রোজকার ত্রিশ নল জমি কোদালি দিতে চেষ্টা করে।

কোনও দিন পাবে, কোনও দিন বা ফাঁকি ধরা পড়িয়া গালি তো খায়ই, দিনের রোজও পায় না।

কপালের ঘাম তর্জ্জনীর সাহায্যে মুছিয়া ফেলিয়া কোদালের বাঁটটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত বুড়া বলিল, আমার জন্যে বুঝি মেঘও নেই। বাঁশের বেত এবং পাতার সাহায্যে প্রস্তুত এক প্রকার ছোট ছাতা মাথাটাকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে বটে, কিন্তু ভাদ্রমাসের তালপাকানো রৌদ্রতাপ কুলিদের অনাবৃত পৃষ্ঠদেশকে জ্বালাইয়া তুলিয়া কালো মিশমিশে রঙকে যেন আরও কালো করিয়া তুলিয়াছে। এবং তাহারই উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়াইয়া পড়িয়া বৃদ্ধের কটিমাত্র বস্ত্রখণ্ডকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এই, হাঁ ক'রে কোদাল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে?—বলিয়াই টিলাবাবু বৃদ্ধের পিঠে একটা ধাক্কা মারিলেন এবং পাশেই সর্দ্দারের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, সর্দ্দার, আজ কিন্তু ত্রিশ নল ক'রে কোদালি হওয়া চাইই। নইলে এক বেটাকেও রোজ দোব না। ঐ বুড়োটা কিন্তু বড় ফাঁকিবাজ। আজও যেন ফাঁকি না দেয়, দেখিস কিন্তু সর্দ্দার। আর ঐ যে নতুন ছোঁড়াটা এসেছে, ওর দিকেও চোখ রাখিস।—বলিয়া টিলাবাবু অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

সর্দ্দার বলিল, তোরা সবই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে গেলি কেন? চালা, চপাচপ কোদালি চালা। শুনলি তো, বাবু কি ব'লে গেল?

বুড়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, বাবুর কি, ব'লেই খালাস। ত্রিশ নল কোদালি দেওয়া যেন তামাসার কথা আর কি! যে রোদ্দুর, এক কোপ দিলে আর কোপ ধরতে ইচ্ছে করে না। তেষ্টায় বুক ফেটে যেতে চায়। বলে কিনা ত্রিশ নল কোদালি না হ'লে রোজ কামাই হবে! এই ফিরিঙ্গিমারা বাগানেই চুল পাকালুম, কিন্তু একটা

দিনের তরেও সুখ পেলুম না। আজ যদি ছেলেটাও বেঁচে থাকত!—বলিয়া বৃদ্ধ চোখের জল আটকাইতে পারিল না। গালের পাশ দিয়া তর্জ্জনীটা ঘষিয়া আনিয়া বহিয়া পড়া ঘামের ফোঁটাগুলিকে মুছিয়া হাতটা ঝাড়িয়া ফেলিল।

নবাগত যুবকটি বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, রোজ মারা যাবে কি? যতটুকু কাজ করব, তার রোজও দেবে না?

না, তা দেবে না। তবে অর্দ্ধেক যদি বাবুকে আর সর্দ্দারকে দিয়ে দিতে রাজি হ'স তো রোজ লিখিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া বাবুদের যেমন খুশি মাপ লিখে নেয়। হয়তো কাজ করছিস পঁচিশ নল, লিখে দিলে কুড়ি নল; অথচ কথাটি বলবার জো নেই!

এ তো ভারী অন্যায় কথা! ঘুষ না দিলে বুঝি কোন কাজই হয় না? চার আনার অর্দ্ধেক দু আনা তা হ'লে ঘুষ দিতে হবে?

হ্যাঁ।—বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় কপালের ঘাম মুছিল। বলিল, নে, কাজ কর, দেখি, আরও কটা নল শেষ ক'রে উঠতে পারি কি না! দেখতে দেখতে দিনটা চ'লে যাবে। বৃদ্ধ কষ্টের সহিত মাটি কোপাইতে লাগিল। বয়স তাহার প্রায় সত্তরের কোঠায়, কিন্তু কাজ না করিলে যে খাবার জুটিবে না!

নবাগত যুবকটিও কাজে মন দিল।

একটু পরে অন্য একটি যুবক তাহার কোদালটা রাখিয়া নবাগতের নিকটে আসিয়া বলিল, এই, বিড়ি আছে? গলাটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে রে।

আছে। সত্যি, আজ যা গরম পড়েছে!

দে না ভাই, একটা?

দিচ্ছি।—বলিয়া নবাগত যুবক ট্যাঁক হইতে খুলিয়া একটা বিড়ি তাহার হাতে দিল এবং নিজের অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িটি কানের পাশ হইতে হাতে লইয়া চাগাছের ফাঁকের ছায়ায় বসিয়া পড়িল এবং দিয়াশলাই জ্বালিযা উভয়ে বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিল। এই নবাগত যুবক পূর্ব্বপরিচিত বদলু।

বদলু বলিল, হারে স্থন্দর ভাইয়া, ত্রিশ নল কোদালি না কবতে পারলে নাকি বোজই দেবে না ?

না, দেবে না।

কিন্তু এই রোদে ত্রিশ নল কাজ করা কি সোজা কথা ? বাবুটাকে একবার বললে হয়, তুটা কোপ দিযে দেখুক মজাটা।

স্থন্দর জিভ কাটিয়া বলিল, সর্ব্বনাশ, ওসব কথা বলতে যাস নি ভাই। তুই নতুন এসেছিস, জানিস না কাণ্ডকারখানা। বাবুকে এ কথা বললে রোজ তো মিলবে নাই, বরং তু এক ঘা চড় থাপ্পড়ও খেতে পারিস।

ইস, আর আমাদের বুঝি হাত নেই ? আমিও কোদালের গোড়া দিয়ে এমনই এক ঘা লাগাব যে, বাবুকে আর উঠতে হবে না। আচ্ছা, সবাই মিলে একদিন গিয়ে বলি চল যে, কুড়ি নলের বেশি কিছুতেই এক বোজে করতে পারি না।

সে হ'লে তো বেঁচেই যেতাম রে, বদলু ভাইয়া। সকাল থেকে আবম্ভ ক'রে সন্ধ্যে অবধি খেটেও কোন কোন দিন কাজ শেষ ক'রে উঠতে পারি না। তোর তো পুষ্যি নেই, মাত্র এক বউ আর ছোট্ট একটা ছেলে। আমার তো ভাই বিপদ। নিজে পাই চার আনা, বউও একটা ছেলে হয়ে তিন মাস ধ'রে আটকে প'ড়ে আছে, লাডকাটা পায় ছ পয়সা। কিন্তু খানেওয়ালা আমরা জনা সাত আট।

বদলু বলিল, চল, সবাই মিলে একদিন ম্যানেজারকে বলি যে, এখন থেকে আমরা কুড়ি নল কাজ ক'রেই চার আনা রোজ চাই।

কার ঘাড়ে কটা মাথা যে ম্যানেজারকে এ কথা বলে?

আমি বলব, তোরা সব আমার সঙ্গে থাকলেই হ'ল।

সুন্দর অবাক বিস্ময়ে বদলুর মুখের প্রতি তাকাইয়া ভাবিল, এ বলে কি, এর সাহস তো কম নয়? শেষে বলিল, বলিস কি তুই এসব? পাগল হয়েছিস? শেষে মার খেয়ে মরবি? এসেছিস মাত্র এই কদিন হ'ল। এরই মধ্যে ওসব করতে গেলে তোকে মেরে তাড়িয়ে দেবে কিন্তু।

নবাগত ভাবিল, কি দারুণ ভয় এদের প্রাণে! বলিল, বেশ তাড়িয়ে দিতে চায় তো, সবাই মিলে কাজ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকব। আর না হয় বাগান ছেড়ে চ'লে যাব?

তুমি একা না হয় গেলেই বা, কিন্তু আমার তো বাগান ছাড়াব উপায় নেই? মারই দিক আর যাই করুক, দুবেলা চারটি খেতে তো পারছি! দেশে তো তাও মিলবে না। আর কাজ বন্ধ তুমি আমি না হয় করলামই বা, কিন্তু আর সবাই যখন কাজে থেকে যাবে তখন তোমার আমার অবস্থাটা কি হবে, একবার ভেবে দেখেছ কি?

তা অত ভয় পেলে ভাই, আমাদের কিছু হবেও না। এক আধটু সাহস না থাকলে হয় কি ক'রে? গায়ের জোর তো আছেই রে, সঙ্গে একটু সাহস থাকলে কোন্ বেটা আমাদের কি করতে পারবে? একদিনে আমরা সব উলটপালট ক'রে দিতে পারি না?

থাক ভাই, এসব কথায় আমাদের কাজ নেই। সর্দ্দার এসব শুনতে পেলে মুস্কিলেই পড়তে হবে।—বলিয়া সে নিঃশেষিতপ্রায়

বিড়ির শেষ অংশটুকু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, দূরে সর্দ্দার একটা ছাতি মাথায় লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া কুলিদের কাজ দেখিতেছে।

উভয়েই তখন নিজ নিজ স্থানে যাইয়া আবার কোদালির আঘাতে বড় বড় মাটির টুকরা সব কাটিয়া উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল।

তখন রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে, সন্ধ্যাও ঘনাইয়া উঠে প্রায়। টিলাবাবু এবং এই দলের সর্দ্দার মিলিয়া প্রত্যেক কুলির কোদালি-করা জমি মাপিয়া লইতে লাগিলেন। কেহ কেহ তখনও তাড়াতাড়ি কোপের উপর কোপ ধরিয়া ত্রিশ নল কাজ পুরাইয়া লইতেছিল।

আজ শনিবার, সপ্তাহের হাজিরা মিলিবে। কুলিদের মুখে উৎসাহের চিহ্ন, আনন্দের হাসি। পয়সা এমনই বস্তু। টিকিট-ঘরে বিকাল হইতেই ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে, কাহার আগে কে লইবে!

বাগানে কুলিদের জনে জনে এত ভাঙানি পয়সা দেওয়া সময়-সাপেক্ষ বলিয়া সাপ্তাহিক বেতনের দিন কুলিদের নিজ নিজ পাওনা লিখিয়া একখানা টিকিট তাহাদের দেওয়া হয়। প্রত্যেক বাগানেই দুই এক জন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী খাদ্যসামগ্রী এবং ভাঙানি পয়সা লইয়া বসিয়া থাকে। ঐ টিকিটগুলির বিনিময়ে এবং টাকা প্রতি একটা কমিশন রাখিয়া কুলিদের নগদ পয়সা কিম্বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিয়া দেয়। পরে সমস্তগুলি টিকিট বাগানের অফিসে জমা করিয়া নিজের পয়সা আদায় করিয়া লয়।

৪০

বদলুও তাহার টিকিট ভাঙাইয়া খাদ্যসামগ্রী এবং নগদ একটি টাকা লইয়া ঘরে ফিরিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাগানের এক প্রান্তে সাত নম্বর কুলি-লাইনে তাহার নির্দিষ্ট কুঁড়েঘর। ঘরের মেঝেতে একখানা নলের তৈয়ারি চাটাই বিছানো। তাহারই উপরে সে এবং দুইটি কুলি বসিয়া বিশ্রামালাপে রত ছিল। এমন সময় কে আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

উপস্থিত যুবকত্রয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে ভুলুয়া সর্দার, এস। তোমার এত দেরি হ'ল যে ?

ভুলুয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া চাটাইয়ের একপাশে বসিয়া কহিল, আরও আগেই আসব ভাবছিলুম, কিন্তু সব বাগানে বাগানে এখন পাহারা ব'সে গেছে দেখছি।

বদলু বলিল, হ্যাঁ, তা আছে বটে। কিন্তু আমাদের কাজের কিছু ক্ষতি তাতে হবে না। আমরা যে কল্যাণপুর বাগান থেকে এসেছি, সে কেউ জানে না।

তোদের কাজ কতটুকু এগুল রে ?

অনেকটাই হয়ে এসেছে, তবে মাঝে মাঝে দুই একটা লোক বড় ভীতু, কিছুতেই এগুতে চায় না।

তা হোক, ক্রমশ সবাই আসবে।

এমন সময় আরও তিন চারিজন লোক আসিয়া এই কুঁড়েঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলেই কুলি, তবে একটা লোকের প্রতি এই আধ-আঁধারেও চোখ পড়ে। রোগা ছিপছিপে চেহারা, প্রকাণ্ড বড় একটা নাকের দুই পাশে দুইটা ছোট ছোট চোখ, মাথায়

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের রাশি। লোকটা দেখিতে বড়ই কদাকার। নাম লালু। সেই সর্ব্বাগ্রে ঘরে প্রবেশ করিল এবং তখন অন্য সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া সেই চাটাইয়ের উপরেই ঠেসাঠেসি করিয়া বসিয়া পড়িল।

বদলু তখন লালুকে ভুলুয়ার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। লালু বাগানের একটি ভাল কর্ম্মী এবং উৎসাহী যুবক। এই এক বছর হইল, সে একটা দলের সর্দ্দারেব কাজ পাইয়াছে। সে তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে, এবং তাহার সাহায্য ভিন্ন এই ফিবিঙ্গিমারা বাগানে কাজ করা অসম্ভব হইত।

বদলুর কথায় ভুলুয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমি জানি লালুকে।

বিস্মিত হইয়া বদলু বলিল, কি ক'রে তুমি জানলে? তুমি তো এই কদিন জেল থেকে বেরিয়েছ!

জেলে যাবাব আগেই আমি ওকে জানতুম। যাক ওসব কথা। এখন এক বাটি চা খাওয়া দেখি, বদলু।

বদলু সঙ্গীদের একজনকে চা প্রস্তুত করিতে বলিল।

ভুলুয়া লালুকে বলিল, লালু, তোমাদের বাগান নিয়েই প্রথম কাজ আরম্ভ হবে কিন্তু। আর খুব বেশি দিন তো হাতে নেই। এই আসছে বৈশাখ মাসে কিম্বা চৈত্রের শেষ বৃষ্টি যখনই হবে, তার কিছুদিন পর থেকেই। তোমরা জোর কাজ চালিয়ে যাও।

তুমি কিছু ভেব না সর্দ্দাব। তুমি দু বছর জেল খেটে এলে, আব আমরা এইটুকু করতে পারব না?

না রে লালু, তোরা এখনও বুঝিস নি। জেলে যাওয়া তো সোজা রে। বাইরে থেকে জেলে যাবার মানুষ তৈরি করাই তো সব-চেয়ে বড় কাজ।

তুমি কিছু ভেব না সর্দ্দার। কিন্তু নতুন বাবুর একদিন আসার কথা ছিল না? কই, বাবু তো এলেন না? এলে তাঁকে দেখাতে পারতুম, আমরা কতটুকু কি করেছি। আঃ, উনি তো বাবু নন, যেন দেবতা। লালুর চক্ষুর্দ্বয় যেন ছল ছল করিয়া উঠিল।

ভুলুয়া বলিল, বাবুও এসেছেন।

উপস্থিত সকলেই সমকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল। বলিল, বল কি? বাবুও এসেছেন? কই, কোথায় আছেন? বদলু যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

ভুলুয়া বলিল, তিনি কোথায় আছেন বলতে নিষেধ, তাই বলব না। আচ্ছা, চা আন দেখি। কি রে, হ'ল চা?

তখন দুইটা পিতলের গ্লাসে করিয়া পর পর একে একে চা পান শেষ করিয়া ভুলুয়া লালু এবং বদলুকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল। প্রত্যেকের হাতেই মোটা একটা বাঁশের লাঠি।

পাহাড়ের গা কাটিয়া একটা নূতন রাস্তা বাগানে তৈয়ারি হইতেছিল। অন্ধকার রাত্রি। অগণিত গ্রহনক্ষত্র পরিষ্কার নীল আকাশ ছাইয়া আছে। বন্য পথ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। তদুপরি বড় বড় মাটি এবং পাথরের ঢেলা সব তখনও রাস্তায় পড়িয়া থাকিয়া লোক-চলাচলের অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। তখনও সেই পথে কদাচিৎ লোক-চলাচল করে। ভুলুয়া এবং তাহার সঙ্গীদ্বয় এই পথেই অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিতেছিল। এমনই ভাবে কিছুদূর চলিয়া পথের একটা মোড় ঘুরিতেই তাহারা অদূরে ক্ষীণপ্রদীপ্ত একটি আলোর রেখা দেখিতে পাইল। দুই শত নম্বর কুলি-বস্তিটা ঐদিকেই গড়িয়া উঠিতেছে। কয়েকটি কুলি পরিবার ঐ কুলি-লাইনে ঘরবাড়ি প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

ভুলুয়া এবং সঙ্গীদ্বয় ক্ষীণ আলোক লক্ষ্য করিয়া যখন সেই নূতন বস্তিতে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি গভীর হইয়া গিয়াছে। সব কুলি-পরিবারই প্রায় সুপ্তিমগ্ন। একখানি মাত্র খড়ে ছাওয়া ছোট্ট ঘরে একটি কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। বস্তিতে পৌঁছিয়াই ভুলুয়া প্রথমে ঐ ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং একটু পরেই সঙ্গীদ্বয়কে ভিতরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিল। ঘরের মধ্যে দুইজন লোক একটা চাটাইয়ের উপরে বসিয়া আছে, অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তি একখানি ছোট চৌকির উপরে উপবিষ্ট। চাটাইয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় দুই হাঁটুর উপরে বাহুদ্বয় রক্ষা করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া বসিয়া তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কি সব আলোচনা করিতেছিল। চৌকিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি পূর্ব্বপরিচিত বিরিঞ্চি। বর্ত্তমানে লম্বা লম্বা শ্মশ্রু গজাইয়া মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বের সেই অটুট স্বাস্থ্যও যেন এখন আর নাই। ভুলুয়া সঙ্গীদ্বয়কে বিরিঞ্চির সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

বিরিঞ্চিকে দেখিতে পাইয়া আগন্তুক কুলিদ্বয় নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

বিরিঞ্চি তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া পূর্ব্ব আলোচনার সূত্রটি ধরিয়া বলিল, তোমরা তা হ'লে অনেকটা এগিয়েছ ব'লে মনে হয়?

না বাবু, খুব যে এগিয়েছি, তেমন বুঝি না। কয়েকটা লোক কিছুতেই সাহস পায় না।

কি বলে তারা?

তারা বলে যে, আর কিছু না হোক, এখন যে একটা স্থায়ী উপার্জ্জন হাতে আছে, সে নিশ্চয়তাটুকুও যদি না থাকে তো, ছেলেমেয়ে নিয়ে

ওরা দাঁড়াবে কোথায়? ওরা বলে, কাজ এক দিন কেন, এক মাস বন্ধ করতেও তারা রাজি, যদি ভবিষ্যতে ভাল হয়; কিন্তু বর্ত্তমানের প্রয়োজন কে মেটাবে? তা ছাড়া, বড় যারা, তারা না হয় দুদিন উপোস ক'রেও কাটালে; কিন্তু শিশুদের উপায়?

বিরিঞ্চি ভাবিল, উহারা কিছু মিথ্যে বলে নাই। বলিল, সর্দ্দার, আমরা সে চিন্তাও ক'রে রেখেছি। জান, কল্যাণপুর ভিন্ন আসামের প্রতি জেলাতেই আমরা অন্তত একটি ক'রে বাগান কিনছি?

তা তো জানি, বাবু।

যাদের হাতে কিছুই থাকবে না, যাদের কোন চাষবাসের জমিও নেই, কিম্বা কাঠ কেটেও যাদের উপার্জ্জন করবার ক্ষমতা নেই, তাদের আমরা কিছুদিনের জন্য না হয় ঐ সব বাগানে নিয়ে যাব। তোমাদের কেউ যাতে উপোস ক'রে দিন না কাটাও, সে চিন্তা ক'রেই তোমাদের এ কাজে নামতে বলেছি। বাগানে আজন্ম বাস ক'রে যত সামান্যই হোক, একটা নির্দ্দিষ্ট নিশ্চিত উপার্জ্জনের আশায় থেকে থেকে তোমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছ যে, এখন অনিশ্চয়তার কোন সম্ভাবনার কথা ভাবতেই তোমরা ভয় পাও, কিন্তু একটা কথা তোমাদের জানিয়ে দিই। তোমরা যদি বুঝে থাক যে, তোমাদের সকলকেই আমরা তোমাদের নিজ বাগান থেকে অন্য বাগানে নিয়ে গিয়ে কাজ দোব, তো সে তোমাদের নিতান্তই ভুল ধারণা। দীপকও তোমাদের এ কথা বলেছে। আর আমিও বলছি যে, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাগানে প্রতিষ্ঠিত থেকে, তোমাদের সব ন্যায্য অধিকার আদায় ক'রে নেবে, এই হবে তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেবল যারা বৃদ্ধ বা রুগ্ন কিম্বা অন্যভাবে কাজে অক্ষম, তাদেরই কেবল আমরা অন্য বাগানে নোব।

সে তো বুঝি বাবু, কিন্তু কি ভাবি জানেন, ধর্ম্মঘট করলে, হপ্তার শেষে আমরা একটা দুটো টাকা যা পাই, তাও না মারা যায়! তখন যে একেবারে উপোসে দিন কাটাতে হবে, বাবু।

তোমাদের এ চিন্তা খুবই স্বাভাবিক, অথচ এমনই চিন্তার হাত থেকে মুক্ত না হ'লেও তোমরা তোমাদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করতে পারবে না। তোমরা শুধু একটা কথাই বুঝতে চেষ্টা কর যে, তোমাদের ছেড়ে দিয়ে বাগানের কাজ একটি দিনও চলতে পারে না।

ভুলুয়া তখন বলিল, সে তো বাবু, কোন কারখানাও চলতে পারে না।

পারে নাই তো। তবে বাগানের কাজে এবং সাধারণ কল-কারখানার কাজের মধ্যে একটা প্রভেদ এই যে, মজুরেরা কারখানার কাজ বন্ধ রাখলে লাভের অংশে ক্ষতি হয়, কিন্তু কারখানার কলকব্জা-গুলোর নষ্ট হয়ে যাবার কোন ভয় থাকে না। অথচ বাগানের কাজ সময় বুঝে এক মাস না করলে সে বছর তো লাভ হবেই না, এমন কি সেই বাগানখানাই চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই মালিকদের কাছ থেকে তোমাদের সুখ-সুবিধা আদায় ক'রে নেওয়া যতটুকু সহজ, কারখানার মজুরদের পক্ষে ঠিক তত সহজ নয়। এবং সেই জন্যেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করলে কুলিমজুরেরা যা চায়, তাই তারা আদায় ক'রে নিতে পারে।

বিরিঞ্চির কথায় উপস্থিত কুলিরা সব উৎসাহিত হইল। বলিল, যা আপনারা বলবেন, তাই করতে আমরা রাজি আছি, বাবু।

বিরিঞ্চি আবার বলিতে লাগিল, আরও দেখ সর্দ্দারগণ, তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থার যদি কিছু পরিবর্ত্তন করতে হয় তো, সে করতে হবে তোমাদেরই। কেউ কাকেও মানুষ ক'রে দিতে পারে না, যদি না সে

নিজে মানুষ হতে চেষ্টা করে। তোমরাও যদি নিজেদের পথ নিজেরা পরিষ্কার করতে না চাও, কেউ তোমাদের এ নরককুণ্ড থেকে টেনে তুলতে পারবে না। আমরা কেবল তোমাদের সহায় হতে পারি মাত্র। ভেবে দেখ দেখি, তোমাদের কি আছে? তোমাদের পেটে অন্ন নেই, পরনে কাপড় নেই, বাসোপযোগী ঘরবাড়ি নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই; আছে কেবল অভাব, অনটন, অনাহার, অর্দ্ধাহার, অবিচার, অত্যাচার, আর আছে বুক-ফাটা হাহাকার। বিরিঞ্চি যেন নিজের কথায় নিজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

কুলি-সর্দ্দারগুলি বিরিঞ্চির শেষ কথা সব যেন হাঁ করিয়া গিলিতেছিল। বাগানে থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের চুল পাকিয়া গেল। কই, এমন করিয়া তো কেহ কোন দিন তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা বলে নাই!

ভুলুয়া বলিল, বাবু, রাত হ'ল কিন্তু অনেক, কল্যাণপুর পৌঁছতে রাত আর বড় থাকবে না।

হ্যাঁ, চল ভুলু। আচ্ছা, তবে আসি, সর্দ্দারগণ। আমি নিজে আর নাও আসতে পারি। কিন্তু কাজের বেলা পিছিয়ে গেলে তোমরা আর কোন দিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

ভুলুয়া আর বিরিঞ্চি ঘর হইতে বাহির হইয়া পথে নামিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৪১

ইণ্ডিয়ান প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন শ্রমিক-সঙ্ঘকে যে জবাব দিল, তাহার ফলে ধর্ম্মঘট অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

তাহারা কুলিদের নিম্নলিখিত দাবির একটিও মানিয়া লইতে রাজি হইল না।

১। (ক) প্রত্যেক পুরুষ শ্রমিককে প্রতি বৎসর বৈশাখের ১লা তারিখে দিতে হইবে—

২টি হাফ-প্যাণ্ট

২খানা ধুতি

২টি হাফ-শার্ট (একটা গরম)

২টি জামা (একটি গরম)

১খানা গায়ের চাদর

২খানা কম্বল

(খ) প্রত্যেক নারী শ্রমিকদেরও ঐ দিনই দিতে হইবে—

৪খানা শাড়ি

২টা শেমিজ (১টা গবম)

২টা ব্লাউজ (১টা গরম)

১খানা গায়ের চাদর

২খানা কম্বল

২। প্রত্যেক শ্রমিকের হাজিরা, ঠিকা কিম্বা চা-পাতি উঠানো প্রভৃতি অপর যে কোন কাজের মজুরির হার এমনই ভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যাহাতে দুই বেলায় দৈনিক মোট ৬ ঘণ্টা কাজের জন্য প্রতিটি শ্রমিক বারো আনার কম না পায়। এবং একটি শ্রমিক নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে

দৈনিক যত ঘণ্টা কাজ করিবে, ঘণ্টায় দুই আনা হিসাবে তত ঘণ্টার মজুরি তাহাকে দিতে হইবে।

৩। প্রতিটি বালক কিম্বা বালিকা শ্রমিক (১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) পাইবে পূর্ণবয়স্কদের অর্দ্ধেক। ষোল বৎসরের আরম্ভ হইতেই সে পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। প্রতি রবিবারে বাগানের কাজ বন্ধ থাকিবে, অগত্যা সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা কাজের পর অন্তত ২৪ ঘণ্টার ছুটি দিতে হইবে।

৫। প্রতি বাগানে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে; এবং ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক এবং বালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে। এই খরচা বহন করিবে বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা।

৬। প্রতি বাগানে একটি করিয়া ডাক্তারখানা, হাসপাতাল এবং একটা মেটার্নিটি-হোম রাখিতে হইবে।

৭। প্রতি ডাক্তারখানা এবং হাসপাতালের জন্য মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করা ডাক্তার এবং মেটার্নিটি-হোম, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য পাস করা নার্স রাখিতে হইবে।

৮। প্রতি বাগানে কলঘর, বিজলীঘর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শনের জন্য পাস করা এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করিতে হইবে।

৯। অতি তুচ্ছ ভুলের জন্য সমস্ত দিনের উপার্জ্জন কিছুতেই জরিমানাস্বরূপ বাজেয়াপ্ত করা চলিবে না; এবং কোন অবস্থাতেই উপার্জ্জনের অর্দ্ধেকের অধিক জরিমানা আদায় করা চলিবে না।

১০। চা-পাতি প্রভৃতি ওজন করার কালে মাপে কম বেশি লওয়া চলিবে না।

১১। প্রত্যেক নারী শ্রমিকের সন্তান জন্মিবার দুই মাস পূর্ব্ব হইতে দুই মাস পর অবধি সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাইবে; এবং বাগান হইতে মাসিক দশ টাকা হিসাবে ভাতা পাইবে।

১২। প্রত্যেক কুলি-পরিবারের জন্য টিনের চাল, পাকা ভিটা এবং দেওয়ালযুক্ত স্বাস্থ্যকর স্বতন্ত্র আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে; এবং প্রচুর পানীয় ও স্নানের জলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এবং স্যানিটারি পাইখানার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। পাইখানা কিম্বা আবাসগৃহ ব্যারাক সিস্টেমে প্রস্তুত করা চলিবে না।

১৩। প্রত্যেক শ্রমিককে বৎসরে এক মাসের ছুটি দিতে হইবে; এবং ছুটির প্রত্যেক দিনের জন্য দৈনিক আট আনা হিসাবে ভাতা দিতে হইবে।

১৪। আসামের চা-বাগানে আসা-যাওয়া, কাজ করা না-করা প্রভৃতি বিষয়ে চা-শ্রমিকদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হইবে; এবং এই কারণেই 'আসাম-লেবার-বোর্ড' নামীয় চা-মালিকদের প্রতিষ্ঠানটিকে তুলিয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া চা-শ্রমিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কঠোর আইন আজিও প্রচলিত রহিয়াছে, সেইগুলিকেও বাতিল করিয়া দিতে হইবে। এক কথায় ভারতবর্ষের অপরাপর কল-কারখানার কাজে শ্রমিকদের চলা-ফেরা, আসা-যাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মৌলিক অধিকার রহিয়াছে, তাহা চা-শ্রমিকদের বেলায়ও মানিয়া লইতে হইবে।

১৫। চা-বাগানে ক্ষেত খামার করিবার উপযোগী জমিকে বাগানের চা-শ্রমিকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে; এবং যতদিন পর্য্যন্ত কোন শ্রমিক সেই বাগানে কাজ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জমিটুকু কিম্বা তার ফসল তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

১৬। এদেশীয় কোন চা-বাগান কিম্বা তাহার কোন অংশ কিম্বা মূলধনের শেয়ার কোন বিদেশীয়দের কাছে বিক্রয় করা চলিবে না।

১৭। বাগান হইতে সরকারী কিম্বা বে-সরকারী যে কোনও প্রকারের মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের ঘাঁটি অপসারিত করিতে হইবে, এবং বাগানে দেশীয় প্রথায় মদ চুয়ানো কিম্বা মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে।

১৮। প্রতি বাগানে একটি করিয়া ছায়াচিত্রালয় রাখিতে হইবে। কিম্বা চলন্ত ছায়াচিত্রের সাহায্যে প্রতি রবিবার যাহাতে বাগানের শ্রমিকেরা একটি ছায়াচিত্র দেখিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং প্রতি বাগানে অন্তত এক সেট করিয়া রেডিও রাখিতে হইবে।

১৯। বাগানের এলাকার ভিতর দিয়া যে সব সরকারী কিম্বা আধা-সরকারী রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ চলাচলের অধিকার থাকিবে।

২০। বাগানের শ্রমিকদের বাহিরে গিয়া কিম্বা তাহাদের বস্তিতে ডাকিয়া আনিয়া যে কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশার অধিকার থাকিবে, এবং যে কোন জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া কিম্বা তাহার সভ্য হইবার অধিকার মানিয়া লইতে হইবে।

২১। ভারতীয় চা-বাগান শ্রমিক-সঙ্ঘকেই আমাদের সমগ্র চা-বাগান শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

২২। প্রতিটি চা-বাগান চালু হইবার দশ বৎসর পরেই শ্রমিক সঙ্ঘের ঐ বাগান কিম্বা তাহার অংশবিশেষ কিনিয়া লইবার অধিকার থাকিবে; এবং না কিনিয়া লইলেও ঐ বাগানের সর্ব্ব কর্তৃত্ব আপনা হইতেই শ্রমিক-সঙ্ঘের হাতে আসিয়া পড়িবে; এবং বাগানের ব্যয়িত মূলধন শ্রমিক-সঙ্ঘের ঋণমধ্যে পরিগণিত হইবে। উক্ত মূলধনের

উপরে বাৎসরিক শতকরা ৩½ ভাগ স্থদ ভিন্ন অন্য কোন মৌলিক অধিকার মালিকদের আর থাকিবে না।

উপরোক্ত দাবিগুলি তো অগ্রাহ্য হইলই, বরং তাহাদের জবাবে প্ল্যাণ্টার্স'রা একটু ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়িল না। বাগানের কুলিমজুরেরা কাজ বন্ধ করিয়া যাইবে কোথায়? আর গেলেও এই অগণিত মজুরের দল খাইবেই বা কি? আর এ তো আসামের পক্ষে কিছু নূতন নয়। দুই চারি দিন একটু আধটু হৈ চৈ, একটু গোলমাল গণ্ডগোল হইবে, ক্রমশ শেষে আপনা হইতেই ঐ সব মিলাইয়া যাইবে। আর নয়তো অগত্যা একদিন পুলিসের সাহেবকে সংবাদ দিয়া এক দল গুর্খা কিম্বা লুসাই সৈন্য আনিয়া লইলেই চলিবে।

শ্রমিক-সঙ্ঘের চিঠিখানা তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। একটি বার তাহারা ভাবিল না যে, কুলিমজুরের সুপ্ত আত্মা তাহাদেরই ঐ শতাব্দীব্যাপী স্বেচ্ছাচার এবং ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহারের ফলে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকদের ঐ জাগ্রত আত্মা তাহাদের অধিকার কি, সমাজে এবং রাষ্ট্রে তাহাদের স্থানই বা কোথায় ইত্যাদি জানিয়া লইতে চায়।

আরও দুই চারিটা বাগানে মাঝে মাঝে ধর্ম্মঘট হইয়া, শক্তি চেতনা এবং অর্গানাইজেশনের অভাবে ক্রমশ আপনা হইতে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু ঐগুলিই যে অলক্ষ্যে কুলিদের মধ্যে জাগরণের প্রেরণা যোগাইয়াছে, ইহা যেন প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না।

এই বৎসর চৈত্রের মধ্যভাগেই বৃষ্টি পড়িয়া যাওয়ায় চাগাছগুলিতে নূতন কুঁড়ি গজাইয়া অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আগেই সজীবতা লাভ করিল। অর্দ্ধটিত সবুজ পক্ষ্ম্লবরাজিতে রঙিন

বাগানগুলি হাসিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গিমারা বাগানের নবনিযুক্ত ম্যানেজার মিস্টার টমাস রোজই একবার করিয়া বাগান ঘুরিয়া আসেন। বাগানের কলকব্জাগুলিও নিজ নিজ কর্ম্মভার লইতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

৪২

এমনই সময়ে একদিন ফিরিঙ্গিমারা বাগানের কুলিরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া বসিল। সকাল সাতটাতেই ঢং ঢং করিয়া কুলিদের কাজে যাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু কই, একটি কুলিও আজ পথে বাহির হয় না। ৮টা বাজিল, ৯টা বাজিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রম হইতে চলিল, কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় ভেড়ার পালের মত পায়ে পা ফেলিয়া কেউ বা টুকরি মাথায়, কেউ বা ছাতা বগলে, কেউ বা ছেলে কোলে পথে নামিল না। অবসর বুঝিয়া কেউ বা আপন কুঁড়ে-ঘরের পৈঠায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল; কেউ বা পান চিবাইতে চিবাইতে লাঠিটা হাতে করিয়া অন্য লাইনে তাহার বন্ধুর গৃহে একটু বেড়াইয়া আসিতেই চলিল, আর কেহ কেহ পাঁঠা-ছাগল গরু-ভেড়া কিম্বা শূকরগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পথের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। কুলি-রমণীরা সব একত্র হইয়া জটলা পাকাইতে লাগিল।

বেলা নয়টা বাজিতেও যখন কেহই কাজে গেল না, সারা বাগানখানাই শান্ত স্তব্ধ ভাবে কর্ম্মব্যস্ততার অপেক্ষায় রহিল, তখন টিলাবাবু একটি বার কুলি-লাইনগুলি ঘুরিয়া গেল। কুলিরা তাহাকে বলিয়া দিল, সর্দ্দারকা হুকুম নেহি হ্যায়।

সর্দ্দারদিগকে প্রশ্ন করিলে তাহারা বলিল, হামলোগকা দাবি সব মান লিজিয়ে, তব কাম করেঙ্গে।

এমনই সব জবাব পাইয়া টিলাবাবু ম্যানেজারকে সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

ম্যানেজারও বুঝিলেন, সত্য সত্যই কুলিরা কাজ বন্ধ করিয়াছে। একবার ভাবিলেন, নিজে যাইয়া কুলিদের একটু শাসাইয়া দিলেই হয়তো তাহারা কাজে যোগ দিবে, কিন্তু এ অবস্থায় একা কুলিদের সম্মুখীন হওয়া সমীচীন বোধ করিলেন না। বর্ত্তমান অবস্থায় কুলিরা কতকটা উত্তেজিত থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই কোন কথা-কাটাকাটির ফলে যদি কুলিদের তিনি কিছু বলিয়াই ফেলেন, কিম্বা অভ্যাস-বশত একটা আঘাতই করিয়া বসেন তো, তাহার ফল বিপজ্জনক হইতে পারে। কাজেই টমাস আজ আর বাংলোর বাহির হইলেন না।

এমনই করিয়া এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিল। আর অপেক্ষা চলে না। চাগাছের নূতন কুঁড়িগুলি সব বেশি বড় হইয়া গেলে এই বছরের চা স্বাদে, গন্ধে এবং বর্ণে নিশ্চিতই নিকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং বাজারে সুনাম নষ্ট তো হইবেই, দরও পাওয়া যাইবে না।

তিনি শিলচরে যাইয়া ক্লাবে অন্যান্য সাহেবদের সঙ্গে কি সব পরামর্শ করিলেন।

কুলিরা তখনও বেশ শান্তভাবেই নিষ্কর্ম্মা দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। সর্দ্দারেরা দিনে একবার একত্রিত হইয়া কি সব সলা-পরামর্শ করে। তাহাদের পক্ষ হইতে ব্রীজমোহন প্রমুখ দুই এক জন প্রতিদিনই একবার করিয়া কল্যাণপুরে যায়। কি সব যুক্তি উপদেশ লইয়া ফিরিয়া আসে। এমনই করিয়াই দিনগুলি কাটে।

এক সপ্তাহ কাটিল, কুলিরা ঘরে বসিয়াই খাওয়া-পরার উপযোগী পয়সা পাইয়া গেল। টমাস অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এই বারের সিজনই বুঝি নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্রীজমোহন না হইলে টমাস সাহেবের চলিত না, এখন সেই ব্রীজমোহনের নাম শুনিলেই ম্যানেজার ক্ষেপিয়া উঠেন। অথচ তাহাকে না ডাকাইয়াই বা উপায় কি? এ তো আর এমন নয় যে, অন্য বাগান হইতে কুলি আমদানি করিয়া কাজ চালাইয়া লইবেন। এবং প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য লইয়া প্রতি বাগান হইতে দুই চারি জন কুলি আনিতে গেলেই তাহাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়ার খুবই সম্ভাবনা, তদুপরি এত লোকের স্থানই বা হইবে কোথায়? তা ছাড়া সকল বাগানেই এখন কাজের চাপ খুব বেশি।

অগত্যা টমাস একদিন সমস্ত সর্দ্দারদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, টোমলোগ কাম নেহি করওগে?

সর্দ্দারদের পক্ষ হইতে ব্রীজমোহন জবাব দিল, কেউ নেহি করেঙ্গে সাব? হামলোগ তো কাম করনেকো তৈরি হ্যায়। লেকিন আপলোগ হামলোগকো সব দাবি মান লিজিয়ে।

টমাসের লাল মুখ আরও লাল হইয়া একেবারে তামাটে হইয়া উঠিল। বলিলেন, টোমলোগকা দাবি ক্যা হ্যায়?

ব্রীজমোহন নিঃশব্দে হাতের মুঠা হইতে একখানা ছাপানো কাগজ বাহির করিয়া সাহেবের হাতে দিল।

সাহেব একবার সবটা পড়িয়া দেখিয়াই রাগে গট গট করিতে করিতে কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, আচ্ছা যাও, টোমলোগকো টামাসা দেখাতা হ্যায়।

সর্দ্দারেরা একে অন্যের মুখ চাহিয়া হাসিল মাত্র।

কুলিরা সব কাজে অবসর পাইয়াছে। সকাল বিকাল তাহারা দলে দলে ঢেঁড়া পিটিয়া "কোদাল যার, বাগান তার", "বাবুলোককি জয়", "গান্ধী মহারাজকি জয়" প্রভৃতি ধ্বনি তুলিয়া বাগানের পথ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং চারিদিক কল-কোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলে। নির্জ্জন শান্ত জীবনে অভ্যস্ত পশুপক্ষীরা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটিয়া পলায়।

এই ভাবে প্রায় এক পক্ষ কাটিল। দীপক এবং বিরিঞ্চি পরামর্শ করিয়া কল্যাণপুর বাগানে ফিরিঙ্গিমারা এবং অন্যান্য বাগানের সর্দ্দারদের ডাকিয়া একটা ছোটখাটো সভা আহ্বান করিয়া কল্যাণপুর বাগান শ্রমিক-সঙ্ঘকে উৎসর্গ করিয়া দিতে এবং যাহাতে শান্তি এবং শৃঙ্খলার সহিত কাজ চলে এবং একমাত্র ফিরিঙ্গিমারা ভিন্ন অন্য বাগানে কোন উৎপাত বা ধর্ম্মঘট না হয় ইত্যাদি বুঝাইযা দিতে মনস্থ করিল।

রবিবার কল্যাণপুর বাগানের হাটের মাঠেই কুলি-সভা বসিবে, বিকাল চারিটাতে। এই সভাতে নিকটস্থ বাগানের সর্দ্দারদেরই কেবল আসিবার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষিপ্তোন্মত্ত জলরাশি যেমন আপন রুদ্র-নৃত্যে চলিয়া গিয়া সমুদ্রবক্ষে নিজেকে মিশাইয়া দেয়, উল্লাসে মত্ত অগণিত কুলিমজুরেরাও নিজ নিজ বাগান হইতে দলে দলে আসিয়া ফিরিঙ্গিমারাকে এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত করিল। কুলিরা সব নিজ নিজ দলের সর্দ্দারের অধীনে গান গাহিয়া গাহিয়া আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া তুলিয়াছে। কুলিদের উন্মাদ কলরবে নির্জ্জন বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিয়াছে, বাগানের মালিক তাহারা— "কোদাল যার, বাগান তার"। আর ভয় কি? মৃতপ্রায় জলস্রোত

বন্যাপ্লাবনে চেতনা পাইয়া যেমন গর্জ্জিয়া উঠে এবং যাহা কিছু সম্মুখে গতিরোধ করিতে চায়, তাহাকেই ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া চলে, কুলিমজুরেরাও বুঝি যাহা কিছু বিঘ্ন সম্মুখে আসিবে, তাহাকেই পিষিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া আপন অধিকাব প্রতিষ্ঠিত করিবে। কুলিরা দলে দলে "বন্দে মাতরম্" গান গাহিয়া চলিয়াছে। কি তাহার অর্থ, কি তাহার মর্ম্ম, কি তাহার প্রেরণা, কিই বা তাহার ভাব, কেই বা তাহার রচয়িতা, কিছুই তাহারা জানে না, বুঝে না। শুধু এই গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে মনে কেমন একটা চেতনা জাগে, মন পুলকে আনন্দে নাচিয়া উঠে, কি এক অনুভূতিতে প্রাণ মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়!

চারিটা বাজিতেই সভা আরম্ভ হইবার কথা ছিল; কিন্তু দুই একটা অনিবার্য্য কারণে সভা বসিতে গৌণ হইয়া গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কাল। দীপক, বিরিঞ্চি, ছায়া, মনীষা এবং আর আর কর্ম্মীরা সব একে একে আসিয়া সভাস্থলে সমবেত হইল। কুলির দল দীপক এবং বিরিঞ্চিকে দেখিয়া সমকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বন্দে—। এই 'বন্দে' শব্দটি অগণিত কুলিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া একটা গুরুগভীর শব্দে পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল—'বন্দে'। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে এক বিরাট স্তব্ধতা যেন বনভূমিকে আচ্ছন্ন করিল। চঞ্চল, মুখরিত কুলিকণ্ঠ, বাবুদের কথা শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহে নীরব হইল।

দীপক আজই প্রথম কুলিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "সহকর্ম্মীগণ, আজ আমাদের জীবনে এক কঠোর পরীক্ষার সময় এসেছে। গত পাঁচটি বছর ধ'রে সকাল সন্ধ্যা, দিন রাত্তির কেবলই ভেবেছি, কি ব্যবস্থা করলে তোমরা মানুষের মত বাঁচতে পার। মনে হয়, আজ সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। আজ থেকে আমি আমার বাগান

কল্যাণপুর শ্রমিকদের জন্যে উৎসর্গ ক'রে দিলাম। যারা সে বাগানের শ্রমিক, তারাই হবে তার লভ্যাংশের মালিক। আর আমার সহকর্ম্মী প্রিয় বন্ধু বিরিঞ্চিবাবু তার কলকাতার এবং পুরীর ঘরবাড়িসুদ্ধ তার যথাসর্ব্বস্ব আমাদের শ্রমিক-সঙ্ঘকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। আজ থেকে আমরা তোমাদের সেবক মাত্র। নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে আমাদের আর কিছু রইল না। আর এই যে ধর্ম্মঘট, এই হ'ল ভবিষ্যৎ বিপ্লবেব সূচনা। ঠিক এমনই উপায়েই আমরা এক একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকদের করায়ত্ত করব। তবে জেনো, তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ওপরই তোমাদের নিজেদের এবং দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে; আর সেই চেষ্টার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে—তোমাদের শান্তি-প্রিয়তা। একবার যদি শান্তিভঙ্গ হয়, তবেই কিন্তু সর্ব্বনাশ।

এই বক্তৃতার পর বিরিঞ্চি এবং অন্যান্য কুলিরাও কিছু কিছু বলিল, এবং কিছুক্ষণ পর নানা কথার ভিতর দিয়া আজিকার মত সভার কাজ শেষ হইয়া গেল।

৪৩

ফিরিঙ্গিমারা বাগানে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হওয়ার পর হইতে, ছোট হোক বড় হোক এক আধটা কুলিসভা শ্রমিক-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাহারা আহ্বান করে। উদ্দেশ্য, এই অবসরক্লান্ত কুলিমজুরদের প্রাণে ধর্ম্মঘটের চেতনাটি জিয়াইয়া রাখা, অথচ যাহাতে কোন মারামারি কিম্বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধে, সে বিষয়েও উপদেশাদি দেওয়া। কেন না, বাগানের প্রভুরা কুলিদের মধ্যে কোন একটা হাতাহাতি কিম্বা তেমনই কিছু একটা অজুহাতের সুযোগ পাইলে এক চাপে আস্ত চা-বাগান

শ্রমিক-সঙ্ঘকেই চেষ্টা করিয়া দিবে, এইরূপ ইঙ্গিত দীপকেরা পাইতেছিল। তাহারাও তাই খুব সতর্কতার সহিত শ্রমিকদিগকে পরিচালিত করিতেছিল।

এই শত সহস্র নিরেট মূর্খ কুলিদের প্রতিটি নরনারী নিজেদের এবং স্বজাতীয়দের হিতাহিত বুঝিয়া লইয়া তাহাদের নেতাদের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবে, প্রভুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হইবে না, এমন নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকা অদূরদর্শিতা হইবে। দীপকেরাও তাই যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াই চলিতেছিল। কাজেই এমনই সব ছোটখাটো সভা-সমিতির ভিতর দিয়া তাহারা কুলিদের সংযত রাখিতে চেষ্টা করিত। তাহা ছাড়া ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবার পর হইতে প্রতি রবিবার তাহারা একটা করিয়া বৃহৎ সভা আহ্বান করে, এবং ইহাতে আগামী সপ্তাহের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কুলিদের সঙ্গে আলোচনা করে ও নির্দ্দেশ দেয়।

আজও রবিবার। দুপুর হইতেই দীপক, বিরিঞ্চি এবং ছায়াতে বসিয়া ধর্ম্মঘটের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আলাপাদি হইতেছিল; কিন্তু ইহাদের তিনজনেরই ভাব একটু উত্তেজনাময়।

ছায়া কহিল, যতদূর সংবাদ পেলাম, তাতে মনে হয়, আজ ওরা আমাদের সভাকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করবে এবং মিলিটারি পুলিসেরও সাহায্য নেবে।

দীপক কহিল, সে আর 'নেবে' নয়, নিয়েছে। টমাসের বাংলো পাহারা দেবার জন্যে দুটো ক'রে সৈন্য আমদানি এরা কবে থেকেই করেছে।

ছায়া উদ্বিগ্ন হইল। কহিল, কিন্তু সত্যিই কি আমাদের শ্রমিক-সঙ্ঘকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করবে?

দীপক কহিল, ঠিক বুঝতে পারি না, ওদের মতলবটা কি। ও দিকে ফিরিঙ্গিমারা বাগান তো জঙ্গল হয়ে উঠল। অথচ টমাস তো চুপ ক'রে বসে আছে।

বিরিঞ্চি মৌনভঙ্গ করিল। কহিল, ওরা ভেবেছে যে, ঐ বাগানখানাকে যদি পরিত্যাগও করতে হয়, তবুও ওরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন আপোষ-রফা করবে না। অথচ এ এখন ওদের বোঝা উচিত যে, আসামে প্ল্যাণ্টার্সদের রাজত্ব শেষ হয়ে এসেছে। হয় বাগানের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব শ্রমিকদের হাতে তুলে দিতে হবে, নয়তো আসামের জঙ্গলে ব'সে ওদের জানোয়ার তাড়ানো ভিন্ন অন্য কোন কাজ থাকবে না। চা-বাগানগুলো একে একে আমরা শ্রমিকদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনবই আনব।

ছায়া কহিল, সে তো বুঝলাম; কিন্তু তা করবার আগে ঐ প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ কুলিমজুরের জীবনধারণের উপায়টিকেও সমূলে ধ্বংস ক'রে দেবেন না তো?

বিরিঞ্চি হাসিয়া ফেলিল; কহিল, কি যে বলেন, মিস দত্ত! যদি তাই করব তো আর এ প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা কেন? আর আপনাকেই বা জোর ক'রে আটকে রাখলাম কেন? বাগান ওরা ছাড়তে পারে না, অন্তত যে টাকাটা ওরা এতে খাটাচ্ছে, তার একটা সুদ হ'লেও ওদের চাই; আর আমরাও তা দিতেই প্রস্তুত। কিন্তু আরও একটু চাপ না পড়লে ওদের ঘুম ভাঙবে না।

ছায়া চিন্তিত হইল। কহিল, কিন্তু আপনাদের যা সর্ত্ত, তাকে সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া বাগান ছেড়ে চ'লে যাওয়ারই নামান্তর। কাজেই ওরা ভেবেছে, বাগান জঙ্গলই হোক আর যাই হোক, যতদিন সম্ভব ওরা চুপটি ক'রে ব'সে থাকবে এবং আপনাদের উত্যক্ত ক'রে মারবে।

দেখা যাক, কতদূর কি গড়ায়। তা ব'লে আস্ত আসামটাকে আর পরদেশীর হাতে বিকিয়ে দিয়ে রাখবেন কতদিন ?

বিরিঞ্চি কহিল, যা বলেছিস, দীপক ! টাকা খাটাচ্ছ, সুদ নাও ; আর সেও দিচ্ছি কেবলই মিস দত্তের প্ররোচনাতে। আমি হ'লে তো সমস্ত চা-বাগানগুলোকে কন্‌ফিস্‌কেট ক'রেই নিতাম।

ছায়া কহিল, থাক, ওসব কথা আজ আর ব'লে কি হবে ? যা সর্ত্ত দিয়েছেন, সেগুলোকেই ওরা আগে মেনে নিক, তারপর অন্য কথা হবে। দেশকে একটু একটু ক'রে এগুতে দিন। আজ বিকেলে সভাতে কি হবে, তাই আগে ভাবুন।

এত ভাববার আর তেমন আছে কি ?

ছায়া কপাল কোঁচকাইয়া কহিল, ভাবনার কিছু নেই ? বলেন কি, মিস্টার রায় ? আজও যদি আপনাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে, তখন এ ধর্ম্মঘটীদের চালাবে কে ?

এতদিন এদের মধ্যে কাজ ক'রেও আপনি এদের বিশ্বাস করতে পারছেন না ? আজই দেখবেন, ওরা কি ভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা মিস দত্ত, আমি এবং দীপক স্থির করেছি যে, আজকের সভাতে আপনার গিয়ে কাজ নেই। যদি গ্রেপ্তার ক'রেই তো আপনার অন্তত থেকে যাওয়া উচিত।

ছায়া দুঃখিত হইল। কহিল, একি কথা, মিস্টার রায় ? আপনারা সবাই যেতে পারবেন, মনিয়া পর্য্যন্ত যাবে, অথচ আমি যাব না ! এই না আপনি বললেন যে, কুলিরা তাদের কাজের ভার নিতে প্রস্তুত হয়েছে ? আজ আমাকে সুদ্ধ যদি গ্রেপ্তার ক'রে নেয় তো, তারও একটা পরীক্ষা হতে পারবে, হয়তো সব কিছুতে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারি না, তা ব'লে যতদিন এই শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানে রয়েছি,

ততদিন আপনাদের পেছনে প'ড়ে থাকতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই, মিস্টার রায়।

সে আমরা জানি, মিস দত্ত। আপনি যে আমাদের চেয়ে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বেশি ত্যাগ করেছেন, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন এবং তারই জন্যে এর বেশি কোন বিপদের সম্মুখে আর আপনাকে টেনে নিতে চাই না। একবার তো এমনই পুলিসের সম্মুখীন হয়েছেনই, আর কেন? তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্যেও তো কারও থাকা প্রয়োজন।

ছায়া কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল, না, মিস্টার রায়, সে হতে পারে না। চলুন, কথা ব'লে আর সময় নষ্ট করা চলে না। এই দেখুন, তিনটে বাজতে আর চার মিনিট মাত্র বাকি। সাড়ে তিনটেতে সভা।

ছায়ার কথায় দীপক বিরিঞ্চির মুখের দিকে তাকাইল, বিরিঞ্চি তাকাইল ছায়ার মুখের দিকে, কিন্তু ছায়ার চোখে চোখ পড়িতেই আর সে তাহাকে বারণ করিতে পারিল না যেন। তাহারা তিন জনে যাইয়া মোটরে উঠিল; মনিয়াকে আবার হাসপাতালের নিকট হইতে তুলিয়া লইতে হইবে।

৪৪

আজিকার সভার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, লাঠিধারী পুলিস, এমন কি সঙ্গিন লইয়া সৈন্যদেরও হানা দেওয়ার একটা প্রচণ্ড গুজব বাগানময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিলচর শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম কুলি-সভারই মত। তবে এই সভার সঙ্গে ঐ সভার পার্থক্য এই যে,

দাসত্বের নিগড়ে নিগৃহীত, স্বেচ্ছাচার ও অনাচারে নিষ্পেষিত, ভীত সন্ত্রস্ত কুলি-আত্মা আজ সেই ভয়বিহ্বলতা কাটাইয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্ব্ব নির্যাতন সহ্য করিতে বদ্ধপরিকর। প্রহারের ভয় গিয়াছে, জেলের ভয়ও নাই, বন্দুকের গুলিকেও বুঝি এরা আর তেমন ভয় করে না। কাজেই এই গুজব সত্ত্বেও, কুলিরা সব দলে দলে লাল ঝাণ্ডা হাতে করিয়া আসিয়া ফিরিঙ্গিমারাতে জমা হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সভার সর্ব্বকর্ম্মভার ভুলুয়া রামদীন প্রমুখ কুলি-সর্দ্দারদের এবং অপরাপর কুলি-নরনারীর হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। কেন না, এমনই উত্তেজনার মুখেও এই কুলিমজুরের দল স্থিরবুদ্ধি হইয়া শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে কি না, ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। নহিলে সমগ্র সুরমা উপত্যকার চা-বাগানে যে ব্যাপক ধর্ম্মঘটের কল্পনা, ইহা বুঝি আপাতত মুলতুবি রাখিতে হইবে। কাজেই পরীক্ষা প্রয়োজন। এইরূপ স্থির করিয়া দীপকেরা কুলি-সর্দ্দারদের বুঝাইয়া দিয়াছে যে, নিজেরা পিছনে থাকিয়া এই বিপদে কুলিদেরই কেবল বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাহারাও অন্যান্য দিনেরই মত সভাতে উপস্থিত থাকিবে, তবে আজ তাহারা মুখ্য অংশ গ্রহণ করিবে না, করিবে গৌণ অংশ।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনকে আরও একখানা চরমপত্র এই মর্ম্মে দিতে হইবে যে, আগামী ১লা মের পূর্ব্বে যদি তাহারা শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের সমগ্র দাবি পুরোপুরি মানিয়া না লয় তো, ১লা মে হইতে ধর্ম্মঘট আরও ব্যাপকতর করা হইবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল, আজিকার সভা বসিয়াছে ফিরিঙ্গিমারা বাগানেরই বড় অশ্বত্থগাছতলাতে এবং তাহা ম্যানেজার টমাসের বিনানুমতিতে।

সমবেত জনমণ্ডলী ঘাসের উপরেই বসিয়া পড়িয়াছে। বিরিঞ্চি, দীপক, ছায়া প্রভৃতিও এক পাশে বসিয়া পড়িয়া ভুলুয়া এবং রামদীনের সঙ্গে ফিসফিস ফুসফাস করিয়া কি সব পরামর্শ করিতেছে। এমনই সব খণ্ড আলাপ-আলোচনা শেষ হইলে পর ভুলুয়া একটা টেবিলের উপরে দাঁড়াইয়া সভাস্থ নরনারীকে আহ্বান করিল,—সহকর্ম্মীগণ, তোমরা হয়তো সবাই শুনেছ যে, এ সভা শেষ হবার আগেই পুলিসের লোকেরা একে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা ক'রে ভেঙে দিতে পারে; যদি তাই হয় তো, মনে রেখো, আজই আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। আজ আমরা মরণকে দুহাতে আলিঙ্গন করব—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ঐ শোন, মৃত্যু আমাদের আহ্বান করছে। ক্ষতি নেই, মানুষের মত বাচতে না পারলে, মরণেই তো শান্তি। যদি সত্য সত্য বিপদ আসেই, আমরা যেন ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে অপর পক্ষকে আঘাত না করি। জেনো, আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কর্ম্মপ্রচেষ্টা ন্যায়ানুমোদিত, কিন্তু পথ বন্ধুর। আমাদেব যেমন ভয় পাওয়া চলে না, তেমনই চলে না—

কথাটা শেষ হইল না। সভার এক পাশে কে একটা কুলি হঠাৎ কি একটা অছিলায় রামদীনের নাকে একটা ঘুষি মারিল। রামদীনের নাক হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। সভামধ্যে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হইল।

দেখা গেল, মধু-সর্দ্দার নামক একটা মাতাল দুশ্চরিত্র কুলি কি কারণে উত্তেজিত হইয়া ডাহিনে বামে কেবলই ঘুষি চালাইতেছে।

বিরিঞ্চি উঠিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাপটিয়া ধরিয়া সভার বাহিরে লইয়া চলিল; কিন্তু অকস্মাৎ সভাস্থ নরনারী স্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তিনখানা মোটর ট্রাক হইতে ব্যাঙের মত লাফাইয়া পড়িয়া বন্দুকধারী বহু লুসাই সৈন্য সভাটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ছায়া এবং মনিয়া মেয়েদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভয়বিহ্বলতা দূর করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দীপকের কি সব কথাবার্তা হইল। পুলিস স্থপার দীপককে গ্রেপ্তার করিলেন এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বিস্ময়বিমূঢ় জনতা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ভুলুয়া কুলিদের আহ্বান করিয়া পুনরায় কহিল, সাবধান, মধু যা করেছে করেছে। মনে রেখো, আজ আমাদের পরীক্ষার দিন। তোমরা এক পাও ন'ড় না। এমন সময় সেই মধু-সর্দ্দারের দলেরই একটা যুবক হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পুলিসের দিকে ইট ছুঁড়িতে লাগিল।

আর যায় কোথা! পুলিস স্থপারের লাল মুখ আরও রাঙা হইয়া উঠিল। গুলির আঘাতে সভা ভাঙিয়া দিতে আদেশ দিল। সৈন্যদল তৈয়ারি হইয়াই আসিয়াছিল বুঝি; গুড়ুম গুড়ুম করিয়া তিনবার গুলি ছাড়িল। ভীত ত্রস্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল; সৈন্যদল বিজয়-উল্লাসে ট্রাকে যাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া আরোহণ করিল, পুলিস সাহেব দীপককে লইয়া মোটরে চড়িলেন।

দেখা গেল, ভুলুয়া স্বয়ং এবং আরও দুইটা কুলি-যুবক গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হইয়াছে।

৪৫

বিরিঞ্চি, ছায়া প্রভৃতি যখন ভুলুয়া এবং অন্যান্য আহত কুলিদের লইয়া কল্যাণপুর হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বন্দুকের গুলিটা ভুলুয়ার বুকে বিঁধিয়াছে। তাহার

নিশ্বাস টানিতে কষ্ট হয়, মুখ হইতে রক্ত উঠে। বিরিঞ্চি একবার ভাবিল, ভুলুয়া এবং রামদীনপুত্র কানাইয়াকে লইয়া শহরে চলিয়া যায়; কিন্তু বাগানের ডাক্তারবাবু কিছুতেই উহাদের দুইজনকে এই অবস্থায় মোটরে কিম্বা অন্য যে কোন ভাবে স্থানান্তরিত করিতে দিলেন না। কাজেই বিরিঞ্চি তৎক্ষণাৎ শিলচর হইতে হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে আনিতে গাড়ি পাঠাইয়া দিল।

ভুলুয়াকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে বিরিঞ্চি এবং ফুলমণি। ছায়া ও মনিয়া আহতদের শুশ্রূষায় ব্যস্ত।

পিতার বুকে এই দারুণ আঘাত সত্ত্বেও মনিয়ার বসিবার ফুরসৎ নাই। সে এক একবার উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ পরিধেয় অ্যাপ্রনের গায়ে মুখ নোয়াইয়া মুছিয়া লয়; আবার দুই হাতে আহতদের জখম ব্যাণ্ডেজ করে। রোদনের উচ্ছ্বাস তাহাকে যেন বিভ্রান্ত করিয়া তোলে

এদিকে চতুর্দ্দিকের বাগান হইতে পুরুষ নারী, ছেলে বুড়ো, যুবক যুবতী সব কুলিরা দলে দলে আসিয়া আহত ভুলুয়ার শিয়রের পাশে একটা জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া তাহাকে একটি বার দেখিয়া যাইতে লাগিল। সকলের মুখেই ঐ এক কথা—ভুলো-সর্দ্দার বুঝি তাহাদের জন্য জীবন দিতে বসিয়াছে।

শিলচর শহরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন ডাক্তার ভট্টাচার্য্য যখন আসিয়া কল্যাণপুর হাসপাতালে পৌছিলেন, তখন রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বিরিঞ্চি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ডাক্তার ভট্টাচার্য্যকে অভ্যর্থনা করিয়া একেবারে ভুলুয়ার শয্যাপার্শ্বে লইয়া আসিল। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিতে বসিলেন। মনিয়া পাশেই সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া একবার পিতার এবং আবার ডাক্তারের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল। দেখিল, পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তারের

মুখভাবে কেমন একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিল। মনিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বুঝি বা পিতার জীবনের আশাই কম।

ভুলুয়াকে পরীক্ষা শেষ করিয়া ডাক্তার কানাইয়ার শয্যাপার্শ্বে যাইবেন, বিরিঞ্চি প্রশ্ন করিল, কেমন দেখলেন ভুলোকে ?

ডাক্তার মুখ শুকাইয়া জবাব দিলেন, না, ভাল দেখলাম না। বন্দুকের গুলিটা ওর ফুসফুসে বিঁধে গেছে।

বিরিঞ্চি বলিল, গুলিটা কি এখনও ভেতরেই রয়ে গেছে নাকি ?

হ্যাঁ।

অপারেশন প্রয়োজন হবে ?

ডাক্তার কানাইয়ার খাটের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিলেন, রোগীর এ অবস্থায় অব্‌জার্ভ করা ভিন্ন আর কিছুই এখন করা চলবে না। একটা মেজর অপারেশন করা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়।

এদিকে মনিয়ার গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছিল। সে বুঝি আর ধৈর্য্য ধরিয়া রোগীদের শুশ্রূষাও করিতে পারিবে না। তাহার ইচ্ছা হইল, 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া চীৎকার কাঁদিয়া উঠে।

ক্রমশই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বিরিঞ্চি দীপক সম্বন্ধে সব কিছু ব্যবস্থাদি করিতে ছায়াকে শহরে পাঠাইয়া দিয়াছিল ; অথচ তাহারও কোন সংবাদ পায় নাই। সে যাহাই হউক, এদিকে রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলুয়ার অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলিতে লাগিল। অথচ ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের সদরে না গেলে নয়। কাল সকালে আবার তাঁহার হাসপাতাল আছে। কিন্তু বিরিঞ্চি কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিল না। আজ রাত্রিকালটা বড়ই আশঙ্কার ভিতর দিয়া কাটিবে। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য সম্মুখে থাকিলে বিরিঞ্চি প্রভৃতি অনেকটা ভরসা পায়।

কিন্তু জীবনের কর্ম্ম যাহার সমাপ্তির সীমারেখায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাকে আটকানোর চেষ্টা বৃথা। ভুলুয়ার মুখেও তাই মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা দিল। মনিয়া পিতার মৃত্যুশয্যায় বসিয়া ভাবিল, এ বিশ্বসংসারে আপন বলিতে তাহার বুঝি আর কেহই রহিল না।

এমনই করিয়া আরও কিছু সময় কাটাইয়া রাত্রিশেষে সারাটা দেহকে শেষ বারের মত একটা মোচড় দিয়া ভুলুয়া শেষ নিশ্বাস টানিল।

৪৬

দীপকের জেল হইল, কুলিমজুরদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মূলে ভুলুয়া-সর্দ্দার বক্ষশোণিত সিঞ্চন করিয়া গেল, রামদীনপুত্র কানাইয়া গুলির আঘাত খাইয়া বাঁচিয়া উঠিল।

কিন্তু ভুলুয়ার রক্তদান কি বৃথা যাইবে? না। এই নিরস্ত্র সংযত জনতার উপরে গুলিবৃষ্টি ব্যর্থ হইল না। শতবর্ষব্যাপী অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচার সহ্য করিয়াছে যাহারা, যাহারা ক্রীতদাসের মত মুখ বুজিয়া সর্ব্ব অপমান সহিয়া গিয়াছে, ঐ কায়েমী স্বার্থবাদের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দেওয়াতে যাহারা পাইয়াছে মুক্তির আস্বাদ, সেই মনুষ্য নামধেয় পশুতুল্য কুলিমজুরের দল সমকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, "কোদাল যার, মাটি তার।"

দেখিতে দেখিতে সারা সুরমা উপত্যকার চা-শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও একটা মজা হইল এই যে, সেদিন সভাতে যে

কয়টা কুলি গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদেরই একজন আসিয়া বিরিঞ্চির পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া যাহা বলিল, তাহা এইরূপ।—

ফিরিঙ্গিমারা বাগানে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবার পর হইতেই বাগানের ম্যানেজার টমাস সাহেব মধু-সর্দ্দার, সে এবং অন্যান্য কয়েকটা কুলিকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করিতেছিল। যদি তাহারা কুলিদের মধ্যে একটা দলাদলি সৃষ্টি করিয়া একটা মারামারি পর্য্যন্ত বাধাইয়া তুলিতে পারে তো, তাহাদের প্রত্যেককে দুই শত টাকা করিয়া বকশিশ দেওয়া হইবে। মধু-সর্দ্দারও প্রথমে রাজি হয় নাই। অবশেষে এই সভার পূর্ব্বরাত্রে টমাস সাহেব মধু-সর্দ্দারকে তাহার কুঠিতে লইয়া গিয়া নগদ কিছু টাকা এবং দুই বোতল মদ ঘুষ দিলে পর মধু সেই সভাতে একটা মারামারি বাধাইতে রাজি হয়, এবং তাহাকে ও যে কুলিটা পুলিসকে মারিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে দশ টাকা করিয়া ঘুষ দেয়। কিন্তু তখন তাহাদের এমন কথা বলা হয় নাই যে, এরূপ করিলে পুলিসের লোকেরা গুলি করিয়া ভুলুয়া-সর্দ্দারকেও মারিয়া ফেলিতে পারে। তা ছাড়া কল্যাণ-পুরের বাবুকেও জেলে লইয়া যাইবে।

এই সংবাদে বিরিঞ্চির চক্ষের সম্মুখ হইতে আর একখানা পর্দ্দার আবরণ খসিয়া গেল। সে বুঝিল, কি ভরসায় টমাস এবং প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এমনই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া ফেলিয়া ভাবিল, এমনই কাজে ভুলুয়া ছিল তাহার কত বড় সহায়। তাহারা যে কুলিদের মধ্যে দল ভাঙানির প্রচেষ্টার কথা ভাবে নাই এমন নহে, এবং যথাসম্ভব সাবধানতাও অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু মধু-সর্দ্দার যে শেষ পর্য্যন্ত ঘুষের লোভে পড়িয়া এত বড় অন্যায় করিবে, তাহা ঠিক অনুমান করিতে পারে নাই। আজ তাই সে ভুলুয়ার মত সহকর্ম্মীর অভাবটা অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল। আর

দীপক ? এই শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের মূলেই তো রহিয়াছে তাহার প্রেরণা। বিরিঞ্চি অনেকক্ষণ এমনই আরও কত কথাই ভাবিল।

হঠাৎ ছায়া ব্যস্তভাবে তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া কহিল, মিস্টার রায়, কাল শ্রীহট্ট যাবেন না বলেছিলেন, কি স্থির করছেন ?

বিরিঞ্চি তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল, ছায়ার কণ্ঠে চমকিয়া উঠিল। কহিল, কি বললেন ?

ছায়া পুনরুক্তি করিল।

বিরিঞ্চি কহিল, আমাকে কাল সকালবেলাই বেরুতে হবে। একবার ভেবেছিলাম, কাছাড় জেলার বাগানগুলোতেই প্রথমে যাব, কিন্তু না, দেখছি, দূরের বাগানগুলোতেই আগে যাওয়া প্রয়োজন।

হঠাৎ মত বদলালেন কেন ?

বিরিঞ্চি তখন ঘুষ লইয়া মধু-সর্দ্দার ফিরিঙ্গিমাবার সভাতে যাহা করিয়াছে, তার একটা বর্ণনা দিল। শেষে কহিল, ভুলুয়ার রক্তদান যাতে ব্যর্থ না হয়, কুলিরা যাতে ঐ মালিকদের প্ররোচনায় আত্মকলহে প্রবৃত্ত না হয়, সেদিকেই মনোযোগী হতে হবে এখন সবচেয়ে বেশি। কেন না, এ ব্যাপক ধর্ম্মঘট যে কতদিন চলবে তার কিছু ঠিক নেই।

বেশ, তা হ'লে আপনি আর দের করবেন না। কালই বেরিয়ে পড়ুন। আমি এদিকে সব দেখব।

সে ভরসা আছে ব'লেই আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে বেরিয়ে পড়তে পারছি, নইলে পারতাম না, মিস দত্ত।

ছায়া এ কথার কোন প্রত্যুত্তর করিল না। বলিল, আচ্ছা, আমি আপনার সঙ্গে নেবার কাগজপত্র সব গুছিয়ে দিয়ে বদলুকে দিয়েই পাঠিয়ে দোব। তাকে সঙ্গে নেবেন তো ?

হ্যাঁ, সে যাবে।

বেশ।—বলিয়া ছায়া বাহির হইয়া গেল।

৪৭

সারা সুরমা উপত্যকায় চা-শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। এক সপ্তাহ গেল, দুই সপ্তাহ গেল, ক্রমশ এক মাস কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার সবগুলি চা-বাগান জঙ্গলে পরিণত হইতে লাগিল। যে চাগাছগুলি জন্মের কিছুদিন পর হইতে মুণ্ডিতশির হইয়া প্রভুদের কেবলই পাতা যোগাইয়াছে, তাহারা আজ মুক্তি পাইয়া আকাশের দিকে শির তুলিয়া দাঁড়াইল। মনে হয়, মুক্তি পাইয়া প্রতিদিন ঐ গাছের ডগাগুলি আধ হাত করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে।

এমনই করিয়া একে একে তিনটি মাস কাটিয়া গেল; বাগানগুলিও সত্য সত্যই গভীর জঙ্গলের আকার ধারণ করিল। দলে দলে কুলিরা সব দেশে যাইতে লাগিল। অথচ বহু চেষ্টাতেও না পারা গেল কুলিদের মধ্যে কোন বিবাদ বাধাইতে, না পারা গেল অন্য কোন সুযোগ লইয়া তাহাদের মেরুদণ্ডটি ভাঙিয়া দিতে। যে দুই একটা কুলি প্রলোভনে ভুলিয়া প্রথমে কাজ বন্ধ করিতে রাজি হয় নাই, তাহারাও ক্রমশ হাত গুটাইল। এদিকে আবার আস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া এই লইয়া একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, দৈনিক সাপ্তাহিক এবং মাসিক কাগজগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের মান্যগণ্য নরনারীরও সহানুভূতির অন্ত নাই। আসামের চা-শ্রমিক-ধর্ম্মঘট সারা দেশময় এক অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইল।

এইবার চা-মালিকদের টনক নড়িল। তাঁহারা বুঝিলেন, আসামের উদ্যানসদৃশ চা-বাগানগুলি বুঝি পুনরায় পূর্ব্বেরই ন্যায় জঙ্গলে পরিণত হয়। এমনই করিয়া আর কিছুকাল চলিলে, তাঁহাদের ব্যয়িত মূলধনের সব কিছুই যে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কেন না, পুলিস এবং মিলিটারির সাহায্যে নিরস্ত্র অসহায় এবং অহিংসবদ্ধ মজুরের দলকে লাঠি-পেটা, নয়তো গুলির আঘাতে ঘায়েল করা চলিতে পারে; কিন্তু অনিচ্ছুক কর্ম্মীকে দিয়া কাজ করানো চলে না। এতদিন তাঁহারা ভরসায় ছিলেন যে, পেটের দায়ে, অভাবের তাড়নায় মাস দুই পরে শ্রমিকের দল কাজ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু চা-শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান বহু পূর্ব্ব হইতেই এই কথাটা ভালভাবে ভাবিয়া কাজে হাত দিয়াছে। তদুপরি দেখা গেল যে, সমগ্র দেশ তাহার সহানুভূতি, সদিচ্ছা এবং মুক্ত কোষাগার লইয়া এই হৃতসর্ব্বস্ব শ্রমিকদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে এদিকে সরকারী মহল হইতেও, শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদের সঙ্গে মিটমাটের জন্য প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপরে চাপ পড়িতে লাগিল।

অগত্যা হঠাৎ একদিন ছায়া প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের নিকট হইতে এক চিঠি পাইল। ইহাতে আপোষ-মীমাংসার আলোচনা করিবার জন্য তাহাদের পক্ষ হইতে তিন জন প্রতিনিধিকে আহ্বান করা হইয়াছে।

কিন্তু ছায়া উত্তরে জানাইল যে, দীপকের মুক্তি ভিন্ন শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কোন আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

এই চিঠির ফলে যে জবাব পাওয়া গেল তাহাতে দেখা গেল যে, দীপকের মুক্তির দিনও অবধারিত হইয়া গিয়াছে, এবং জেল হইতে

বাহির হইয়া বাগানে আসিবার পূর্ব্বেই তাহাকে শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ক্রমান্বয়ে তিন দিন আলোচনা চলিল, এবং অবশেষে প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন শ্রমিক-সঙ্ঘের যাবতীয় সর্ত্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। শ্রমিকদের দৈনিক জীবনধারার উন্নতিবিষয়ক সর্ত্তগুলি ছাড়াও এইরূপ স্থির হইল যে, আগামী দশ বৎসবের মধ্যে একে একে প্রতিটি চা-বাগানের কর্ত্তৃত্ব শ্রমিক-সঙ্ঘের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, এবং বাগান-গুলি শ্রমিকদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে; তবে চা-বাগানের ব্যয়িত মূলধনের উপরে শতকরা বার্ষিক একটা নির্দ্দিষ্ট সুদ মালিকেরা পাইবেন। অর্থাৎ একে একে এই সাকুল্য মূলধন শ্রমিক-সঙ্ঘের ঋণমধ্যে পরিগণিত হইবে।

৪৮

আসাম চা-শ্রমিক-সঙ্ঘের জয়োৎসব এবং আনন্দ-কোলাহল শেষ হইয়া গিয়াছে। কুলিমজুরেরা এখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে মন দিয়াছে; চারিদিকেই গঠনের সাড়া। কিন্তু এই সুযোগে শ্রমিক-সঙ্ঘকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বিরিঞ্চি এবং দীপক মনোনিবেশ করিতে মনস্থ করিল। এখন তাহাদেব হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে; যাহাতে এই ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ কল্পনা সব ব্যাহত না হয়—সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চলিতে হইবে। এই মাত্র বিপ্লবের সূচনা। এমনই করিয়া নিরস্ত্র প্রতিরোধের ভিতর দিয়া দেশের অন্যান্য যাবতীয় মূলধনী প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকদের করায়ত্ত

করিতে হইবে। নিরস্ত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়া এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে দায়িত্বজ্ঞানশীল শিক্ষিত শ্রমিকদের সংগঠনী শক্তিকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গত কয়দিন যাবৎই দীপক এবং বিরিঞ্চি এমনই সব লইয়া ব্যস্ত আছে ; অথচ ছায়া হঠাৎ ক্রমশ প্রতিষ্ঠানের কাজে গা-ঢিলা দিল। বিরিঞ্চি দীপককে প্রশ্ন করিল, ওরে দীপক, মিস দত্ত যেন কেমন একটু আলগা হয়ে পড়ছেন ! ব্যাপার কি কিছু বলতে পারিস ?

দীপক একখানা কাগজে কি সব লিখিতেছিল। প্রথমে চুপ করিয়াই রহিল, কোন জবাব দিল না। শেষে কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, ছায়া আমায় সেদিন বলছিল, তার কাজ নাকি সমাপ্ত হয়েছে ; সে এখন এ কাজ থেকে অবসর পেতে চায়।

বিরিঞ্চি বিস্মিত হইল। বলিল, কেন, কেন ? আমি আরও ভাবছিলাম, তাঁকে আমাদের শ্রমিক-সঙ্ঘের স্থায়ী সম্পাদক ক'রে দোব।

না, সে বোধ করি আজই কাজে ইস্তফা দেবে।

বলিস কি ?

হ্যাঁ, আমাকে পরশু সে তাই বলেছিল। আমি কাল তোকে বলতে ভুলে গেছি।

তুই কিছু বললি না ?

আমি কি বলব, বল ? সে যদি যেতে চায় জোর ক'রে, তাকে আটকাব কি ক'রে ? সে বরং তুই চেষ্টা ক'রে দেখতে পারিস।—বলিয়া দীপক হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

এ হাসির অর্থ বিরিঞ্চির কাছেও অজ্ঞাত নয়। সে কি একটা জবাব দিতে যাইবে, এমন সময় ছায়া স্বয়ংই আসিয়া সেই কামরায় প্রবেশ করিল।

দীপক বলিল, ছায়া, তুমি বাঁচবে বহুদিন ?

ছায়া মুখে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া কহিল, হঠাৎ আমায় এ আশীর্ব্বাদ করছেন যে, দীপকদা ? দীর্ঘজীবন লাভ এ দেশের মেয়েরা তো কামনা করে না, আর এ আশীর্ব্বাদকে অভিশাপ ব'লেই মনে করে।—বলিয়া হাসিতে চেষ্টা করিল।

আমরা এইমাত্র তোমার কথা আলোচনা করছিলাম, এরই মধ্যে তুমি এসে পড়েছ।

ওঃ, তাই !—বলিয়া ছায়াও একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

দীপক তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি ভেতরে যাচ্ছি, মনীষা ডেকেছে অনেকক্ষণ।—বলিয়া কামরা হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছায়া তখন বিরিঞ্চির সম্মুখে একখানা চিঠি রাখিয়া কহিল, মিস্টার রায়, এই নিন আমার রেজিগ্‌নেশন লেটার। চিঠিখানা রাখিতে যাইয়া ছায়ার বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল।

বিরিঞ্চি একটি বার ছায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া পুনরায় চিঠির দিকে তাকাইল। মনে হইল, হঠাৎ যেন তাহার সারাটা দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। একটু পর আত্মস্থ হইয়া কহিল, আপনি যাবেন কেন, মিস দত্ত ?

ছায়ার মুখে আবার সেই শুষ্ক হাসি। কহিল, যাব কেন ? আমার কাজ তো শেষ হয়েছে, মিস্টার রায় ?

বিরিঞ্চি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কিন্তু ভাবছিলাম, আমাদের কাজ সবে আরম্ভ হয়েছে।—বলিয়া বৃথাই হাসিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হাসিটা ওষ্ঠপ্রান্তেই কেমন মিলাইয়া গেল।

ছায়া কহিল, না, মিস্টার রায়, এবার আমায় ছুটি দিন। তা ছাড়া

দাদুও আজ কদিন থেকেই বলছেন দেশে গিয়ে বাস করবে। আমার আর কোনমতেই থাকা চলে না।

কিন্তু দাদু তো সারাটা জন্মই এখানে কাটালেন, এখন হঠাৎ তিনি আবার দেশে যাবেন কেন, আর যাবেনই বা কোথায়?

আমরা প্রথমে সিলেট শহরে একখানি বাসা ভাড়া ক'রে থাকব, আর বাসাভাড়া হয়েও গেছে। তারপর যা হয় স্থির করা যাবে।

কিন্তু ওঁকে একবার ব'লে দেখলে হয় না? আপনি না থাকলে আমাদের কাজ একটু সাফার করবে, মনে করি। কেন না, আপিসটা আপনি যেমন ম্যানেজ করেছেন, তেমনটা আমরা কেউ পারতাম না।

সে যাই আপনি বলুন মিস্টার রায়, আমি ছাড়াও আপনাদের এ প্রতিষ্ঠান চলত, সে আমি জানি।

না, মিস দত্ত, আপনি জানেন না। আপনি এ প্রতিষ্ঠানের কতটুকু কি করেছেন, সে জানি আমরা।

ছায়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমি জানি মিস্টার রায় যে, আমি এর কিছুই করি নি।

ও কথা থাক। কিন্তু, আপনি আরও একটু ভেবে দেখুন। আমাদের কাজটাকে মধ্যপথে ফেলে চ'লে যাবেন না যেন।

মধ্যপথে মানে? এই তো শেষ। আপনাদের সব কিছু দাবিই তো মালিকেরা মেনে নিয়েছে।

চা-বাগানের মালিকেরা মেনে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু চা-বাগানই তো দেশের একমাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান নয়। এমনই ক'রে যে দেশের প্রত্যেকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আমাদের করায়ত্ত করতে হবে।

সে আপনারা করুন, মিস্টার রায়। আমাকে আর আটকাবেন না। আমায় এবার যেতে দিন। আমি যাই।

আপনি যদি থাকতে নাই চাইবেন তো, আমি আপনাকে আটকাব কোন অধিকারে, মিস দত্ত? তবে ভাবছি, এ প্রতিষ্ঠানকে এমনই দূরে ফেলে রেখে আপনি থাকবেন কি ক'রে?

বিরিঞ্চি ছায়ার অন্তরটা বুঝি দেখিতে পাইল। ছায়া নিজেকে আরও শক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, একে না ছেড়ে তো আমার উপায় নেই দেখছেন। কাজেই ঐ থাকা না-থাকার প্রশ্ন নিজেকে করি নি।

আমরা আপনাকে জোর ক'রেই ঐ প্রতিষ্ঠানে আটকে রেখেছিলাম জানি, তবে এও বুঝতে পেরেছিলাম যে, আপনার মত কর্ম্মী ভিন্ন এমনই প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠতে পারে না।

ছায়া যতই নিজেকে কঠিন করিতে চাহিল, ততই তাহার অন্তরটি যেন এক গভীর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কহিল, না না, আমি আর পারি না মিস্টার রায়, আমাকে বিদায় দিন।—বলিয়াই হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিরিঞ্চি যেমন ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। একটা নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া এক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল। বিরিঞ্চির মনে হইল, কি এক গভীর বেদনায় যেন তাহার বুকের ভিতরটা টন টন করিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া ছায়ার দিকে তাকাইয়া কহিল, আপনারা যাচ্ছেন কবে?

কালই সকালবেলা। আচ্ছা, আমি তবে আসি।—বলিয়া ছায়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

বিরিঞ্চি ছায়ার গমনপথের দিকে তাকাইয়া ক্রমশ দূরে ঐ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গভীর ভাবনায় ডুবিল।

৪৯

বিরিঞ্চির কাছ হইতে বিদায় লইয়া ছায়া পথে নামিল; কিন্তু বেদনার রুদ্ধ আবেগে অশ্রুধারা দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে লাগিল। বার বার আঁচলে চক্ষু মুছিয়াও যেন এর বিরাম নাই। এ বিদায়-আরতির প্রদীপশিখার আলো যে তার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিকে অন্ধকারেই ঘিরিয়া রাখিবে। গত পাঁচটি বছর অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মের ভিতর দিয়া একভাবে কাটিয়া গিয়াছে, নিজেকে ভাল করিয়া বুঝিবার সময় সে পায় নাই। অথচ আজ মনে হইল, সম্মুখের ঐ সুদীর্ঘ দিনগুলি সে অমনই কর্ম্মহীনতার ভিতর দিয়া কাটাইবে কি লইয়া? না, থাক। ছায়া এমনই সব ভাবনা আর ভাবিতে চায় না, পারেও না। সে আসিয়া রামবাবুর কামরায় প্রবেশ করিল।

দাদু প্রশ্ন করিলেন, ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলে?

হ্যাঁ, দাদু।

বিরিঞ্চিবাবুকে একটি বার আজ আসতে বললে না?

না, বলি নি তো, কেমন ভুলে গেছি।

রামবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ছায়া ট্রাঙ্ক বাক্স গোছাইতে ব্যস্ত হইল। দিদিমা অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন।

রামবাবু কহিলেন, ছায়া, আমাদের সঙ্গে তোমার না গেলেও তো চলে দিদি?

না দাদু, চলে না। আমি আর এখানে থাকতে পারব না। আমার কাজও শেষ হয়েছে।

কেন, ছায়া?

এ 'কেন'র জবাব আমি দিতে পারি না, দাদু। সে তো তোমায় বলেছি। ছায়া যেন অসহিষ্ণুভাবে কথা বলিতেছিল।

রামবাবু নাতনীর ভাব বুঝিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

ছায়া তাহার গোছানোর কাজে মন দিল। কাল ভোর না হইতেই তাহাদের মোটরে চড়িতে হইবে।

রামবাবুদের মালপত্র সব গোছগাছ হইয়া গিয়া বাগানের মোটর-ট্রাকে করিয়া আগেই শিলচর রেলস্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা মোটরে যাইয়া গাড়িতে উঠিবেন।

দীপক, বিরিঞ্চি, মনীষা প্রভৃতি আরও বহু লোক, কুলি-নরনারী বাগানের বুড়াবাবুকে বিদায় দিতে আসিয়া তাহারই টিলার সম্মুখের পথে জড়ো হইল।

রামবাবু ছায়ার গায়ে ভর করিয়া টিলার গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়া মোটরের পাশে দাঁড়াইলেন। কুলিরা সব ভিড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। দীপক এবং বিরিঞ্চিও প্রণাম করিল। রামবাবু তাহাদের পিঠে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, জয়ী হও, যশস্বী হও।

ছায়া তখন দীপককে প্রণাম করিয়া বিরিঞ্চির কাছে বিদায় লইতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, নমস্কার!

অপরে না বুঝিলেও ছায়া বুঝিল, তার গলাটা ঠিক পরিষ্কার নাই।

ছায়া এবং বিরিঞ্চির চোখে চোখ পড়িল। উভয়ে তখন বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল।

ছায়া তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিতেই সোফার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

বিরিঞ্চি তখন এক শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া বাগানের পথে চলিতে লাগিল।

কিছু দূর আসিয়া বিরিঞ্চি দীপককে কহিল, তুই বাংলোতে যা, আমি আসছি।

বিরিঞ্চি এক মন্থর গতিতে পথ চলিয়া যাইয়া সেই ক্ষুদ্র নদীটির ধারে শিশিরশিক্ত ঘাসের উপরেই বসিয়া পড়িল। এখন আর সেই স্থানে ঐ পড়ন্ত গাছটা নদীটার বুক জাপটিয়া পড়িয়া নাই। প্রতিহত জলরাশির সেই কলনিনাদও সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গিয়াছে। তবুও ঐ স্থানটা তাহার কাছে বড়ই প্রিয়, একটা মধুর স্মৃতিজড়িত। পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের গায়ে আজও তেমনই করিয়া সূর্য্য উঠে, আবার ঐ পশ্চিম-দিকে তেমনই করিয়াই অস্ত যায়; পাখীরা সব গাছে বসিয়া তেমনই কাকলি করে, জলরাশি বুকে লইয়া নদীটাও তেমনই বহিয়া চলে। তাহার মনে পড়িল, ঠিক পাঁচটি বছর পূর্ব্বে, এক সন্ধ্যায় ঠিক এই স্থানে বসিয়াই সে ছায়ার সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনা করিয়াছিল, সেই ছিল তাহার সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয়। তারপর দিনে দিনে সে পরিচয় গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছে, সে বুঝি ছায়ার প্রতি আকৃষ্টও হইয়াছে। আর ছায়া?

না, হঠাৎ বিরিঞ্চির মনে পড়িল, বেলা আটটাতেই আজ বদলুকে দিয়া একটা জরুরি চিঠি শহরে পাঠাইতে হইবে—শ্রমিক-সঙ্ঘেরই একটা কাজে।

বিরিঞ্চি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুত পা ফেলিয়া চলিল।